ফিরে দেখা—৩

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৭)
গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৪?-১৮৯৮)

সম্পাদনা
অরিন্দম দাশগুপ্ত



সুবর্ণরেখা
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক

তুষার মজুমদার

সুবর্ণরেখা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা - ৭০০ ০৯

অক্ষরবিন্যাস

এল. আর. ইনফোটেক

৫৮ শ্রীরামপুর রোড (নর্থ), গড়িয়া। কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

মুদ্রক

শান্তি প্যাকার্স

১৫/১, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০ ০৯

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৭)

জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মুক্তকেশী দেবীর সন্তান প্রিয়নাথের জন্ম হয় ১৮৫৫ সালের ৪ জুন নদীয়া জেলার দামুড়হুদা থানার জয়রামপুর গ্রামে। ৩৩ বছর পুলিশ বিভাগে কাজ করার পর ১৯১১ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নাথের খ্যাতি ও পরিচিতি 'দারোগার দপ্তর' এর লেখক হিসাবে। তিনি ছিলেন বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী রচনার পথিকৃৎ। তিনি পুলিশ গোয়েন্দার 'সত্য' কাহিনী পরিবেশন করছেন বলে দাবি করতেন। চাকরি করতে করতেই তিনি 'দারোগার দপ্তর' লিখতে শুরু করেন। ১৮৯১ সালের ২৬ জুন প্রথম প্রকাশিত হয় 'বনমালি দাসের হত্যা'। শেষ বা ২১৭ নম্বর দপ্তরের নাম ছিল 'নামকাটা সেপাই', প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ র ২২ এপ্রিল। এছাড়াও তাঁর লেখা আরো কয়েকটি বই আছে যার মধ্যে 'ঠগি কাহিনী'র মত অনুবাদও পড়ে। ১৯১৭ র ১৯ জুন প্রিয়নাথের মৃত্যু হয়।

উপক্রমণিকা

আমি ৩৩ বৎসর পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়া ইংরাজী ১৯১১ সালের ১৬ই মে তারিখে পেন্‌সন্ লইয়া পুলিস বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, আমার বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে অনেকে আমাকে বিশেষরূপ উপরোধ করেন যে, এই দীর্ঘকাল পুলিস বিভাগে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন যতদূর সম্ভব সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করুন। বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা পাঠকগণ সহজে অনুমান করিতে পারেন কি? পুলিস বিভাগে এই দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকায় আমাকে যে কত মকর্দ্দামার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, কত সৎ ও অসৎ লোকের সহিত সদা সর্ব্বদা মিলিতে হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রথমতঃ সকল ঘটনা আমার মনে নাই, দ্বিতীয়তঃ যতদূর মনে আছে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে আমাকে যে নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে নানারূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সৎ হউন বা অসৎ হউন, ধনী হউন বা নির্ধন হউন, তাঁহাদিগের দোষ গুণের কথা আমাকে নিস্বার্থ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন, বা যাঁহাদের বংশধরগণ এখন সমাজের মধ্যে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের বা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের দুষ্ক্রিয়া সকল সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকিবেন না। তৃতীয়তঃ আমার ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন কর্ম্মচারিগণের সহিত সময় সময় আমার যে সকল কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের যে সকল কার্য্য আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি নাই, সেই সকল বিষয় এখন আমাকে প্রকাশ করিতে হইবে। ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সকল চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইলে আমাকে বিশেষ রূপে

বিপদগ্রস্ত করিবার যে চেষ্টা করিবেন তাহাতেও আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লিখিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার কোন রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু ওরূপ ভাবে লেখনী হস্তে সর্ব্ব সাধারণের নিকট দণ্ডায়মান হওয়া অপেক্ষা ঐ লেখনী দূরে নিক্ষেপ করাই যুক্তি সংগত।

আমার বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে অনেকে আমার জীবন চরিত আমার নিজের মুখে শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করাও আমার পক্ষে যে কতদূব অসম্ভব তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমার বিশ্বাস যে আমার জীবনেব মধ্যে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ উপকার হইতে পাবে, কিন্তু বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা না করিলেও চলে না, সুতরাং এই দীর্ঘকালেব মধ্যে আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কোন্ মকর্দ্দামা আমাকর্ত্তৃক কিরূপে ধৃত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক "প্রিয়নাথ জীবনী" নামে তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দীর্ঘকাল ডিটেক্‌টিভ্ পুলিসে কার্য্য করিয়া, যে সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় "দারোগার দপ্তরে" প্রকাশ করিয়া থাকি; এখন সেই সকল ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পাঠকগণ এই জীবন চরিতের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবেন, এই জীবনী পাঠে কখন কাহার যে কোনরূপ উপকার দর্শিবে না তাহা আমি বলিতে পারি না, মফঃসলের নিরীহ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া জগতে যে কিরূপ চুরি জুয়াচুরি জাল খুন প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারিবেন, ও যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন তাহারও উপায় করিতে পারিবেন।

অনেক সময় কাহার জীবন চরিত কোন কোন পাঠকের সুখ পাঠ্য হয় না, কিন্তু আমার বিশ্বাস পুলিস বিভাগে আমার ৩৩ বৎসর কার্য্য করিবার কালীন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণের নিকট যে একেবারে নিরস পাঠ্য হইবে, তাহা মনে করি না, কিন্তু আমার পূর্ব্ব বা বাল্য ঘটনা যে পাঠকগণের প্রতিজনক হইবে তাহা নহে, সুতরাং সেই সমস্ত ঘটনা যত সংক্ষেপে পারি শেষ করিয়া দিব। মনে করিয়াছিলাম, যে দিবস হইতে আমি পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই দিন হইতেই আমার কাহিনী আরম্ভ করিব, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কারণ ইহাতে জীবনী-গ্রন্থের অঙ্গহানী হয়।

জীবনের প্রথম অংশ

সন ১২৬২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ অথবা ইংরাজি ১৮৫৫ সালের ৪ঠা জুন সোমবার বেলা ৮ দণ্ড ২৩ পল বা ৯টা ৫০ মিনিটের সময়, চতুর্থী তিথি, উত্তরাষাড়া নক্ষত্র, কর্কট লগ্ন ও মকর রাশিতে, নদীয়া জেলার অন্তঃর্গত, দামুড়হুদা থানার অধীন, জয়রামপুর নামক গ্রামে আমার জন্ম হয়।

আমার পিতা মাতা কে, কিরূপে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এই গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করেন, তাঁহারা কোন বংশ সম্ভূত, তাহার কিছু সংক্ষেপে পরিচয় আমার বিবেচনায় এই স্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের পর্য্যন্ত বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রামে। ঐ স্থান বল্লভীমেলের আকর স্থল তিনি বল্লভীমেলের দুর্গাধর পণ্ডিতের সন্তান, কুলীন ও একজন পণ্ডিত ছিলেন। প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় জয়রামপুর গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় মৌলিক বংশে বিবাহ করিয়া সেই গ্রামেই নিজের বাসস্থান স্থাপিত করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ৺রাধানাথ মুখোপাধ্যায়, ৺জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায়, ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ৺ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও ৺শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার পিতা ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার মাতা ৺মুক্তকেশী দেবী। ইনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তঃর্গত স্বাশন নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী দাদপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লীর ৺দ্বারিকানাথ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা। আমার প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় যখন তাঁহার পঞ্চ পুত্রের সহিত জয়রামপুরে বাস করিতেন, সেই সময় বিশেষরূপে মান সম্ভ্রমের সহিত গ্রামের মধ্যে তাঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল, তিনি অতিশয় সাহসী ও পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগুলিও তাঁহা

অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। প্রপিতামহ মহাশয় কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতেন না, পুত্রগণের উপার্জ্জন হইতেই তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, কেবল গ্রামের পাঁচজনের কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

ঐ সময় ঐ প্রদেশে নীলকরদিগেব অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল, যাঁহারা নীলকুঠিতে চাকুরি করিতেন, তাঁহারাই ঐ প্রদেশে বড় চাকুরের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। আমার পিতামহেরা চারি ভাই নীলকুঠিতে ভাল ভাল কার্য্য করিতেন, কেবল জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ব্যবসার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতামহগণ অতিশয় সাহসী ছিলেন, তাঁহাদিগের দুই ভ্রাতার এক দিবসের একটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই পাঠকগণ তাঁহাদিগের পরাক্রমের কথঞ্চিত আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

আমার জন্মস্থান জয়রামপুর গ্রামে অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় ছিল, তাহা এখনও সময় সময়ও হইয়া থাকে। ৺শারোদীয়া পূজার সময় পূজা উপলক্ষে পিতামহগণ বাড়িতে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এক বৎসর সন্ধ্যার সময় আমার পিতামহ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদিগের গরুর রাখাল আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সে মাঠ হইতে গরু লইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছিল সেই সময় একটী ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটী গরুর বৎসকে লইয়া গিয়াছে। পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না, পল্লীগ্রামের একটু বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ মাত্রেরই অনেকগুলি করিয়া গরু থাকিত; কাহারও দুইজন কাহারও বা চারিজন করিয়া গোরক্ষক নিযুক্ত থাকিত। উহারা ঐ সমস্ত গরু মাঠে লইয়া গিয়া চরাইত। গোচারণের মাঠ গ্রামের মধ্যে অনেক রক্ষিত থাকিত ইহা আমিও বাল্যকালে গ্রামে বাস করিবার কালীন দেখিয়াছি, কিন্তু আজ কাল চাষির সংখ্যা বাড়ীয়া যাওয়ায় পতিত জমি আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোরক্ষক ঐ সংবাদ প্রদান করিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাহাকে কহিলেন, যে ব্যাঘ্র আমাদিগের গোবৎস লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার সহজে নিষ্কৃতি নাই। চল কোন্ জঙ্গল হইতে ঐ ব্যাঘ্র বাহির হইয়াছিল ও কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গোবৎস লইয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। এই বলিয়া দুই ভাই দুই গাছি বংশ-যষ্টি হস্তে লইয়া সেই গোরক্ষকের সহিত গমন করিলেন। গোরক্ষক তাঁহাদিগের উভয়কেই লইয়া গিয়া যে স্থানে ব্যাঘ্র গোবৎস

আক্রমণ করিয়া যে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়, তাহা দেখাইয়া দিল। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিয়া দুই ভ্রাতা, তাঁহাদিগের কেবল মাত্র সম্বল সেই বংশ-ষষ্ঠি হস্তে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়াই দেখিতে পাইলেন দুইটী ব্যাঘ্র এক স্থানে তাঁহাদিগের সেই গোবৎসকে ভক্ষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়াই, এক এক জন একটী একটী ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন, ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থাতেই উভয় ব্যাঘ্রকে ধরিয়া, আপন আপন স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিয়া গ্রামের মধ্যস্থিত তাঁহাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী বারয়ারি তলায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগের বাটীর নিকট একটী স্থানে বারয়ারি পূজা হইত। সেই স্থানে একটী বৃহৎ বকুলবৃক্ষ ছিল। ঐ বকুলবৃক্ষ তলে পাড়ার সমস্ত লোকের বসিবার স্থান ছিল। পল্লিগ্রামের পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ একটী না একটী স্থান আছে, যে স্থানে পাড়ার বা গ্রামের অধিকাংশ লোক সকালে ও বৈকালে সম্মিলিত হইয়া নানারূপ গল্প গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমাদিগের গ্রামে ঐ বকুলতলায় সেইরূপ সকলে উপবেশন করিতেন। তাঁহারা যখন ব্যাঘ্রদয়কে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন পাড়ার অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সেই সময় ব্যাঘ্রদ্বয়কে কোথায় রাখা যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী পাকা বাটীর একখানি খালি ঘরের ভিতর উহাদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালেই ঐ বকুলবৃক্ষতলায় তাহাদিগের থাকিবার মত একটী ছোট পাকা ঘর প্রস্তুত করা হইল ও সেই ঘরের ভিতর ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্তও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ স্থানে ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে একে একে কাল গ্রাসে পতিত হয়। যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় ঐ স্থানে আবদ্ধ ছিল ততদিবস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিস্তর লোক আসিয়া ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে দেখিয়া যাইত।

যে বকুল বৃক্ষতলে ঐ ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি কিন্তু এখন ঐ স্থানে ঐ বৃক্ষের অস্তিত্ব্য নাই।

এই ব্যাঘ্র ঘটিত কথা শুনিয়া অনেকেই উহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু পাড়ার যে সকল লোক সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন, ও যাহাদিগের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ জন সম্ভ্রান্তশালী

ব্যক্তিকে আমি জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছি ও তাঁহাদিগের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

তাঁহারা যে ব্যাঘ্রদ্বয়কে ধরিয়া আনিয়াছিলেন পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, যে জাতীয় ব্যাঘ্র সুন্দরবন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা সেই জাতীয় ব্যাঘ্র। আমাদিগের দেশে যেসকল ব্যাঘ্র নেকড়ে নামে অভিহিত ইহা সেই জাতীয় ব্যাঘ্র। ইহাদিগের গায়ে লম্বা লম্বা ডোরার পরিবর্ত্তে গোল গোল কালো কালো দাগ থাকে, দৈর্ঘ্যেও ইহারা সময় সময় লাঙ্গুল সমেত ৮।১০ হাত হইয়া থাকে। ইহারা গরু বাছুর ছাগল ভেড়া ধরিয়াই প্রায় আহার করে, সময় সময় মনুষ্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

প্রপিতামহগণ যেমন দর্পের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এই জগত পরিত্যাগ করিবারকালীনও সেইরূপ দর্প দেখাইয়া যান। সেই সময় গ্রামে ভয়াণক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ রোগেই আমার প্রপিতামহী ইহজীবন পরিত্যাগ করেন ও প্রপিতামহও অতি শীঘ্র ঐ রোগে তাঁহার অনুসরণ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া যাইবার পর আমার পিতামহ ঐ সর্ব্বধ্বংস-কারী রোগে আক্রান্ত হন। কনিষ্ঠ শর্ব্বচন্দ্র ইহা দেখিয়া কহেন, আমি পিতা-মাতার শোক সংবরণ করিয়াছি, কিন্তু দাদার শোক কোনরূপেই সংবরণ করিতে পারিব না, তাঁহার অগ্রেই আমাকে ইহজীবন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া শয়ণ করেন। এই স্থানে বোধহয় পাঠকগণকে বলিতে হইবে না যে উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্দ্য ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে তিনিও সেই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া, আমার পিতামহের স্বর্গারোহণ করিবার ২।৫ মিনিট পূর্ব্বে ইহ জীবন পরিত্যাগ করিলেন। দুই ভ্রাতার মৃতদেহ তাঁহাদিগের পিতার শ্রাদ্ধের দিবসেই একত্র সৎকারার্থ বাটী হইতে লইয়া যাইতে হইল।

এই বিসূচিকা রোগই আমার পিতামহ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিনষ্ট করিয়া দিল। তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি প্রভৃতি যাঁহারা বর্তমান ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ঐ গ্রাম হইতে আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান শান্তিপুর প্রতিগমন করিয়া সেই স্থানেই পুনরায় বাসস্থান স্থাপন করিলেন ও তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ এখনও সেই স্থানে বাস করিতেছেন।

জয়রামপুর গ্রামে থাকিবার মধ্যে কেবল রহিলেন পিতা জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতৃব্য মহাশয়ের বিবাহ হয় শান্তিপুরে। তিনিও পরিশেষে সেই স্থানে গিয়া বাসস্থান প্রস্তুত করেন ও সেই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। জয়রামপুরে কেবল রহিলেন পিতৃদেব।

॥ ২ ॥

পিতা কখন পরের নিকট চাকুরি করিয়া জীবনধারণ করেন নাই। তিনি নিতান্ত স্বাধীন প্রকৃতিব লোক ছিলেন। নিতান্ত শৈশব হইতে সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে পতিত হইলেও তিনি কখন কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সামান্য স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি দিনপাত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারও সাহস ও মনের বল অতিশয় প্রবল ছিল, এবং পরের পদানত ও আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কিরূপে চলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। মাতা মুক্তকেশী দেবীও ঠিক সেই প্রকৃতির ছিলেন। অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে হইলেও কখন তাঁহারা কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ কবিতেন না। পিতামহেব স্বর্গারোহণের পর পিতার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া ছিল, কিন্তু যে দিবস হইতে মাতৃঠাকুবাণী আসিয়া সংসারে পদার্পণ করেন, সেই দিবস হইতে পিতৃদেবের অবস্থার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। তিনি নিতান্ত সামান্য কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান ব্যবসাদার রূপে পরিণত হন। ক্রমে এক একটি করিয়া ব্যবসা বাড়াইতে থাকেন। চাউলের ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, তেজারতি প্রভৃতিতে পরিশেষে তিনি অনেক লোককে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। মহাজনগণ তাঁহার কথায় অতিশয় বিশ্বাস করিতেন, যে দ্রব্য অপর ব্যবসায়ী নগদ যে মূল্যে খরিদ করিবার জন্য প্রস্তুত, তিনি যদি সেই দ্রব্য দেনায় চাহিতেন, মহাজন অপরের নিকট নগদমূল্য গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাকে দেনায় উহা প্রদান করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয় বা সংগতি কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার অতিশয় ঠিক ছিল, মুখ দিয়া তিনি যাহা বাহির করিতেন, সহস্র রূপে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা করিতেন। যে কার্য্য তিনি করিবেন না বলিতেন, বিস্তর লাভের আশা থাকিলেও তিনি পুনরায় আর উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাহাকে চলিত কথায় জিদ কহে, সেই জিদের তিনি অতিশয় বশবর্তী ছিলেন; যে কার্য্যে তিনি জিদ করিতেন সে কার্য্য হইতে তিনি কখনই প্রত্যাবর্তন করিতেন না। একটি সামান্য ঘটনা যাহা আমার নিজের সম্মুখে ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থানে প্রদত্ত হইল, ইহা হইতেহ

পাঠকগণ তাঁহার জিদের কতক নমুনা পাইবেন।

তাঁহার একটি গুড়ের কারখানা ছিল অর্থাৎ গুড়ের সময় বিস্তর গুড় সংগ্রহ করিয়া, তিনি তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেন। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে একরপ্তপ শৈবালের প্রয়োজন হয়, উহাকে আমাদের দেশে 'পাটা' কহে। গ্রামের মধ্যে একটি মরা নদী আছে, শুনিয়াছি পূর্বে উহা ভৈরব নদের অংশ ছিল, কিন্তু এখন উহা স্থানে স্থানে শুখাইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে দোয়ার মত হইয়াছে, উহাতে বারমাসই জল থাকে ও উহাতে ঐ পাটা বিস্তর পরিমাণে জন্মায়, গ্রামের বা নিকটবর্তী স্থানের গুড়ের কারখানাকারিগণ ঐ স্থান হইতে পাটা সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিতেন, পিতৃদেবেরও পাটা সেই স্থান হইতে প্রত্যহ দুই এক গাড়ি করিয়া আসিত।

গ্রামের মৌলিক মহাশয়দিগের একটু কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। জমিদারি হিসাবে ঐ মরা নদীর স্থান হইতে পাটা সংগ্রহকারিগণের দিকে লক্ষ্য করিতেন না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মৌলিক মহাশয় নামক গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি ঐ জমিদারদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ঐ জমিদারদিগের মধ্যে একজন অংশীদার ছিলেন, একসময় জমিদারীর বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে পতিত হওয়ায় তাঁহার ঐ দিকে নজর পড়ে। তিনি ঐ নদ হইতে পাটা সংগ্রহকারিগণকে ডাকাইয়া, তাঁহাদিগের উপর একটি কর স্থাপিত করেন। সকলেই জমিদারের কথায় সম্মত হইয়া ঐ ধার্য্য কর প্রদান করিতে প্রথমে সম্মত হন, কিন্তু পিতা ঐ রপ্তপ কর প্রদানে অসম্মত হন ও কহেন, এতকাল তিনি এই কার্য্যের নিমিত্ত যখন কর প্রদান করেন নাই, তখন তিনি তো উহা প্রদান করিবেন না অধিকন্তু দেখিবেন যাহারা ঐ কর প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাঁহারাই বা কিরপ্তপে ঐ কর প্রদান করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া জমিদার মহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন ও কহিলেন অপরাপর সকলে যে পরিমাণে কর প্রদান করিবে তিনি যেন তাহার এক চতুর্থ অংশ প্রদান করেন। পিতা তাহাতেও অসম্মত হন ও জমিদার মহাশয়কে কহেন তাঁহারা দোয়া হইতে বৎসর বৎসর মজুর খরচ করিয়া, পাটা তুলিয়া লইয়া জমিদারদিগের বিশেষ উপকার করিয়া আসিতেছেন, কারণ পাটা তুলিয়া লওয়ায় ঐ দোয়া পরিষ্কার থাকে বলিয়াই মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত উহা অধিক মূল্যে বিলি হইয়া থাকে। আর যদি উহা হইতে পাটা একেবারে তোলা না হয়, তাহা হইলে উহার মধ্যে মৎস্য লুকাইয়া থাকিবার সুন্দর উপায় হয়। সেই স্থানে জাল পড়ে না, সুতরাং মৎস্যও ধরা যাইতে

পারে না, এইরূপ মৎস্যজীবিগণ যদি ঐ স্থানের মৎস্য সকল ধরিতে না পারে তাহা হইলে ঐ দোয়া আর তাহারা জমা করিয়া লইবে না। সুতরাং জমিদারির আয় বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে হ্রাস হইয়া যাইবে। জমিদার মহাশয় পিতার এই কথা শুনিলেন কিন্তু আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পূর্ব আদেশ পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। পিতাও সেই দোয়া হইতে আর পাটা সংগ্রহ করিবেন না এই বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহা আমার সম্মুখের ঘটনা, সেই সময় আমি বালক হইলেও উহা এখন পর্যন্ত আমার বেশ মনে আছে।

আমাদিগের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে, চাঁদপুর নামক গ্রামে আমার পিতামহ শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি আম্র কাঁঠালের বাগান আছে। উহার ফলভোগ আমরা এখন পর্যন্ত করিয়া আসিতেছি। কোমলা দোয়া নামক একটি প্রকাণ্ড দোয়ার তীরে ঐ বাগান স্থাপিত। ঐ দোয়ার জল অতিশয় গভীর ও উহা উৎকৃষ্ট পাটা দ্বারা পরিপূর্ণ।

জমিদার মহাশয়ের সহিত পিতার মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি প্রত্যহ দুই তিনখানি গরুব গাড়ী ও পাটা উঠাইবার মজুর সেই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া পাটা তুলিয়া আনিতেন। তিনি যে কেবল নিজের প্রয়োজন উপযোগী পাটা আনিতেন তাহা নহে, অপরাপর ব্যবসায়ীগণেরও আবশ্যক অনুযায়ী পাটা আনিয়া বিনা খরচে তাঁহাদিগকে নিয়মিতরপ্তপে বিতরণ করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও জমিদারের কর দিত না বা ঐ স্থান হইতে পাটাও আনিত না। কর দিতে সম্মত হইলে যে কার্য্যে পিতার চারি আনা খরচ পড়িত, জেদের বশবর্তী হইয়া সেই কার্য্যে তিনি প্রত্যহ চারি-পাঁচ টাকা খরচ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরপ্তপে সেই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, দোয়া একেবারে পাটায় পূর্ণ হইয়া গেল। মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত যাহাদিগের নিকট ঐ দোয়া জমা ছিল তাহারা বিস্তর অর্থ লোকসান দিয়া জমা ছাড়িয়া দিল। সুতরাং পর বৎসর অনেক টাকা খাজনা কমিয়া গেল।

তৃতীয় বৎসরে জমিদার মহাশয় পিতাকে পুনরায় ঐ স্থান হইতে পাটা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি উহার উপর কর স্থাপন করিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার জিদ বজায় রহিল তখন তিনি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পুনরায় পূর্বের ন্যায় কার্য্য চলিতে লাগিল।

॥ ৩ ॥

পিতা আমার যে কিরূপ সাহসী ছিলেন তাহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এই স্থানে পাঠকবর্গের নিকট বলিতেছি। তাঁহার কারবার উপলক্ষে গ্রামস্থ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে তিনি দেনায় কাপড়, চাউল, ধান্য দিয়া সর্বদাই সাহায্য করিতেন, এবং আবশ্যক মত নগত অর্থও অল্প সুদে প্রদান করিতেন। এইসকল কারণে গ্রামের প্রজাগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার বশীভূত ছিল। গ্রামের সমস্ত সংবাদ তিনি এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন।

আমার বয়ঃক্রম যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর সেই সময় গ্রামের মধ্যে ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় ডাকাইতগণ এক রাত্রিতে আমাদিগের বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে মনঃস্থ করে। ঐ ডাকাইত দলের এক ব্যক্তি দেনা-পাওনা সূত্রে তাঁহার অতিশয় বশীভূত ছিল। সে চুপে চুপে আসিয়া এই সংবাদ পিতাকে প্রদান করে। তিনি মনে করিলে অনেক লোকজন সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে রাখিতে পারিতেন কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা না করিয়া নগত অর্থ ও অলঙ্কারপত্র যাহা ছিল তাহা মৃত্তিকার মধ্যে এক স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কারবার উপলক্ষে তাঁহার যেসকল লোকজন ছিল তাহার মধ্যে একজন অতিশয় সাহসী ও লাঠিখেলা প্রভৃতিতে অতিশয় পারদর্শী ছিল। রাত্রি ১০টার পর পিতা ও সেই ব্যক্তি দুইখানি তরবারি হস্তে বাটীর সদর দরজায় গিয়া উপবেশন করিলেন ও সেই স্থানে একটি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন রাখিয়া ডাকাইত দলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২টার সময় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও পিতাকে কহিল "যাও ঠাকুর আর কষ্ট করিয়া রাত্রি জাগিও না, শয়ন কর। তোমার সাহস দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার বাটীতে আর কিছু হইবে না।" এই বলিয়া তাহারা দ্রুত পদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পিতা কিন্তু তাহাদিগের কথার উপর নির্ভর করিলেন না, সমস্ত রাত্রি দরজায় বসিয়া কাটাইলেন। আমার বেশ মনে আছে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আমি তাঁহাদিগের নিকট বসিয়াছিলাম, তাহার পর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। পরদিন শুনিতে পাওয়া যায়, পার্শ্ববর্তী একখানি গ্রামে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে।

॥ ৪ ॥

এই স্থানে পিতার সত্যনিষ্ঠতার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকগণ দেখুন। পিতা কাপড়ের কারবারের সহিত সুতার কারবার করিতেন। কৃষ্ণগঞ্জের একটি সুতার দোকান হইতে একসময় কয়েক গাঁট সাদা সুতা খরিদ করিয়া আনেন। বাড়ী আসিয়া যখন ঐ সকল গাঁইট আমাদিগের সম্মুখে খোলেন সেইসময় দেখিতে পাওয়া যায়, সাতা সুতার পরিবর্তে উহার ভিতর লাল সুতা আছে। পাঠকগণকে বোধহয় বলিয়া দিতে হইবে না যে সাদা সুতা অপেক্ষা লাল সুতাব দাম অনেক অধিক। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি সেই দিবসই পুনরায় কৃষ্ণগঞ্জে গমন করেন ও যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার সমস্ত সেই সুতার বিক্রয়কারী দোকানদারকে কহেন। সেই দোকানদারও অতিশয় ধার্মিক লোক ছিলেন। পিতার কথা শুনিযা তিনি কহেন, বিলাতে গাঁইটের উপর নম্বর দেওয়ার ভুলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। তোমার অদৃষ্টক্রমে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা তোমার, উহাতে আমার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, বা আমি ঐ লাল সুতার দামও গ্রহণ করিতে চাহি না। দোকানদারের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, বলাবাহুল্য ইহাতে পিতার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল।

আমি যখন নিতান্ত বালক সেই সময় সেই সর্বধ্বংসকারী "আশ্বিনে ঝড়" হইয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে কিরূপে ঐ ঝড় দিন মান হইতে অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে বর্ধিত হইতে হইতে রাত্রিকালে প্রবল রূপ ধারণ করে। ঐ ঝড়ে আমাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। সেই সময় মৃত্তিকা নির্মিত ঘরে পিতা বাস করিতেন। ঝড়ে সেই ঘরের চাল ভাঙিয়া কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়, কারবার উপলক্ষে যে সকল ধান চাউল সংগ্রহ ছিল গোলা সমেত তাহা স্থানান্তরিত হয়, চাউল ধান্য প্রভৃতি সমস্তই লোকসান হইয়া যায়, দাঁড়াইবার স্থান পর্যন্ত থাকে না।

এইরূপে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পিতা ঐ স্থানে নিজের বাটী প্রস্তুত না করিয়া উহার সংলগ্ন আর একটি বাটী প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে বিমুখ হন, তাহার ২।৩ বৎসর পরেই কার্ত্তিক মাসের সেই ভীষণ ঝড়ে উহাও ভূমিস্যাৎ হইয়া যায়। পুনরায় তিনি ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

॥ ৫ ॥

যখন আমরা ঐ বাটীতে বাস করিতাম সেই সময় প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। একমাসের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণ ধান্য পাকিয়া উঠে, ও দেশে শান্তি বিরাজ করে। এই একমাস কাল মূল্য দিয়া অনেকেই ধান্য ও চাউল খরিদ করিতে পান না। পিতার চাউলের কারবার ছিল, তাঁহার যে সমস্ত ধান্য ও চাউল মজুত ছিল, তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবার পর কোন স্থান হইতে আর ধান্য বা চাউল সংগ্রহ করিতে পারেন না। অর্থ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের কোন কোন পরিবারকে ২।১ দিবস অনশনে দিন যাপন করিতে হয়। সেই সময় পিতা জানিতে পারেন যে, ঐ স্থান হইতে প্রায় ২০।২৫ ক্রোশ দূরে কালিগঞ্জ নামক স্থানে একজন মহাজনের বাটীতে কিয়ৎ পরিমাণ চাউল মজুত আছে। কিন্তু হাঁটিয়া যাওয়া ব্যতীত ঐ স্থানে গমন করিবার আর কোন উপায় নাই। সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ পাইয়া তিনি গ্রাম হইতে পদব্রজে সেই রাত্রিতেই বাহির হন, ও তৃতীয় দিবসে গরুর গাড়ীর চারি গাড়ী চাউল লইয়া প্রত্যাগমন করেন। আমার বেশ মনে আছে ঐ সমস্ত চাউল গাড়ী হইতে নামাইতে হয় না, যাহারা অনশনে দিন অতিবাহিত করিতেছিল, পূর্বে তাহাদিগের আবশ্যক অনুযায়ী চাউল প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চাউল গ্রামস্থ অপরাপর লোকে ভাগ করিয়া লয়। তিন দিবস কাল চাউলের সর্বোচ্চ দর হইয়াছিল, ফিঃ মণ ৭ টাকা। ইহাতে সমস্ত লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখন আমাদিগকে প্রায় বার মাসই ঐ দরে চাউল খরিদ করিতে হয়। ইহার পরই সুজন্মা হয়, ও মোটা চাউল।৶০আনা মণ বিক্রয় হয়। যুবক পাঠকগণ আমার একথা বোধহয় সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না।

॥ ৬ ॥

যে সময়ে পিতা নিজের অবস্থা ক্রমে উন্নতি করিয়া তুলিতেছিলেন সেই সময় মাতা ঠাকুরাণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। অপরাপর কারবারের মধ্যে পিতৃদেব কাপড়ের কারবার করিতেন, তিনি কাপড় খরিদ করিবার অভিলাষে শান্তিপুরে গমন করিবার পর, এক রাত্রিতে হঠাৎ দুইবার রক্ত বমন করিয়াই মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। ইহার পূর্বে তাঁহার কোনরূপ পীড়া তিনি নিজে অবগত হইতে পারেন না। যেরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাতে তাঁহার কোনরূপ চিকিৎসা করাইবারও সময় পাওয়া যায় না। পিতা সেইসময় বাটীতে ছিলেন না। সেই সময়

আমার বয়ঃক্রম দশ কি বার বৎসর হইবে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক ছিল না। থাকিবার মধ্যে দেড় কি দুই বৎসর বয়স্ক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পিতার এক বৃদ্ধা বালবিধবা পিসি শিবেশ্বরী দেবী।

পিতা বাড়ীতে নাই, নিকটে গঙ্গা নাই, অভিভাবক আর কেহই নাই। সুতরাং আমাকে মাতৃদেহ লইয়া সৎকারার্থ গমন করিতে হইল। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের চাকদা স্টেশন হইতে গঙ্গা নিকটবর্তী। সুতরাং সেই স্থানে লইয়া গিয়া মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিবারকালীন জয়রামপুর স্টেশনে অবতরণ করিবার সময় পিতাব সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে কাছা পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াই তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। যেসময় মাতা স্বর্গারোহণ করেন সেই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক হয় না। মাতার মৃত্যুর পর পিতা পুনরায় শান্তিপুরে বিবাহ কবিয়াছিলেন। তিনিও এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কিছুই হয় না।

॥ ৭ ॥

এই ঘটনার চারি কি পাঁচ বৎসর পরে সন ১২৮০ সালের ১৯শে ভাদ্র তারিখে আমাকে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে, তাঁহার সেই বৃদ্ধা পিসি শিবেশ্বরীকে ও আমার বিমাতা কুমুদিনী দেবীকে রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। মাতার মৃত্যু যেমন শোচনীয়, পিতার মৃত্যুও তাহা অপেক্ষা আরও অধিক শোচনীয়। ১৮ই ভাদ্র রাত্রিতে আহারাদি করিয়া তিনি তাঁহার ঘরে পালঙ্কের উপর শয়ন করেন; নিদ্রা যাইবার সময় তাঁহার চিবুকে সর্প দংশন করে। সেই সময় আমি গ্রামে থাকিতাম না, কৃষ্ণনগরে থাকিয়া কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিতাম। পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার উপায় নাই, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই আমার নিকট কৃষ্ণনগরে একটি লোক পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র আমি সেই স্থান হইতে সেই লোকের সঙ্গে বাটীতে আগমন করিলাম। যেসময় বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতৃদেবের সহিত আর আমার শেষ সাক্ষাৎ হইল না। আমি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই পিতৃদেবের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ সেই সময় গৃহের প্রাঙ্গণে রক্ষিত ছিল। এই অবস্থা দৃষ্টে আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, আমি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম। সেই সময় হইতে আমার হৃদয়ের উচ্চ আশা

নির্মূল হইয়া গেল, সেই সময় হইতে আমার লেখাপড়া শেষ হইয়া গেল, সেই সময় হইতে সংসারের বিষম ভার আমার মস্তকের উপর পড়িল। সেই সময় সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যে কিরপ্তপে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। পরদিবস পিতৃদেহ লইয়া পুনরায় সেই চাকদা গ্রামের গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে স্নেহময়ী মাতৃদেহ ভস্মে পরিণত করিয়াছিলাম, সেই স্থানে পিতৃদেহও ভস্মে পরিণত হইল। যে গঙ্গাজলে মাতৃচিতা বিধৌত হইয়াছিল, সেই গঙ্গাজলে পিতৃচিতাও নির্বাপিত হইল। যে গঙ্গা মাতৃ অস্থিকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গা পিতৃ অস্থিকেও সেই স্থানে স্থান প্রদান করিলেন। যে মাতৃস্নেহ ভুলিয়া পিতৃস্নেহের উপর নির্ভর করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পথ পরিষ্কার করিতেছিলাম, সেই পিতৃস্নেহ সেই গঙ্গাজলে ধৌত কবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন কবিলাম। যে সময় পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই সময় তাঁহাব বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসরের অধিক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

॥ ৮ ॥

জয়রামপুর গ্রামে একটি মধ্যবৃত্তি ইংরেজি স্কুল আছে, বাল্যকালে আমি ঐ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি। আমি স্কুলের মধ্যে বা ক্লাসের মধ্যে ভাল ছেলে ছিলাম না, যখন যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছি সেই শ্রেণীর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান কখন অধিকার করিতে পারি নাই, ক্লাসে আমার স্থান প্রায় সর্বদাই নিম্ন স্থানে—দুই একজন ছাত্রের উপর থাকিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষক যাহা বলিয়া দিতেন তাহা শুনিয়াই যতদূর শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই আমার হইত। বাটীতে আসিয়া কখন অধ্যয়ন করা আমার অভ্যাস ছিল না। ইহার নিমিত্ত পিতামাতার নিকট অনেক সময় লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম ও মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম সেই দিবস হইতে বাটীতে দস্তুর মত পড়িব। পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম কিন্তু কখন অর্দ্ধঘণ্টার অধিক একস্থানে বসিয়া পড়িতে বা লিখিতে পারি নাই, তাহাও সকল দিবস নহে।

যেসময় বাড়ীতে লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য সেই সময় খেলা করিয়াই কাটাইতাম। খেলা করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা আমার অতিশয় প্রবল ছিল, কিন্তু যেসকল ক্রীড়া এক স্থানে বসিয়া করিতে হয় তাহা আমি পারিতাম না। যে সকল ক্রীড়ায় দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি করিতে হয় সেই সকল ক্রীড়াই আমার প্রিয় ছিল। যে সকল

পাশ্চাত্য ক্রীড়া আজকাল আমাদের দেশে আসিয়াছে সেই সকল ক্রীড়ার নামও আমরা সেইসময় শুনি নাই 'হাডুডুডু' 'চিকে' 'ডাণ্ডাগুলি' প্রভৃতি খেলা করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতাম ও আমি একজন প্রধান খেলোয়াড়ের মধ্যে পরিগণিত ছিলাম; খেলা করিতে আমি নিতান্ত অনুরক্ত হইলেও স্কুলে যাইতে কিন্তু এক দিবসের নিমিত্ত কামাই হইত না।

॥ ৯ ॥

আমার বাল্যকাল হইতেই একটু সাহস ও কতকটা গোঁয়ার্তুমি বুদ্ধি ছিল। পিতা-মাতা আমার সেই সাহসকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং প্রশ্রয়ই দিতেন। তাহার এক দিবসের একটী সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই স্থানে বর্ণিত হইল।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদিগের গ্রামে সময় সময় অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হইত। যখন আমার বয়ঃক্রম ৭।৮ বৎসর সেইসময় একদিবস সন্ধ্যার পর আমি আমার মাতার নিকট বসিয়া আছি, এরগুপ সময় বাজারের দিক হইতে ব্যাঘ্রের রব শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আমাদিগের বাটী হইতে বাজার অর্দ্ধ মাইলের কম হইবে না, সেই স্থানে গমন করিতে হইলে জঙ্গল ও বাঁশবাগানের মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া গমন করিতে হয়। সন্ধ্যার পর যখন ঐ ব্যাঘ্ররব শ্রবণগোচর হইতেছিল, সেই সময় অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাঁশবাগানের ছায়ার মধ্য দিয়া দূরবর্তী দ্রব্য অল্প অল্প দৃষ্টগোচর হইতেছিল, সেইসময় মাতা আমাকে কহিলেন ও কি ডাকিতেছে শুনিতেছ?

আমি। বাঘ।

মাতা। কোন্ দিক হইতে ডাকিতেছে?

আমি। বাজারের দিক হইতে।

মাতা। তুমি এখন একেলা বাজারে যাইতে পার?

আমি। পারি।

মাতা। কখনই পার না, যদি পার আমি তোমাকে এক টাকার সন্দেশ দিব।

আমি। নিশ্চয় দিবে তো?

মাতা। নিশ্চয় দিব।

মাতার এই কথা শুনিয়া আমি তখনই একাকী বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম, ও সেই জঙ্গলময় রাস্তা অবলম্বন করিয়া বাজার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম; প্রায় অর্দ্ধ পরিমিত রাস্তা গমন করিবার পর দেখিলাম একটি ব্যাঘ্র রাস্তার উপর বসিয়া

মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। যখন সেই ব্যাঘ্রের উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল তখন তাহার নিকট হইতে আমি দশ-বার হস্তের অধিক দূরে ছিলাম না। উহাকে দেখিয়াই আমার মনে হঠাৎ একটু ভয়ের উদয় হইল, রাস্তায় সেই সময় জনমানব ছিল না, আমি থমকাইয়া একটু দাঁড়াইলাম। ব্যাঘ্র আমার উপর কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া, গভীর স্বরে একবার ডাকিয়া উঠিল ও আস্তে আস্তে ঐ রাস্তার এক পার্শ্বের বাঁশবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। সে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পর আমিও সেই স্থল দিয়া বাজারে গমন করিলাম ও মাণিক ময়রার দোকানে গমন করিয়া, আমি যে সেই স্থানে গিয়াছিলাম তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই দোকান হইতে একখানি থাল নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই রাস্তা দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। আসিবার সময় মাণিককে বলিয়া আসিলাম পরদিবস প্রত্যুষে এক টাকার সন্দেশ লইয়া ঐ থাল আনিবার নিমিত্ত সে যেন আমাদিগের বাটীতে গমন করে। বাটীতে আসিযা থালখানি মাতার হস্তে অর্পণ করিলাম, তিনিও তৎক্ষণাৎ একটি টাকা আমাকে প্রদান করিলেন। পরিশেষে আমি জানিতে পাবিয়াছিলাম, আমি বাটী হইতে বহির্গত হইবার পর একজন পরিচারককে মাতা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সে দূরে দূরে আমার সহিত গমন ও প্রত্যাগমন করিয়াছিল কিন্তু আমি সেইসময় তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই।

॥ ১০ ॥

আর এক দিবসের একটি গোঁয়ার্তুমির ঘটনা এই স্থানে প্রদত্ত হইল। একদিবস ক্রীড়া করিবার সময় আমাদিগের পাড়ার বালকগণের সহিত, অপর পাড়ার বালকদিগের একটু মতান্তর হয়, ও ক্রমে একটু সামান্য মারামারিও হয়, কিন্তু কয়েকজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোক সেইসময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকায়, তাহারা উভয় দলকেই ধমক দিয়া সে দিবসের গোলযোগ মিটাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতে উভয় দলের কেহই সন্তুষ্ট হয় না, পরিশেষে দস্তুরমত মারামারি করিবার নিমিত্ত উভয় দলের মধ্যে একটি দিন, স্থান ও সময় স্থির হয়। উভয় দলের বালকগণই বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া ঐ কার্য্যের উপযোগী লাঠি প্রস্তুত ও কয়েকখানি সড়কি ও বল্লমের যোগাড় করিয়া লওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমি তাহাদিগের দলের নেতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান ছিলাম। সময়মতো আমরা লাঠি, সড়কি প্রভৃতি লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত

হইলাম। অপর দলও সেইরূপ সরঞ্জামের সহিত সেই স্থানে আগমন করিল। দুই দল দুই দিকে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন মারামারি আরম্ভ করিবার উৎযোগ করিতেছে, সেইসময় হঠাৎ একজন পাড়ার বয়স্ক লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়পক্ষে প্রায় ৫০ জন বালককে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া কোনরূপে আমাদিগকে সেই কার্য্য হইতে সেইসময় নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। কোন কার্য্য উপলক্ষে যাইবার কালীন তিনি যদি হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত না হইতেন, তাহা হইলে ঐ দাঙ্গার পরিণাম যে কি হইত তাহা এখন অনুমান করাও অসম্ভব; উহাতে যে অনেকগুলি বালক হত ও আহত হইত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

॥ ১১ ॥

আমি নিতান্ত সামান্য অধ্যয়ন করিতাম সত্য কিন্তু বৎসর বৎসর উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিতাম। সময়মতো ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম ও ঐ স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুল পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া ভর্তি হইলাম।

কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালীন যে একটি ভয়ানক গোঁয়ার্তুমি কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা আমি এখন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। কলিকাতা হইতে একটি সাহেব ও দুইটি মেম, নানারূপ তামাসা দেখাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া কলেজের নিকটবর্তী একটি বাটী ভাড়া লইয়া তামাসা দেখাইবার ইচ্ছা করেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তামাসা দেখিতে হইবে, তাহার জন্য চারি আনা করিয়া টিকিট করেন। কলেজের প্রায় সমস্ত বালকই তামাসা দেখিবার নিমিত্ত টিকিট ক্রয় করিয়া নিয়মিত সময়ে তামাসা দেখিতে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য আমিও তাহার মধ্যে একজন।

আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি ঘর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারায় বাহিরে পর্যন্ত লোকের অতিশয় ভীড় হইয়াছে। ঘরের দরজা পর্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের মনে রাগের সঞ্চার হয়, ও ভাবি উহারা এইরূপে আমাদিগের সকলকে ঠকাইয়া লইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। এই রূপ ভাবিয়া আমরা জোর করিয়া ঐ ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলি, ও সাহেব ও মেমদিগকে এরূপভাবে প্রহার দেওয়া হয় যে পরিশেষে তাহাদিগের তিনজনকেই কিছু দিবস পর্যন্ত হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিতে

হয়। স্থানীয় বদমায়েসগণ এই সুযোগ পাইয়া সাহেবদিগের জিনিষপত্র টাকাকড়ি প্রভৃতি সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। কলেজে প্রিন্সিপালের নিকট নালিশ হয়, পুলিসও ইহার অনুসন্ধান করেন কিন্তু কোন বালকই সনাক্ত হয় না, ও কাহাকেও কোনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় না।

কৃষ্ণনগর কলেজে কেবলমাত্র আমি ২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলাম। এন্ট্রান্স একজামিন দিবার বৎসরই আমার পিতৃবিয়োগ হয়, সেই সঙ্গে আমারও কলেজ ছাড়িতে হয়।

॥ ১২ ॥

আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমাদিগের দেশে সেই সময় নীলচাষের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। আমাদিগের গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে লোকনাথপুর নামক একখানি গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে সেই সময় একটি নীলকুঠি ছিল। উহা লোকনাথপুর কনসার্ণ নামে অভিহিত হইত। আমাদিগের গ্রাম ও নিকটবর্তী অনেকগুলি গ্রাম ঐ কনসার্ণের অন্তর্গত ছিল।

ইংরাজি ১৮৫৯-৬০ সালে যে ভয়ানক নীলবিদ্রোহ হয় তখন আমি নিতান্ত বালক কিন্তু শুনিয়াছি জয়রামপুর গ্রামই ঐ নীলবিদ্রোহে অগ্রবর্তী হয়। কিন্তু তাহার কোন কথা আমি এ স্থানে বলিতেছি না।

অদ্য আমি যে হত্যার ঘটনা পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ঘটনার অনুসন্ধান আমা কর্তৃক না হইলেও আমার সম্মুখে উহার অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বলিয়াই আজ আমি তাহা এই স্থানে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে সময় পুলিস বিভাগে কর্ম করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রবিষ্ট হই, ইহা তাহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

এ দেশে পূর্বে যে সকল নীলকর সাহেব নীলের চাষ করিতেন, তাহার মধ্যে সকলেই যে অতিশয় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সদাশয় ও মহানুভব ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু অত্যাচারীর সংখ্যাই অধিক ছিল। কোন কোন গ্রন্থে ও সরকারী কাগজপত্রে নীলকরগণের অনেক অত্যাচার কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সকল ঘটনা আমার বাল্যকালে ও তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদিগের চাক্ষুষ জ্ঞান কিছুই নাই। আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় নীলকরগণের ভীষণ অত্যাচারের উপর গভর্ণমেন্টের

দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ও সেই সকল প্রবল অত্যাচার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। যে সময় আমাদিগের বাল্যকাল অতীত হয়, সে সময় আমরা সংসারের ভালমন্দ বুঝিতে সমর্থ হই, অপরের উপর অত্যাচার করিতে দেখিলে যে সময় হৃদয়ে আঘাত লাগিতে আরম্ভ করে, সেই সময় আমাদিগের দেশে নীলকরগণের প্রায় শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি আমাদিগের সম্মুখে তাঁহারা যেরূপভাবে কার্য্য করিতেন, আমাদিগের চক্ষের উপর যে সকল ঘটনা রাত্রিদিন ঘটিত, এই প্রবন্ধের মূল বিষয় বর্ণন করিবার পূর্বে তাহার দুই একটি বিষয় এই স্থানে বর্ণন করিলে নব্য পাঠক-পাঠিকাগণ বোধহয়, অসন্তুষ্ট হইবেন না; কারণ পুলিসের অত্যাচার দেখিলে বা একজন চৌকিদারকে অন্যায়রূপে চলিতে দেখিলে যাঁহারা একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন ও সেই সকল অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হইয়া নীচবংশসম্ভুত ও নিতান্ত অশিক্ষিত চৌকিদার বা সামান্য বেতনভোগী কনেস্টবলগণ যাহাতে দণ্ডিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ সভা-সমিতিব আহ্বান ও সংবাদপত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহারা ইহা পাঠে কখনই অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না বলিয়াই, নীলকর ইতিবৃত্তের দুই একটি ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম।

দেশের মধ্যে যে সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত এখন পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও তাহাই ছিল; কিন্তু, ঐ সময় আদালতে প্রজাগণ কর্তৃক একেবারেই কোনরূপ নালিশ হইত না। প্রজাগণের মধ্যে প্রায় কাহাকেও ফরিয়াদীর শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা কাহারও ছিল না যে, তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে তিনি রাজদ্বারে গমন করিতে সমর্থ হন। তাহারা জানিত নীলকরগণই দেশের রাজা; তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তাহাদিগের বিপদের আর সীমা নাই; সুতরাং তাহারা কেহই আদালত চিনিতেন না, দেনা-পাওনা হউক, তাহাঁর নালিশ করিতে হইলে প্রজামাত্রকেই নীলকর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সরকারি আদালতে নালিশ করিতে হইলে স্ট্যাম্প ও উকিল মোক্তার দিগের নিমিত্ত যেমন খরচ করিতে হয় নীলকুঠিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ পড়িত। দেওয়ানী হউক বা ফৌজদারি হউক, যে কোন নালিশ করিতে সেই স্থানে গমন করিলে, নায়েবের নজর ২ টাকা, তাঁহার মুহুরিকে ৷৷০ আনা, দেওয়ানের নজর ১ টাকা, তাঁহার মুহুরিকে ।০আনা, এবং সরকারি বা সাহেবের নজর ১ টাকা মোট ৪৷৷০ আনা না লইয়া কেহই নালিশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতে

পারিতেন না। এই ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত গরিবের পক্ষে। ধনশালী বা সম্ভ্রান্তশালী লোক হইলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। এই তো গেল নালিশ রুজু করিবার খরচ। সরকারি আদালতে নালিশ করিলে সর্ব্বপ্রথম আসামীর নামে যেমন শমন বা ওয়ারেন্ট বাহির হয়, এই স্থানে নালিশ হইলেও আসামীর নামে এক চিঠি বা হুকুমনামা বাহির হইত। ঐ চিঠি বা হুকুমনামা একজন ববকন্দাজের জিম্মা হইত। এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক কুঠিতেই অনেকগুলি করিয়া পশ্চিমদেশীয় বরকন্দাজ নিযুক্ত থাকিত। তাহাদিগের বেতন মাসিক ২।৩ টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু, ৫০ টাকার কম উপার্জন করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যাইত না। ঐ চিঠি বা হুকুমনামা যে ববকন্দাজের জিম্মা হইত সেও ফরিয়াদীর নিকট হইতে কিছু প্রাপ্ত হইত। ফরিয়াদী তাহার সাধ্যমত ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্যন্ত প্রদান করিতে না পারিলে, তাহার কোনরূপ কার্য্যই হইত না। তাহার পরই সেই বরকন্দাজের সহিত ফরিয়াদীকে গমন করিতে হইত। আসামীকে বা তাহার বাটী দেখাইয়া দিতে পারিলেই ফরিয়াদীর কার্য্য সেইসময় কতক শেষ হইয়া যাইত। পরিশেষে বিচারকের কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই চলিত। বরকন্দাজ আসামীর বাড়িতে গমন করিয়া যদি তাহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে অগ্রে তাহার নিকট হইতে যথাসম্ভব 'কোমর খোলানী'* গ্রহণ করিত, পরে তাহার বাটীতে উপবেশন করিত। এই 'কোমর খোলানী' গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে আসামীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে না, ও তাহার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত বা অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটু সময় প্রদান করিবে। যদি কোন আসামীর নিকট হইতে বরকন্দাজ কোনরূপে "কোমর খোলানী" প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা থাকিত না। তিনি সম্ভ্রান্তশালী লোক হউন বা সামান্য লোকই হউন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই বরকন্দাজের অগ্রে অগ্রে, তাহার হস্তস্থিত বংশদণ্ডের সুমধুর রসাস্বাদন করিতে করিতে, দ্রুতপদে নীলকুঠীতে গমন করিতে হইত। যেসকল আসামীকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাইত, সেইসকল আসামীর অবস্থা প্রায়ই এইরূপ ঘটিত। আর যেসকল আসামীকে সেই সময় প্রাপ্ত হওয়া যাইত না,

*বরকন্দাজগণ নীলকুঠির কোন কার্য্য উপলক্ষে কাহার নিকট গমন করিলে, প্রথমেই তাহার নিকট হইতে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইত। ইহা একরূপ নিয়মের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। ঐ অর্থ পাইবার পর বরকন্দাজ সেই স্থানে উপবেশন করিত। এই অর্থের নামই ছিল—"কোমর খোলানী"।

তাহাদিগেব অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িত। বাটীর বাহির হইতে দুই চারিবার আসামীকে ডাকিবার পর যদি সেই আসামী বরকন্দাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে না পারিত, তাহা হইলে সেই বরকন্দাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে সেই বাটীব ভিতর প্রবেশ করিত ও এরপ্তপ স্থানে গিয়া উপবেশন করিতে যে, স্ত্রীলোকগণ যেন কোনরপ্তপে বাটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে সমর্থ না হয়। বরকন্দাজের এইরপ্তপ অত্যাচার স্ত্রীলোকগণ কতক্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং যেরপ্তপ উপায়ে হউক স্ত্রীলোকগণ কোনরপ্তপে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রদান করিলে. সে সেই স্থান হইতে উঠিয়া বাটীর বাহিরে গিয়া উপবেশন কবিত ও যে পর্যন্ত আসামী আপন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত না হইত, সেই পর্যন্ত বরকন্দাজ সেই স্থান পবিত্যাগ করিত না। এমনকি, সময় সময় মাসাবধিকাল সে সেই স্থানে বসিয়া থাকিত; বলা বাহুল্য যে তাহার চর্ব্বচোষ্য করিয়া আহারের যোগাড় সেই স্ত্রীলোকগণকেই করিয়া দিতে হইত।

॥ ১৩ ॥

এই তো হইল নীলকরগণের চিঠি জারি করিবার নিয়ম। এইরপ্তপ উপায়ে আসামীগণ আনীত হইলে, পরিশেষে তাহাব বিচার হইত। বিচার হইবার পূর্বে আসামীকে দেওয়ান বা নায়েবের নিকট আনা হইত, ফরিয়াদীও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইত। আসামী ও ফরিয়াদীর মধ্যে যিনি অধিক অর্থব্যয় করিতে পারিতেন, ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, তাহারই জয়লাভ হইত; কিন্তু বিনা দণ্ডে আসামী ও ফরিয়াদীর মধ্যে যে কেহ অব্যাহতি পাইতেন; তাহা নহে। প্রায় বৈকালেই সাহেবের নিকট মকর্দ্দামার শুনানি হইত। দেওয়ান বা নায়েব, আসামী ও ফরিয়াদীকে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যেরপ্তপ বলিয়া দিতেন, সাহেব তাহাই শুনিয়া তাঁহার বিচারকার্য শেষ করিতেন। দেওয়ানি মকর্দ্দামায় আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে, ফরিয়াদীর যে দাবী থাকিত, সেই টাকা ও আসামীর অবস্থা অনুযায়ী সরকারী জরিমানা হইত। মকর্দ্দামা মিথ্যা সাব্যস্ত হইলে ফরিয়াদীকে জরিমানা দিবার আজ্ঞা হইত। এইরপ্তপ দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেলে, যে পর্যন্ত দণ্ডিত ব্যক্তি জরিমানার টাকা প্রদান করিতে না পারিত, সে পর্যন্ত সে সেই কুঠির মধ্যে কয়েদ থাকিত। তাহার আহারের বন্দোবস্ত থাকিত অর্দ্ধেক ধান্যমিশ্রিত চাউলের অন্ন। তাহার আত্মীয়স্বজন টাকার যোগাড় করিয়া জমা দিলে সে নিষ্কৃতি পাইত। আর যাহার জরিমানা দিবার ক্ষমতা

নাই, তাহাকে মাসাবধি পর্যন্ত কয়েদ রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পরিশেষে যখন তাহার সঙ্গতি হইত তখনই তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় হইত। সমস্ত জরিমানার টাকা আদায় হইলে অনেক হাঁটাহাঁটির পর ফরিয়াদীকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হইত সত্য, কিন্তু সে তাহার অর্দ্ধেকও লইয়া আসিতে সমর্থ হইত না। সেলামি, নজর, বক্সিস্, তৃহুরি প্রভৃতি নানান বাবে [য] তাহার অধিকাংশই চলিয়া যাইত।

ফৌজদারি মকর্দ্দামার বিচারে দেওয়ান বা নায়েবের অভিরুচি অনুসারে আসামী বা ফরিয়াদীর উপর 'হাতার'* আদেশ হইত, ও সরকারি জরিমানার আদেশ হইত। বিচার শেষ হইয়া গেলে, যে পর্যন্ত সে জরিমানার টাকা প্রদান করিতে না পারিত সেই পর্যন্ত সে কয়েদ থাকিত। তাহাকে যত হাতা মারিবার আদেশ থাকিত, জরিমানার টাকা আদায় হইবার পরই, সেই পরিমিত হাতা মারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপ বিচারের বন্দোবস্ত থাকায় গবর্নমেন্টের অনেক ক্ষতি হইত বটে, কিন্তু জরিমানার টাকা আদায় হওয়ায় নীলকরগণের বিস্তর লাভ হইত। এইরূপ বিচার পদ্ধতির কথা সরকারি কর্মচারিগণের মধ্যে যে কেহই একেবারে জানিতে পারিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু নীলকরগণের বিপক্ষে কেহই কোন কথা বলিতে 'সাহসী' হইতেন না, বা বলিলেও নীলকরগণের এতদূর প্রাধান্য ছিল যে, তিনি সেই সকল বিষয় কোনরূপেই প্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

॥ ১৪ ॥

উপরে নীলকরদিগের বিচারকার্য্য যেরূপভাবে বর্ণিত হইল, লেখকের যে গ্রামে বাসস্থান সেই গ্রামে নীলকরগণ সেই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে চালাইতে পারিতেন না। ঐ গ্রামের নিতান্ত সন্নিকটে তাঁহাদিগের একটি নীলের কুঠি থাকিলেও ঐ গ্রাম তাঁহাদিগের জমিদারীর মধ্যে পরিগণিত ছিল না বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন না। গ্রামের জমিদার ছিলেন সেই গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তাঁহাদিগের অর্থাদির বিশেষরূপ অভাব ছিল না বলিয়াই, বহুদিবস পর্যন্ত ঐ গ্রাম নীলকুঠির অন্তর্গত জমিদারীভুক্ত হইয়াছিল না। সেই সকল জমিদার

*প্রায় তিন হস্ত পরিমিত লম্বা চামড়ার দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্য বেত্রের কার্য করিত, উহাকেই হাতা কহিত।

ক্রমে লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদি ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন। একে সরিকানের সংখ্যা অধিক হয়, তাহার উপর তাঁহাদিগের ক্রমে অর্থেরও বিশেষরূপ অভাব হইয়া পড়ে। নীলকর সাহেবও এই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্তন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তগত কবিবার মানসে দুই একজনকে নীলকুঠির মধ্যে চাকরী প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোন কুঠির নায়েবের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা দেওয়ান হইয়া বিশেষরূপ অর্থ উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ উপায়ে সাহেব যখন দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের জমিদারগণের মধ্যে ২।৪ জন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে নানা রূপ প্রলোভন ও অপরিমিত অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের জমিদারীর অংশ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। অপরাপর অংশীদারগণ যখন দেখিলেন যে, সাহেব তাঁহাদিগের জমিদারীর অংশীদার রূপে পরিগণিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া জমিদারি বক্ষা করা নিতান্ত সহজ নহে। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ও অপরিমিত অর্থের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তাঁহারাও পরিশেষে তাঁহাদিগের অংশও সাহেবকে ইজারা করিয়া দিলেন। এত দিবস পরে সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ঐ গ্রামে এখন নীল-বুনানী করিবার উপায় হইল।

জমিদারগণ নীলকরগণের বশীভূত হইলেন সত্য, কিন্তু প্রজাগণ সহজে তাঁহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলন না। কারণ তাহারা জানিত, যদি একবার তাহারা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া নীল-বুনানী আরম্ভ করে, তাহা হইলে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে তাহাদিগকে নিজের চাষ আবাদ নষ্ট করিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে। প্রজাগণের মধ্যে অনেক ভদ্রলোকও ছিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে গ্রামের মধ্যে একটি সভা আহূত হয়। ঐ সভায় গ্রামস্থ প্রজামাত্রই উপস্থিত ছিলেন, অনেক বাদানুবাদের পর ঐ সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, কোন প্রজাই নীল বুনানী করিবে না। আরও সাব্যস্ত হইল যে, নীল না বুনিলে নিশ্চয়ই অনেকের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইবে। ঐ সকল অভিযোগের নিমিত্ত যে সকল অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে একটি চাঁদা করিয়া কিছু অর্থের সংস্থান করিয়া রাখা হইবে ও ঐ অর্থ হইতেই সমস্ত খরচপত্রের সঙ্কুলান করা হইবে।

এইরূপ সাব্যস্ত হইবার পর, প্রজামাত্রেই নীল বুনিতে একেবারে অসম্মত হইল। নীলকর সাহেব ইহা অবগত হইতে পারিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডলগণকে

ডাকিলেন। তাহারাও সাহেবের নীলকুঠিতে গমন করিলেন। সাহেব তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া নীলের সাটা গ্রহণ করিতে কহিলেন, কিন্তু মণ্ডলগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, বিশেষ রূপে অপমানিত করিয়া সাহেব সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

॥ ১৫ ॥

এই স্থানে নব্য পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীল বুনানী করিতে প্রজাগণ অসম্মত হয় কেন? ধান্যাদি বপন করিয়া যেমন তাহারা অর্থের সংস্থান করিয়া থাকে, নীল বুনানী করিলেও তো তাহাদিগের সেই রূপে অর্থের সংস্থান হইতে পারে। ইহার উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, নীলের চাষ করিলে প্রজাগণ কোনরূপেই অর্থ উপার্জন করিতে পারিত না, অধিকন্তু তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইত।

(১) যাহারা একখানি লাঙ্গলের আবাদ অর্থাৎ সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে ব্যক্তি কোনরূপেই ১৬ ষোল বিঘাব অধিক জমি চাষ করিতে পারে না। নীলের দাদন লইলে অভাব পক্ষে তাহাকে ১০ বিঘা জমিতে নীল বুনানী করিতে হইবে। ঐ দশ বিঘা জমিতে নীল বুনানী করিবার নিমিত্ত তাহাকে ৫ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়া, ৮/১০ বৎসর তাহাকে ঐ পরিমিত জমিতে নীল বুনানী করিতে হইবে, এই মর্ম্মে লেখাপড়া ও রেজেস্টারি করিয়া লওয়া হইত। ঐ লেখাপড়ার প্রায়ই এইরূপ অর্থ থাকিত যে "তাহার বুনানী জমিতে যে পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইবে, তাহার মূল্য হইতে অগ্রিম যে ৫ টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহা কর্ত্তন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে প্রদান করা হইবে, ও বৎসরের প্রথমেই পুনরায় তাহাকে দাদন দেওয়া হইবে। নীলের মূল্য ঐ দাদন পাঁচ টাকার সমস্ত যদি আদায় না হয় তাহা হইলে যাহা বাকি থাকিবে তাহা পর বৎসরের দাদন রূপে পরিগণিত হইবে। দাদন বলিয়া তাহাকে যে পাঁচ টাকা প্রদান করা হইত তাহা প্রায়ই প্রজার হস্তগত হইত না। নায়েব, দাওয়ান, মুহুরি, আমিন, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া, কেহ বা অতি সামান্য অর্থ লইয়া আসিতে সমর্থ হইত, কেহ বা এক পয়সাও আনিতে পারিত না।

(২) কোন্ জমিতে নীল বুনানী করিতে হইবে, তাহার কিছু স্থিরতা থাকিত না। জমি নির্বাচনের ভার আমিন ও দাওয়ানের উপর অর্পিত ছিল। প্রজা নিজের ধান্যাদি বপন করিবার নিমিত্ত যে সকল জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিত, দাওয়ান ও আমিন অনুগ্রহ করিয়া প্রায়ই সেই সকল জমিতে "নীলের মার্কা" দিয়া

যাইতেন অর্থাৎ ইহাই আদেশ হইত যে, ঐ সকল জমিতে নীল বুনানী করিতে হইবে। একে তো ধান্যাদি বপন করিবার নিমিত্ত তাহার নিতান্ত সামান্য জমি থাকিত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জমিগুলি বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহার যে কি অবস্থা হইত, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। প্রজাগণের অন্য কোন উপায় না থাকায়, পরিশেষে তাহাদিগকে আমিন ও দাওয়ান প্রভৃতির শরণাগত হইতে হইত, ও তাহাদিগকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া ঐ সকল ভাল জমির মধ্য হইতে ২।১ বিঘা অপর জমির সহিত পরিবর্তন করিয়া লইতে হইত।

(৩) নীলেব দাদন লইলে ধান্যাদি বপন উপযোগী জমির পরিমাণ অতিশয় অল্প হইয়া যাইত; তাহার উপব উর্বরা ও উত্তমরূপে চাষ করা জমি নীলের চাষে বাহির হইয়া যাওয়ায়. ধান্যাদি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়া পড়িত; সুতরাং মহাজনগণ তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ধান্য বা অর্থ কর্জ্জ দিতে পারিতেন না। কাজেই তাহাদিগের বিশেষরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত।

(৪) আমাদের দেশে চাষ-আবাদ ও বুনানি সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। প্রজাগণ জমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করিবার নিমিত্ত বৃষ্টি পতনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। সময়ে বৃষ্টি পতন হইলে তাহারা প্রায়ই ধান্য বপন করিতে সমর্থ হইত না। সেই বৃষ্টি পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ান, আমিন, পাইক, হালসা ও বরকন্দাজগণ আসিয়া লাঙ্গল ও গরুর সহিত প্রজাগণকে লইয়া গিয়া তাহাদিগের নির্দিষ্ট জমিতে অগ্রে নীল বুনানী করিয়া লইত। এইরূপে সমস্ত নীল বুনানী কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহারা আপন আপন জমিতে ধান্য বপন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইত। সেই সময় ধান্যের জমি প্রায়ই শুকাইয়া যাইত; সুতরাং পুনরায় যদি বৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে তাহারা আর সময়মত ধান্য বপন করিয়া উঠিতে পারিত না। যদি পরিশেষে বৃষ্টিও হইত তাহা হইলে বিলম্বে অর্থাৎ ধান্য বুনিবার উপযুক্ত সময়ের অনেক পরে বীজ বপন করিবার নিমিত্ত ভালরূপ ধান্যও জন্মিত না। ধান্য বপন করিবার অবস্থা তো এইরূপ হইত। তাহার উপর যে বৎসর বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া ঘাসের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইত, সেই বৎসর প্রজাগণ আপন আপন ধান্যের জমি সময়মত 'নিড়ানি' করিতে পারিত না। নিড়ানির সময় তাহাদিগকে অগ্রে নীলের জমি নিড়ানি করিয়া দিতে হইত। নীলের জমির নিড়ানি হইয়া গেলে, নিজের ধান্যের জমিতে নিড়ানি করিবার সময় পাইত। সেই সময় তাহারা সেই ধান্যের জমিতে নিড়ানি করিয়া কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইত না। জমিতে অধিক পরিমাণে ঘাস জন্মিয়া প্রায়ই ধান্যকে একরূপ নষ্ট করিয়া দিত। তদ্ব্যতীত,

প্রথম অবস্থায় যে জমি নিড়াইতে এক টাকার মজুরি লাগিত, শেষ অবস্থায় ঘাস অতিকায় বৃদ্ধ হওয়ায় ৫।৬ টাকার কমে সেই জমি নিড়ানি দেওয়া হইত না। বিশেষ সেইসময় নিড়াইয়া দিলেও সেই নিস্তেজ ধান্য আর প্রায়ই সতেজ হইতে পারিত না। এইরূপে নীল নিড়ানি করিতে নীলকরগণ যে একেবারেই কোনরূপ ব্যয় করিতেন না, তাহা নহে। অন্যস্থানে মজুরি করিলে যাহারা তিন আনা পাইয়া থাকে, নীলকরগণ তাহাদিগকে কখনই এক আনার অধিক প্রদান করিতেন না। ঐ এক আনার মধ্য হইতেও দাওয়ান, আমিন প্রভৃতির কিছু কিছু কমিশন বাহির হইয়া যাইত।

(৫) নীল কাটিবার সময় আরও এক ভয়ানক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইত। যেসময় নীল কাটিতে হয়, ধান্যও সেই সময় কাটিতে হয়। সেই সময় আবার প্রবল বন্যার সময়। যে বৎসর প্রবল বন্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া অতিশয় জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সময়মত নীল ও ধান্য কাটিয়া উঠিতে না পারিলে, প্রায় ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং নীলকরগণ প্রবল পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, প্রজাগণের উপর বল প্রকাশেই হউক বা অপর যেরূপেই হউক, বন্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল সকল কর্ত্তন করিয়া নীলকুঠিতে লইয়া যাইতেন। প্রজাগণ নীল কাটা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ধান্য কাটিতে কোনরূপেই সমর্থ হইত না; সুতরাং তাহাদিগের পাকা ধান্য গভীর জলে ডুবিয়া যাইত। তাহারা আর কি করিবে? আপন আপন স্ত্রীপুত্রের সহিত রোদন করিয়া অনশনে দিনযাপন করিত। তাহারা মহাজনের নিকট যে সকল ধান্য পূর্বে কর্জ লইয়াছিল, তাহা আর তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে কোন রূপেই সমর্থ হইত না; সুতরাং মহাজনগণ আর কর্জও দিতেন না। এরূপ অবস্থায় অনশন ভিন্ন দরিদ্র প্রজার আর উপায় কি?

যে সকল প্রজা কোনরূপে নীল কাটিয়া ও সপরিবারে রাত্রিদিন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আপন আপন ধান্যসকল কাটিয়া লইতে সমর্থ হইত, তাহাদিগেরও যে একেবারে লোকসান হইত না, তাহা নহে; ঐ সকল ধান্য জমি হইতে উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত তাহারা কোনরূপেই গাড়ির সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিত না; কারণ, গাড়ি মাত্রই নীল লইয়া যাইবার নিমিত্ত জোর করিয়া নিযুক্ত করা হইত। সুতরাং বন্যার প্রাদুর্ভাব অধিক হইলে, ঐ সকল কাটা ধান্য স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইত। যে সকল ধান্য কোন রূপে আটকাইয়া রাখা হইত, অনেক দিবস পর্য্যন্ত জলের মধ্যে থাকায় তাহাও একেবারে পচিয়া যাইত।

৬। নীল ভাল জন্মিলেও যে প্রজাগণ তাহার উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হইত তাহা নহে।

যদি কাহারও দশ গাড়ি নীল জন্মাইত, হিসাবের সময় সে প্রায় পাঁচ গাড়ির অধিক প্রাপ্ত হইত না। ঐ নীলের মধ্যে ৬।৭ গাড়ি নীল সরকারী হিসেবে ৫ গাড়ি বলিয়া লওয়া হইত। অবশিষ্ট ৩।৪ গাড়ি কোন এক অজ্ঞাত লোকের নামে জমা থাকিত; বলা বাহুল্য ঐ ৩।৪ গাড়ি নীলের দাম পরিশেষে নায়েব হইতে সামান্য তৈনিদি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া লওয়া হইত।

এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচারের নিমিত্ত প্রায় কেহই নীলের সাটা লইতে চাহিত না। বিশেষ একবার পাঁচ টাকা গ্রহণ করিয়া নীলের দাদন লইলে, সেই পাঁচ টাকা তাহার পুত্র পৌত্রাদির দ্বারাও পরিশোধ হইত না।

॥ ১৬॥

গ্রাম ইজারা হইয়া গেলে, মন্ডলগণেব মধ্যে কেহই নীলের দাদন লইতে সম্মত হইল না; অপরাপর প্রজাগণও নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করিল সত্য, কিন্তু নীলকরগণ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা ক্রমে তাঁহাদিগের অমোঘ অস্ত্রসকল বাহির করিতে আরম্ভ কবিলেন। প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদিগকে নীলের দাদন দেওয়ার যে কতরূপ উপায় ছিল, তাহার সমস্ত বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব, তথাপি সামান্য সামান্য উপায়গুলি যাহা আমাদিগের সম্মুখে ঘটিয়াছিল তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল মাত্র।

১। জমিদারি ইজারা লইবার পরই তাঁহারা গ্রামের সমস্ত স্থান একেবারে জরীপ করিতে আরম্ভ করিলেন; অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে যে সকল জমি আছে; সেই সমস্ত জমির মাপ আরম্ভ হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে প্রজাগণ যে সকল জমি উপভোগ করিয়া আসিতেছিল, তখন সেই সকল জমিতে নীলকরগণ সর্বপ্রথমেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঐসকল জমি মাপ করিবার প্রধান কারণ এই যে, প্রজাগণ যে সকল জমি বহুকাল হইতে দখল করিয়া আসিতেছিল বর্তমান সময়ের মাপ অপেক্ষা সাবেক সময়ের মাপে অধিক জমি প্রজাগণের দখলে ছিল। এমন কি জমিদারকে এক বিঘা জমির খাজনা প্রদান করিয়া, তাহারা ১॥০ বিঘার উপর জমি দখল করিয়া আসিতেছিল। ঐ সকল জমি বাহির করিয়া লওয়া ও খাজনার হার বৃদ্ধি করাই পূর্বোক্ত জরীপের প্রধান উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র ১ বিঘার খাজনা দিয়া প্রজাগণ যে ১॥০ বিঘার অধিক জমি চুরি করিয়া দখল করিয়া রাখিত, তাহা নহে। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন

প্রজাগণের সহিত তাঁহার জমিদারীর জমি সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত জমি মাপিয়া একটি বন্দোবস্ত করা হয়। প্রজাগণ সেই সময় একত্র সমবেত হইয়া মহারাজের দরবারে গমন করেন, ও তথায় আপন আপন অবস্থা অবগত করাইয়া চলিত মাপের অপেক্ষা জমির মাপ কিছু বর্দ্ধিত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। মহারাজও প্রজাগণের উপর সন্তুষ্ট হইয়া জমির মাপ চারি আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেন; অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুই দিকেই ৮০ হস্তে পরিমিত জমিতে এক বিঘা হইয়া থাকে; ইহা সর্ববাদীসম্মত; কিন্তু এখন হাতের পরিমাণ হইয়াছে ১৮ ইঞ্চি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে সেই হাতের পরিমাণ ছিল ২০ ইঞ্চি; অর্থাৎ ২০ ইঞ্চিতে ১ হাত ধরিয়া, সেই হাতের ৮০ হাতে ১ বিঘা জমি হইত। জরীপের সময় প্রজাগণের আবেদন মঞ্জুর করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই হাতের পরিমাণ আর চারি আঙ্গুলি বাড়াইয়া দেন; অর্থাৎ ১ হাতের পরিমাণ হয় ১০ ইঞ্চির উপর আরও চারি ইঞ্চি; অর্থাৎ ২৪ ইঞ্চি।

প্রজাগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী নবদ্বীপে উপস্থিত হয়। মহারাজ অতিশয় হিন্দু ছিলেন; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও পূজাদি না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এক দিবস স্নান করিবার কালীন যখন তিনি গঙ্গা গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন ও গঙ্গা স্নান করিতে করিতে গঙ্গাস্তব পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রজাগণ সেই ভাগীরথী তীরে সমবেত হয়। মহারাজ তাহাদিগকে সেই স্থানে সমবেত দেখিয়া সেই গঙ্গার গর্ভ হইতেই জিজ্ঞাসা করেন, "এত লোক এখানে সমবেত হইয়াছে কেন? উহারা কে?" উত্তরে তাঁহার একজন পারিষদ কহেন "উহারা মহারাজার প্রজা। জমির মাপের পরিমাণ কিছু বর্দ্ধিত করিয়া লইবার নিমিত্ত উহারা আপনার নিকট আসিয়া দরবার করিয়াছিল। মহারাজও তাহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া জমির পরিমাণ প্রত্যেক হস্তে চারি অঙ্গুলি বর্দ্ধিত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু প্রজাগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় মহারাজের নিকট দরবার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।" পারিষদের কথা শুনিয়া প্রজাগণের উপর মহারাজের ঈষৎ ক্রোধের উদয় হইল; কিন্তু সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তিনি গঙ্গা গর্ভ হইতেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আমি যাহা প্রজাগণকে দিয়াছি, তাহাতেও যদি তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কলাটী প্রদান করিব।" এই বলিয়া তিনি তাহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন পূর্বক প্রজাগণকে দেখাইলেন। প্রজাবৃন্দের মধ্যে দুই একজন বিশেষ চতুর লোক ছিল। তাহারা "যে আজ্ঞে মহারাজ, তাহাই দিবেন" এইরূপ

বলায়, সকলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরিশেষে সেই প্রজাগণ মহারাজের দাওয়ানের নিকট গমন করিয়া কহিল, "আমাদিগের জমির মাপের পরিমাণ প্রত্যেক হস্তে ২০ ইঞ্চির উপর চারি ইঞ্চি মহারাজ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুনরায় তাহার উপর এককলা অর্থাৎ আরও প্রায় ৮ ইঞ্চি বাড়াইয়া দিয়াছেন।" দাওয়ান এই কথা শুনিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মহারাজ গঙ্গাস্নান করিবার সময় যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দাওয়ানকে বলিলেন, ও পরিশেষে একটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "আমি যদিচ রাগভরে ঐ কথা বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি আর কিছু বাড়াইয়া দিব না; কিন্তু এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে গঙ্গার গর্ভে দন্ডায়মান অবস্থায় যখন আমার মুখ দিয়া এক কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহা আমাকে রাখিতেই হইবে; নতুবা, সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমি মহা পাতকে পতিত হইব।"

॥ ১৭ ॥

সেই সময় হইতে প্রজাগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ জমির মাপ প্রতি হস্তের নিমিত্ত ১৮ ইঞ্চির পরিবর্তে প্রায় ৩২ ইঞ্চি ব্যবহৃত হওয়ায়, এক বিঘা জমিব খাজনা প্রদান করিয়া প্রজাগণ ১॥০ বিঘার উপর জমি ভোগ করিতে লাগিল। প্রজার পক্ষে ইহা বড় কম লাভ নহে; তদ্ব্যতীত জমির নিরিখও অতিশয় কম ছিল। তিন বিঘা হইতে পাঁচ বিঘা পর্য্যন্ত জমির বাৎসরিক খাজনা এক টাকা ধার্য্য ছিল।

নীলকরগণ ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন; সুতরাং জমির জরিপ করিয়া যে প্রজার দখলে ২০ বিঘা জমি ছিল, তাহা পরিমাণে প্রায় ৩০।৩৫ বিঘা হইল। পাঁচ বিঘার নিরিখে যাহার খাজনা ছিল, জমাবন্দি করিয়া ঐ জমির নিরিখ টাকায় দুই বিঘা করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ যে প্রজা নীলকরগণের মাপের প্রায় ৩০।৩৫ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করিয়া কেবলমাত্র ৪ টাকা খাজনা দিয়া আসিতেছিল, তখন নীলকরগণ সেই প্রজার নিকট হইতে বাৎসরিক ১৫।১৬ টাকা খাজনা প্রার্থনা করিলেন। প্রজাগণ সেই খাজনা প্রদানে অসম্মত হওয়ায় ক্রমে তাহাদিগের নামে নালিশ হইতে লাগিল। সেই সময় বিচারকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই নীল কুঠিয়ালগণের বশীভূত ছিলেন; সুতরাং প্রজার আপত্তি প্রায়ই গ্রাহ্য হইল না। কাহারও বা ১২ টাকার হিসাবে ডিক্রী হইতে লাগিল। ঐ সকল প্রজা যখন দেখিল যে, চিরদিবসের নিমিত্ত তাহাদিগকে এই ভয়ানক খাজনার ভার বহন করিতে হইবে, তখন কাজেই তাহারা এক এক করিয়া

নীলকরগণের বশীভূত হইয়া, তাহাদিগের জমিজমা বজায় রাখিতে লাগিল। কিন্তু নীলকরগণ যে তাহাদিগের সাবেক জমা একেবারে বজায় রাখিলেন, তাহা নহে; জমির হার কিছু কিছু বাড়াইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণও নীলের দাদন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এই উপায়ে নীলকরগণের উদ্দেশ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইতে লাগিল। যে সকল প্রজা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগের উপর অন্য উপায় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(২) যে সকল প্রজা জরীপ জমাবন্দিতেও নীলকর সাহেবের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহাদিগের ভদ্রাসন বাটীর চতুর্দ্দিকে যে সকল জমি ছিল, তাহা "লোকসান" জমি, অর্থাৎ জমিদারের নিজের জমির মধ্যে পরিগণিত কবিয়া; তাহাতে নীলকরগণ নীলের বীজ ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল জমিতে নীল উৎপন্ন করা উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য যাহাদিগের বাটীর চতুর্দ্দিকে ঐসকল নীল রোপিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষ রূপুপ কষ্ট প্রদান করা। পল্লীগ্রামের প্রজামাত্রই দুই চারিটি গরু বাছুর লইয়া বাস করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সদাসর্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং ঐ সকল গরু বাছুরের মধ্যে কোন গতিকে যদি একটি আসিয়া ঐ নীলের জমিতে উপস্থিত হইল তখনই তাহাকে ধরিয়া পাউন্ডে প্রেরণ করা হইল; তদ্ব্যতীত, যাহার গরু তাহার নামে নীল খেসারত করা অপরাধে আদালতে নালিশ রুজু করা হইল। ধনবান সাহেব ফরিয়াদী, এ দেশীয় গরীব প্রজা আসামী; সুতরাং মোকর্দ্দামায় প্রায়ই প্রজাগণকে পরাজিত হইতে হইল, ও ক্রমে তাহারা অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়িল। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নীলকরগণের শরণাগত হইতে না পারিলে আর উপায় রহিল না।

(৩) যেসকল প্রজা নীলকরগণের বশ্যতা স্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না, তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নীলকরগণ আরও এক ভয়ানক উপায় বাহির করিলেন। তাঁহারা যেমন দেখিলেন যে, প্রজাগণ তাহাদিগের নিজের জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া ধান্যের বীজ বপন করিয়াছে, তাহার পরদিবসই নীলকর কর্মচারিগণ অনেক লাঙ্গল গরু, লোকজন, ও লাঠিয়াল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও সেই সকল ধান্য বোনা জমির উপর পুনরায় একধানি চাষ দিয়া নীলের বীজ বপন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ওদিকে পূর্বেই বিচারালয়ে উপনীত হইয়া, যাহারা পূর্বে ধান্য বপন করিয়াছিল, তাহাদিগের নামে মিথ্যা এক নালিশ এই মর্মে উপস্থিত করিলেন যে তাঁহাদিগের নীলবোনা জমি

ভাঙ্গিয়া প্রজাগণ তাহাতে ধান্য বপন করিয়াছে। বিচারের সময় ঐ জমিতে নীল ও ধান্য উভয় প্রকার শস্যের চারা বাহির হইয়া পড়িল। বিচারেও নানা যোগাড়ে ও বহু অর্থব্যয়ে ও প্রজাগণ পরাজিত হইয়া নীলকরদিগের নিকট খেসারত প্রভৃতিতে অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়িল। তদ্ব্যতীত অন্যায় কার্য্য করা অপরাধে বিনা দোষে অনেককে জেলে পর্য্যন্তও গমন করিতে হইল। এই সকল কারণে অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে সেই সকল প্রজাদিগকেও নীলকরণগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নীলের সাটা গ্রহণ ও নীলকরগণের ইচ্ছামত নীলবুনানি করিতে হইল।

এই সকল উপায়েও যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল না, তাহাদিগের উপর আরও অতিশয় ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির মধ্যে কাহারও ঘরে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে তাহার যথাসর্বস্ব দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল। কাহারও ঘর হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকগণ হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু কোথায় যে তাহারা গমন করিল তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কিন্তু নীলের সাটা গ্রহণ করিবার পরই কোথা হইতে আসিয়া তাহারা পুনরায় উপনীত হইল। যাহার যতগুলি গরু আছে, তাহার প্রত্যেকগুলিই প্রায় প্রত্যহ পাউন্ডে গমন করিত। পাউন্ডের জরিমানা দিতে দিতে অনেক প্রজার অনেক গরু বিক্রয় হইয়া গেল। তাহার উপর পাউন্ডে দিবার সময় সেই সকল গরু ছিনাইয়া লইয়াছে, প্রজাগণের উপর এইরূপ নালিশ প্রায়ই ফৌজদারীতে উপস্থিত হইল; প্রমাণও হইয়া গেল। প্রজাগণ জরিমানা দিয়া ও জেল খাটিয়া পরিশেষে নীলকরগণের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই সকল কারণ ব্যতীত আর যে কতরূপ উপায় বাহির করিয়া নীলকরগণ প্রজাগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার সমস্ত অবস্থা বর্ণন করা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর কার্য্য নহে। কেবলমাত্র আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই সকল বিষয় বর্ণন করিতে আমি বিরত হইব।

॥ ১৮ ॥

একদিবস দেখিলাম তিনটি লোক আমাদিগের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন, ও ৮।১০ জন লাঠিয়াল উহাদগিকে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ লোক তিনটিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে কৌতূহল আসিয়া উপস্থিত হইল; কারণ, দেখিলাম উহাদিগের মস্তক প্রায় ৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত; তাহার উপর দুই তিন অঙ্গুলি লম্বা নীলের চারা সকল বাহির হইয়া মস্তককে একেবারে আবৃত করিয়া

ফেলিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেখিলাম, তাহারা একস্থানে উপনীত হইয়াছে। ঐ স্থানে পাড়ার যাবতীয় ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশন করিতেন। যখন যাঁহার অবকাশ হইত, তখনই তিনি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কোনরূপ প্রস্তাব, পরামর্শ, তর্ক-বিতর্ক, ভালোমন্দ বিচার প্রভৃতি সকলই সেই স্থানে বসিয়া হইত। ভদ্রলোক গণের মধ্যে দুই চারিজন প্রায় সর্বদাই সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে মন্ডল, তোমরা এতদিবস কোথায় ছিলে? তোমাদিগের নিমিত্ত অনুসন্ধান করা না হইয়াছে এমন স্থানই নাই। কিন্তু কোন স্থানে তোমাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমাদিগের মাথার উপর কি?"

এই কথার উত্তরে মন্ডল কহিল "আর কি বলিব, মহাশয়! নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগের এই দশা ঘটিয়াছে। জমিতে নীল বুনানী করিবার পরিবর্তে পরিশেষে আপনাপন মস্তকের উপর নীল বপন করিতে হইয়াছে।"

ভদ্রলোক। কোথায় তোমাদিগের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে?

মন্ডল। কুঠিতে।

ভদ্রলোক। সেই স্থানে তোমরা গমন করিলে কেন?

মন্ডল। আমরা কি ইচ্ছা করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম? আমাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ভদ্রলোক। কিরূপে তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতো আমরা কিছুই জানিতে পাই নাই। তোমরা কোথায় চলিয়া গিয়াছ, অনুসন্ধান করিয়া তোমাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না, কেবলমাত্র ইহাই আমরা শুনিয়াছিলাম।

মন্ডল। আজ প্রায় দশ দিবস হইল, এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা এই দিকে আসিতেছিলাম, এরূপ সময় প্রায় ২০।২৫ জন লাঠিয়াল কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগের উপর পতিত হইল ও বলপূর্বক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব আমাদিগকে দেখিয়াই গালি গালাজ করিলেন ও পরিশেষে দরয়ানদিগের জমাদারকে ডাকিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন "যে পর্য্যন্ত ইহারা নীল বুনানী করিতে সম্মত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাদিগের মস্তকের উপর নীল বপন করা হইবে। যে পর্য্যন্ত ইহারা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া উহা রেজেস্টারী করিয়া না দিবে, সেই পর্য্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাদিগের মস্তকের উপর সেই পর্য্যন্ত নীলের চারা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে"!

সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমাদিগের মস্তকের উপর উত্তমরূপে কাদা লাগাইয়া, তাহার উপর নীলের বীজ বপন করা হইল। আমাদিগের সাধ্য নাই যে উহাতে আমরা অসম্মত হই, বা মস্তক হইতে উহা বিচ্যুত করিয়া ফেলি; কারণ প্রত্যেক আদেশ লঙঘনের নিমিত্ত সাহেব ২৫।২৫ হাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপব অনাহারে আমাদিগকে এই কয় দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সমস্ত দিবসেব মধ্যে আহারের ব্যবস্থা ছিল, ধান্য মিশ্রিত এক পোয়া কাঁচা চাউল। এরূপ অবস্থায় নীল বুনিতে সম্মত না হইয়া আর কত দিবস আমরা থাকিতে পারি? সুতরাং আমরা নীলের সাটা গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছি দলিল ও লেখাপড়া করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছি; তথাপি আমরা এখনও অব্যাহতি পাই নাই। এই দরয়ানগণের উপর আদেশ হইয়াছে যে, এই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে আমাদিগকে ঘুরাইয়া, আমাদিগের অবস্থা প্রজামাত্রকেই দেখাইবে। তাহার পর আমাদিগকে পুনরায় কুঠিতে লইয়া যাইবে। যখন আমরা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া দলিল লেখাপড়া ও রেজেষ্টারি করিয়া দিব, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে।

মন্ডলগণের এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের চক্ষুতে জল আসিল। তাঁহারা আর কোনরূপেই স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ইহারা তোমাদিগকে লইয়া যাউক। দেখি আমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারি কি না"। এই বলিয়া যে কয়জন ভদ্রলোক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই স্থান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। দরয়ানগণও [য] মন্ডলগণকে লইয়া সেই স্থান হইতে গ্রামের অপর স্থানে গমন করিতে লাগিল। বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত আমরাও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর গমন করিবার পরই দেখিতে পাইলাম গ্রামের কতকগুলি প্রজা রৈ রৈ শব্দে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে বংশ দন্ড, কাহারও হস্তে সড়কি ফলতঃ, যে যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইযাছে। উহারা আসিয়াই দরয়ানগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রহারের ভয়ে দরয়ানগণ মন্ডলদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরিশেষে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, উহা পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোকদিগেরই কান্ড! তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া লোকজন সংগ্রহ পূর্ব্বক মন্ডলদিগকে নীলকরগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

এই ঘটনার দুই দিবস পরেই গ্রামের মধ্যে একটি বৃহৎ সভা আহূত হইল, ঐ সভায়

নিতান্ত দরিদ্র প্রজা হইতে ধনশালী ভদ্রলোক পর্য্যন্ত সকলে উপস্থিত হইলেন। তথায় ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, এখন হইতে কিছুতেই আর নীলকরগণের বশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। কেহই নীল বুনানী করিবেন না; নীলকুঠির কোন কর্মচারীকে গ্রামের ভিতর একেবারে প্রবেশ করিতে দিবে না। ইহাতে গ্রামস্থ সমস্ত লোককে জেলে গমন করিতে হয়, তাহাতেও সকলে প্রস্তুত থাকিবেন। গ্রামের সীমান্তে নীলকরের কোন লোকজন আসলে সমস্ত প্রজা একত্র হইয়া ইহাদিগকে উত্তমরূপে প্রহার দিয়া সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবেন। আরও সাব্যস্ত হইল, গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে এক একটি ডঙ্কা থাকিবে। এক স্থান হইতে ডঙ্কাধ্বনি হইবামাত্র সমস্ত ডঙ্কা নিনাদিত হইবে। ঐ ডঙ্কা রব শুনিয়া সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যে স্থান হইতে প্রথম ডঙ্কাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সেইদিকে গমন করিবেন। কারণ ডঙ্কাধ্বনি উত্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই দিকে নীলকরগণ আসিয়া কোনরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

প্রকাশ্য সভায় এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইবার পর হইতেই সেইরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল। নীলকর সাহেবও এই সকল বিষয় অবগত হইয়া একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। সভার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়, তাহা দেখবার নিমিত্ত কোনরূপ কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া, দুই একজন নিম্ন পদস্থ কর্মচারীকে গ্রামের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য গ্রামের মধ্যে পদক্ষেপ করিবা মাত্রই তাহারা বিশেষরূপ অবমানিত হইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। এই সকল বিষয় ক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কর্ণগোচর হইল। কোন কোন প্রজার বিপক্ষে ফৌজদারিতে নালিশ উপস্থিত হইতে লাগিল; তথাপি কিন্তু প্রজাগণ আপন আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইল না।

॥ ১৯ ॥

এই গ্রামের প্রজাগণের অবস্থা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের প্রজাগণ আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে লাগিল। তাহারাও নীল বুনানী বন্ধ করিয়া পূর্ব কথিত প্রজাগণের মতানুসারে চলিতে লাগিল। কলিকাতায় কয়েকখানি সংবাদপত্রও এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের দুঃখ কাহিনী সর্ব্বসাধারণের ও গভর্ণমেন্টের কর্ণগোচর করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ই অগ্রণী হইয়াছিলেন।

যে সময়ে গ্রামের মধ্যে এই সকল অবস্থা ঘটিতেছিল, সেই সময় গ্রামের কয়েকজন প্রধান লোক নীলকরের চাকুরি করিতেন; কিন্তু যে নীলকর সাহেবের সহিত প্রজাগণের এইরূপ মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহারা সেই সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন না, অপর সাহেবের অধীনে অপর কুঠিতে থাকিতেন। এক দিবস তাঁহাদিগের মধ্যে দুই তিনজন বাটিতে আগমন করেন ও অপরাপর সকলকে কহেন, "কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা প্রবল পরাক্রমশালী নীলকরের বিপক্ষে দন্ডায়মান হইয়াছ? মকর্দ্দামা প্রভৃতিতে যে সকল অর্থের ব্যয় হইবে, তাহা না হয় চাঁদা করিয়া সংগ্রহ হইতে পারে; কিন্তু তোমাদিগেব লোকবল কোথায়? লোকবল না থাকিলে এই সকল কার্য্যে কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে।"

তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন কি তাঁহাদের মনিবের পরামর্শ মত প্রজাগণের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু অনেকেই তাহার পর অনুমান করিয়াছিলেন যে সাহেবদিগের পরামর্শ অনুযায়ী এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের কথার উত্তরে অপরাপর ভদ্রলোক কহিলেন, "আমাদিগের অর্থের কিছু টানাটানি আছে; কিন্তু লোকবলের কিছুমাত্র অল্পতা নাই। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে এখনই দেখাইতে পারি যে, আমরা কত লোক একত্র মিলিত হইয়া এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

"ভাল একবার দেখাও দেখি তোমাদিগের কিরূপ লোকবল আছে?"

"এখন সময়টি ঠিক নয়, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, কৃষক মাত্রই এখন বাটিতে নাই, সকলেই আপন আপন কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছে। তথাপি দেখি এই অসময়েও কতগুলি লোককে এই স্থানে সমবেত করিতে সমর্থ হই।"

এই বলিয়া একজন নিকটবর্তী একটি প্রকান্ড ডঙ্কার নিকট গমন করিলেন ও ঐ ডঙ্কাটি লইয়া একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদের উপর উত্থিত হইয়া উহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারিবার ডঙ্কাধ্বনি হইবার পরই চতুর্দিক হইতে ডঙ্কারব সকল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই ডঙ্কারবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় ছিল, সে সেইরূপ অবস্থায় আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল তাহারা কৃষিকার্য্য উপযোগী দ্রবাদি হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইল; অর্থাৎ কাহারও স্কন্ধে লাঙ্গল, কাহারও হস্তে পাঁচনী, কাহারও হস্তে নিড়ানি, কাহারও হস্তে দা, কাহারও হস্তে কোদালি ইত্যাদি;

যাহারা স্নান করিতে গমন করিতেছিল, তাহারা তৈলাক্ত কলেবরেই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আসিবার কালীন পথিমধ্যে বাঁশ কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইল, তাহাই লইয়া উপস্থিত হইল। যাহারা আপন আপন বাটি হইতে আগমন করিল, তাহারা সুসাজে সজ্জিত হইয়াই আসিল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে বর্শা, সড়কি, কাহারও হস্তে তরবাবি কাহারও কাহারও হস্তে বা সেকেলে পলিতা জ্বালা বন্দুক। এইরপুপ অবস্থায় লোকজন সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেইস্থানে এত লোকের সমাগম হইল যে, তথায় তখন তাহাদিগের দাঁড়াইবার আর স্থান হইল না। তখন কি করা যায়, ও কিরপুপ উপায়ে উহাদিগকে নিবৃত্ত করা যায় তাহার পরামর্শ হইতে লাগিল। ভদ্রলোকদিগেব মধ্যে একজন এই অবস্থা দেখিয়া, তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত কবিবার মানসে কহিলেন, "গ্রামের দক্ষিণ মাঠে নীলকবগণের কতকগুলি লোক আসিয়া গ্রামস্থ প্রজাগণের গরু ঘিরিয়া লইয়া যাইতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই "মার মার" শব্দে গ্রামের দক্ষিণ দিকস্থ প্রকান্ড ময়দানের দিকে গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রকান্ড ময়দান একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি জনস্রোত বন্ধ হইল না। নিজের গ্রাম ব্যতীত অপর গ্রামস্থ লোকজন আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বকথিত নীলকরদিগের কর্ম্মচারিগণের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন কোন গতিকে উহাদিগকে নিবৃত্ত করাই স্থির হইল। পরিশেষে গ্রামস্থ ভদ্রলোক সমস্ত সেই ময়দানে উপনীত হইয়া সমবেত প্রজামন্ডলীকে কহিলেন "এই মাঠ হইতে প্রজাগণের গরু সকল ঘিরিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নীলকর দিগের কতকগুলি লোক আসিয়াছিল ও গরু সকল লইয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, সেই সময় আমাদিগকে এই স্থানে আসিতে দেখিয়া গরু সকল পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে; এই স্থানে সমবেত থাকা আর আমাদিগের কর্তব্য নহে। সকলে আপন আপন স্থানে প্রতিগমন কর। যে সকল গরু উহারা লইয়া যাইতেছিল, সেই সকল গরু ঐ রহিয়াছে।" এই বলিয়া ঐ মাঠে যে সকল গরুর পাল চরিতে গিয়াইছল তাহাই সেই সকল সমবেত প্রজামন্ডলীকে দেখাইয়া দিলেন। প্রজাগণও তাহাই বুঝিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। সেই সময় ৩।৪ জন মন্ডল যাহারা পূর্ব্বে নীলকর দিগের নিকট বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহারা সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, "আমরা যে স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, সেই স্থান হইতে সাহেবেব কুঠি অধিক দূর নহে, ঐ দেখা যাইতেছে। সুতরাং আমরা সকলে ঐ কুঠির ভিতর

গমন করিয়া উহা লুঠ করিতে চাই, ও কুঠি ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার ইঁট নিকটবর্তী "দোয়ার" ভিতর নিক্ষেপ করিতে চাই। ইহাতে আপনারা কি পরামর্শ দেন"।

মন্ডলদিগের কথা শুনিয়া ভদ্রলোকগণ কহিলেন "না, এরূপ কার্য্যে আমাদিগের হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। আমরা কেবল আত্মরক্ষা করিব, অন্যায় রূপে আক্রমণ করিব না। তোমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে যদি আমরা হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে এই নীলকুঠি এখনই সমূলে উৎপাটিত করিয়া এই দোয়ার গর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি সত্য, কিন্তু তাহা করা আমাদিগের কর্তব্য নহে; কারণ এ কার্য্য করিলে গভর্ণমেন্ট আমাদিগের বিপক্ষে দন্ডায়মান হইবেন। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে রাজা বিপক্ষ হইবেন, সে রূপ কার্য্যে প্রজাকে কখনও হস্তক্ষেপ করিতে নাই। যে কার্য্যের নিমিত্ত তোমাদিগকে এখানে আনা হইযাছে, আমাদিগের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন প্রজাগণকে লইয়া আপনাপন স্থানে প্রস্থান কর।"

মন্ডলগণ এই কথা বুঝিয়া প্রজাগণের সহিত সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু একদল গমন করিতে না করিতে আর একদল সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। তাহাবা গমন করিতে করিতে আর একদল সেইস্থানে দেখা দিতে লাগিল। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে লোক আগমন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র গ্রামস্থ প্রজাগণই সমবেত হইবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু এখন দেখা গেল যে, ১০।১২ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রাম সকল হইতে প্রজাগণ আসিয়া নীলকরগণের বিপক্ষে দন্ডায়মান হইতে লাগিল। এইরূপে কত লোক যে সেই দিবস সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ বলেন, ২০।৩০ হাজার লোক হইবে, কেহ বলেন, ৫০ হাজার লোকের কম হইবে না।

যাহারা লোকবল দেখিতে চাহিয়াছিলেন এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, এখন ইহারা নীলকরগণে বিপক্ষে দন্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে। নীলকরগণ ও এই অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, ঐ গ্রামের প্রজাগণকে সহজে বশ্যতাস্বীকার করাইতে পারিবেন না।

এই ঘটনার পর দিবসই তাঁহারা আপন আপন চাকুরি স্থানে গমন করিলেন; কেহ বা চাকরি পরিত্যাগপূর্বক আপন গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন, কেহ বা যে পর্য্যন্ত এইরূপ গোলযোগ রহিল, সেই পর্য্যন্ত আর গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন না।

নীলকর সাহেব প্রজার একতা দেখিয়া তাহাদিগের উপর আর বলপ্রয়োগ করিতে

সাহসী হইলেন না; কিন্তু গ্রামস্থ প্রজা ও ভদ্রলোকদিগের নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতে অনবরত নালিশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণও চাঁদর উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল মকর্দ্দামার যোগাড় করিতে লাগিলেন। মকর্দ্দামায় প্রজাগণ জয়ী হইতেও লাগিলেন, পরাজিত হইতেও লাগিলেন। দুই একজন জেলেও গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই, অর্থদন্ড হইতে লাগিল। একটি মকর্দ্দামার কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। নীল ভাঙ্গিয়া হরিদ্রা রোপন করা হইয়াছিল, এইরূপ নালিশ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চৌধুরি নামক জনৈক ভদ্রলোক ও তাঁহার কয়েকজন প্রজার নামে আনীত হয়। ঐ মকর্দ্দামা ভদ্রলোকটি ও প্রজাগণের জরিমানা হইয়াছিল ১৭০০ টাকা কিন্তু আপীলে সমস্ত টাকাই ফেরত পাওয়া যায়।

ঐ গ্রামের প্রজাগণ এরূপ ভাবে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল যে, সে বন্ধন নীলকর সাহেব কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে ঐ গ্রামের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। পরিশেষে তিনি ঐ গ্রামের নীলের দাদন একেবারে উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদিগের নিজের জমিতে, নিজ আবাদে নীল বুনানী কবিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে প্রজাগণের বিশেষ কোনরূপ আপত্তি না থাকায় তাহারা কিছুই বলিত না। তাঁহারা আপনারাই নীল বপন করিতেন, আপনারাই উহা কর্ত্তন করিতেন ও পরিশেষে আপনারাই উহা উঠাইয়া কুঠিতে লইয়া যাইতেন। প্রজাগণ তাঁহাদিগকে কোনরূপে সাহায্য করিত না, তাঁহারাও প্রজাগণের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিতেন না।

একদিবস অতি প্রত্যুষে গ্রামের একজন চৌকিদার আসিয়া গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোক দিগকে সংবাদ প্রদান করিল যে, গ্রামের বাহিরে "দোয়ার উপর একটি অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় একটি ঘোড়ার জিন, গদি, লাগাম প্রভৃতি অদ্য দুই দিবস পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে; কেহই উহা লইয়া যাইতেছে না, বা ঐ সকল দ্রব্য যে কাহার তাহাও কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা কেহ কেহ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম দেখিলাম চৌকিদার যাহা বলিয়াছিল তাহা প্রকৃত। এই অবস্থা দৃষ্টে পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

চৌকিদার তাহাই করিল; থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল; পরদিবস থানার দারোগা ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে

দারোগা এই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনি এখনও কোন না কোন থানায় আছেন, কি পেনসন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

অনুসন্ধান করিয়া দারোগাবাবু জিন লাগাম সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিষয় অবগত হইতে পারিলেন না। যে কৃষকগণ নিকটবর্ত্তী ময়দানে চাষ আবাদ করিত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না, সকলেই কহিল উহা যে কোথা হইতে আসিযাছে বা কে যে উহা ঐ স্থানে রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা কিছুই অবগত নহে। কেবলমাত্র দুই দিবস উহা ঐরপ্তপ অবস্থায় রক্ষিত আছে। দারোগাবাবু জিন লাগাম অনেককে দেখাইলেন, কিন্তু উহা যে কাহার দ্রব্য তাহাও কেহ বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইবপ্তপ অবস্থায় সমস্ত দিবস অনুসন্ধান করিয়া দারোগাবাবু জিন লাগাম সমভিব্যহারে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এরপ্তপ সময় তাঁহার থানাব একজন হেড কনেষ্টবল আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন. ইনি অপর একটা অনুসন্ধানের নিমিত্ত অপর স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই কার্য্য সমাপ্ত কবিয়া থানায় প্রত্যাগমন করিবার কালীন, দারোগা বাবুকে সেই স্থানে দেখিতে পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, ও উভয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি পরামর্শ করিয়া, সেই দিবস স্থানেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। যে স্থানে দারোগাবাবু এই অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিবার কোনরপ্তপ স্থান বা লোকালয় ছিল না; সুতরাং আমাদিগের গ্রামের মধ্যেই তাঁহাকে আগমন করিতে হয়, ও সেই স্থানেই জনৈক ভদ্রলোকের বাটিতে তাঁহারা রাত্রি যাপন করেন। যে স্থানে জিম লাগাম পাওয়া গিয়েছিল, সেই স্থান হইতে ঐ গ্রাম অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান হইবে।

॥ ২০ ॥

গ্রামের ভিতর রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস অতি প্রত্যুষে তাঁহারা পুনরায় সেই স্থানে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে গমন করিলাম।

সেই স্থানে গমন করিয়া দারোগা বাবু ও হেড কনষ্টেবল [য] উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে গ্রামস্থ দুই একজন ভদ্রলোকও যোগদান

করিয়াছিলেন; অনেকক্ষণ পরামর্শের পর, ইহাই সকলের অনুমান হইল; যে কোন অশ্বারোহী হয়ত এই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। কোন কারণে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন এবং অশ্বটিও যাহাতে বিশ্রাম করিতে পারে, এই নিমিত্ত জিন লাগাম খুলিয়া ঐ অশ্বত্থ ডালের উপর রাখিয়া দেন। পরিশেষে স্নান করিবার মানসেই হউক, বা জলপান করিবার মানসেই হউক, হয়ত তিনি এই "দোয়ায় গমন করিয়াছিলেন ও জলমধ্যে পতিত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছেন। অশ্বটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে, এরপ্তপ কোন লোক সেই স্থানে না থাকায়, সেও পরিশেষে কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং জিন লাগাম প্রভৃতি যে স্থানে রক্ষিত ছিল, সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। এই অনুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে দোয়ার অভ্যন্তরীণ জলের ভিতর উত্তমবপ্তপে অনুসন্ধান করিলে সেই অশ্বারোহীর মৃতদেহ প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

এইরপ্তপ পরামর্শ হইবার পর, নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রাম হইতে কয়েকজন ধীবরকে সেই স্থানে ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা জালের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দারোগাবাবু [য] তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন, "তোমরা [য] এই দোয়ার মধ্যে উত্তমরপ্তপে অনুসন্ধান কবিয়া দেখ যে ইহার ভিতর কাহারও মৃতদেহ পাওয়া যায় কিনা; এইরপ্তপ অনুসন্ধান করিবার কালীন তোমরা যে সকল মৎস ধরিতে সমর্থ হইবে, তোমাদিগের পারিশ্রমিক স্বরপ্তপ তোমরা তাহা অনায়াসেই [য] গ্রহণ করিতে পারিবে।

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া ধীবরগণ জাল হস্তে একে একে দোয়ার মধ্যে অবতরণ করিতে লাগিল। এই দোয়াটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহার জল বহুদূর ব্যাপী কিন্তু সকল স্থানেরই গভীরতা অধিক নহে নিতান্ত সামান্য। কেবলমাত্র এক স্থানের গভীরতা অত্যন্ত অধিক; প্রচন্ড রৌদ্রের সময়ও ঐ স্থানের জল শুকাইয়া যায় না। সেই সময় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের সমস্ত স্থানের জল একেবারে শুকাইয়া যায়; ভরসার মধ্যে কেবলমাত্র এই দোয়াই থাকে। উহারই জলে সেই সময় সকলে জীবন মরণ করিতে সমর্থ হন। যে স্থলে এখন এই দোয়াটি দেখিতে পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানে উহা ছিল না। ঐ স্থানের উপর দিয়া পূর্ব্বের ভৈরব নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। নানা দিক দিগন্তর হইতে বাণিজ্য পোত সকল ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিত বলিয়া উহার দুই পার্শ্ব সমৃদ্ধিশালী নগরীতে শোভিত ছিল; কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের সেই প্রবল বেগ চলিয়া গিয়াছে, সমৃদ্ধিশালী নগর সকল এখন হতশ্রী

হইয়া পড়িয়াছে। নৌ-বাণিজ্য সকল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে সেই সেই পূর্ব সমৃদ্ধির চিহ্নস্বরপ্তপ ঐ ভৈরব নদীর কেবল চিহ্ন আছে মাত্র, প্রবল বর্ষার সময় উহার স্থানে স্থানে জল দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় কেবলমাত্র বুঝিতে পারা যায যে ঐস্থান দিয়া সময়ে কোন প্রবল নদী প্রবাহিত হইত। যে দোয়ার কথা এখন বিবৃত হইতেছে; ইহা সেই ভৈরব নদীর অংশ বিশেষ। ঐ স্থানের জল অতিশয় গভীর বলিয়া বার মাসই ঐ স্থানে জল থাকে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ ঐ জলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। ঐ দোয়ার কিয়ৎদূর ব্যবধানে পূর্বকথিত নীলকুঠি স্থাপিত। নীলকর সাহেব সেই স্থানেই অবস্থান করিতেন। ঐ দোয়া হইতে জল উত্তোলন করিয়া নীল প্রস্তুতেব সমস্ত কার্য্যই নির্বাহ হইত। এখন পর্যন্ত ঐ দোয়া পূর্বের ন্যায় বর্তমান আছে, কিন্তু নীলকুঠির চিহ্নমাত্রও নাই।

॥ ২১ ॥

ধীবরগণ ঐ দোয়ার ভিতর অবতরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম উহার চতুঃপার্শ্বে; অর্থাৎ যে সকল স্থানে অল্প অল্প জল আছে সেই সকল স্থানে জাল ফেলিয়া মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কোন স্থানেই কোন রপ্তপ সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে গভীর জলের দিকে গমন করিল অল্প জলে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর জলে জাল সকল ফেলিতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও কোনরপ্তপ মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

আমাদিগের দেশে বিল, দোয়া প্রভৃতিতে মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত ধীবরগণ একরপ্তপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান জলময় হইয়া গেলে, যে যে স্থানে একটু গভীর জল হয়, অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসেও যে যে স্থানে জল থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানে "ডাল" দিয়া থাকে। বৃক্ষের ডাল প্রভৃতি কাটিয়া ঐ সকল ডাল অধিক পরিমাণে জলের মধ্যে এক স্থানে রাখিয়া দেওয়ার নামই "ডাল দেওয়া"। রৌদ্রের তেজে জল যখন উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় ঐ জলাশয়ে ছোট বড় মৎস্য সকল ডাল দেওয়া জলের মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করে। এইরপ্তপে কিছু দিবস ঐ ডাল সকল ঐরপ্তপে জলের মধ্যে থাকিবার পর, যখন ধীবরগণ বেশ বুঝিতে পারে যে ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৎস সকল আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা ঐ ডাল দেওয়ার স্থানের চতুঃপার্শ্বে জাল দ্বারা উত্তম রপ্তপে ঘিরিয়া রাখিয়া,

ঐ ডাল সকল ক্রমে উঠাইয়া ফেলে। এই রপ্তপে সমস্ত ডাল স্থানান্তরিত করা হইলে, তখন সেই জাল বেষ্টিত জলের মধ্যস্থিত মৎস্যগণকে উহারা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে সমর্থ হয়।

॥ ২২॥

যে দোয়ার কথা আমি বলিতেছি ঐ দোয়ার মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ বপ্তপ অনেক ডাল দেওয়া ছিল। ধীবরগণ জলে যখন মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতেছিল সেই সময় একটি লোক হঠাৎ সেই স্থান হইতে বলিয়া উঠিল এই ডালের মধ্যে কি যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এই কথা শুনিয়া সকলেই সেই ডালের নিকট গমন করিল। যে স্থানে ঐ জল রক্ষিত ছিল তাহা কিনারা হইতে অধিক দূরে নহে ও সেই স্থানের জলও অতিশয় গভীর নহে। ঐ স্থান স্নান করিবার ঘাট বা মনুষ্যগণের ব্যবহার করিবার স্থান হইতে কিছুদূর অন্তব।

সকলে ঐ স্থানে গমন করিয়া উত্তমরপ্তপে দেখিতে লাগিলেন। সেই ডালের অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার জলের মধ্য হইতে যেন একটি মনুষ্যের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচব হইতে লাগিল। তখন দাবোগাবাবু সেই স্থানের ডালগুলি উঠাইয়া দিতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে ডালগুলি উঠাইয়া একটু দূরে রাখা হইল। ডালগুলি উত্থিত করিবার পর, যখন সেই স্থান বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল তখন সকলেই উত্তমরপ্তপে দেখিতে পাইলেন যে ঐ স্থানে দুই খণ্ড কাষ্ঠ উত্তম রপ্তপে প্রোথিত করা রহিয়াছে, এরা ঐ কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়ের সহিত একটি মৃতদেহ বন্ধন অবস্থায় আছে উহা এরপ্তপ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে উহা কোন রপ্তপেই ভাসিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই অবস্থা দেখিয়া দারোগাবাবু ঐ কাষ্ঠ দুই খণ্ডের সহিত মৃতদেহ যে রপ্তপ অবস্থায় আছে, সেইরপ্তপ অবস্থায় উঠাইতে কহিলেন। তাঁহার এই আদেশ নিতান্ত সহজে প্রতিপালিত হইল; কারণ মৃতদেহের সহিত ঐ কাষ্ঠ দুইখণ্ড উপড়াইয়া ফেলিবার পর কাষ্ঠের সহিত তখন মৃতদেহটি ভাসিয়া উঠিল।

মৃতদেহটি তাহার পর জল হইতে উঠাইয়া সেই দোয়ার ধারে রক্ষিত হইলে দেখা গেল যে, উহা প্রায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পচিয়া তাহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও বুঝিতে পারা গেল যে, উহার গলদেশ ও পদযুগল

একগাছি দড়ি দ্বারা ঐ দুই কাষ্ঠখণ্ডের সহিত উত্তম রূপে ঐ জলের ভিতর বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই অবস্থা দেখিয়া দারোগাবাবু তাঁহার সমভিব্যাহারি সেই হেড কনষ্টেবলকে কহিলেন "দেখিলে"?

হেড কঃ। দেখিলাম তো।

দারোগা। এখন কি বোধ হইতেছে?

হেড কঃ। আর কি বোধ হইবে? এখন হত্যা মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া "প্রথম এতলা" লিখুন।

দাবোগা। ইহা যে খুন তাহার আর বোধহয় কোন ভুল নাই?

হেড কঃ। আর সন্দেহ কি হইবে।

দারোগা। ইহাকে কি রূপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বোধ হয়? জীবিত অবস্থায় ইহাকে এই রূপে বন্ধন করিয়া জলের মধ্যে রাখা হইয়াছে, কি মৃত্যুর পর ইহাকে এই রূপ অবস্থায় রাখা হইয়াছে?

হেড কঃ। জীবিত অবস্থায় এরূপ করিয়া বাঁধিয়া পরিশেষে জলের মধ্যে পুতিয়া রাখা সহজ নহে।

দারোগা। কেন?

হেড কঃ। তাহা হইলে সে আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করিত, সুতরাং জীবিত লোককে এই রূপে বন্ধন করিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত করা নিতান্ত সহজ হইত না।

দারোগা। লোকসংখ্যা অধিক হইলে জীবিত অবস্থায় এরূপ ভাবে জলের মধ্যে প্রোথিত করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা হইতে পারে না।

হেড কঃ। হইতে পারে; লোকসংখ্যা অধিক হইলে উহাকে অনায়াসেই [য] ধরিয়া এরূপ করিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার মুখ বন্ধ করিবে কি প্রকারে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিত, ও তাহার চীৎকার শব্দ এই সদর রাস্তার ধারে নিশ্চয়ই কোন না কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত!

দারোগা। কেন, উহার মুখ বাঁধিয়া দিয়া বা তাহা ধরিয়া কি এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না?

হেড কঃ। পারে না, এ কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু, তাহার কোন রূপ চিহ্ন

তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

দারোগা। সে যাহা হউক, অনুসন্ধান করিলে ক্রমে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এখন আমাদিগের প্রধান কার্য এই যে, এই মৃতদেহ কাহার, তাহা অগ্রে স্থির করা।

হেড কঃ। তাহা তো নিশ্চয়ই। তদ্ব্যতীত, আরও একটি বিষয় আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য।

দারোগা। কি?

হেড কঃ। মৃতদেহটি প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল; উহার পরিধানে কেবল মাত্র একখানি ধুতি ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র নাই; যে ব্যক্তি অশ্বারোহনে গমনাগমন করে, সে একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রায়ই যায় না; তাহার চাদর, পিরান, ও জুতা প্রভৃতি নিশ্চয়ই থাকে। এরপ্তপ অবস্থায় ঐ সকল দ্রবের অনুসন্ধান করিয়া দেখা আমাদিগের একান্ত কর্তব্য। অনুসন্ধান করিলে হয়তো ও সকল দ্রব্যও এই দোয়ার কোন না কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে।

॥ ২৩ ॥

হেড কনষ্টেবলের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু ধীবরগণকে পুনরায় বস্ত্রাদির অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। ধীবরগণ দারোগাবাবুর আদেশ প্রতিপালন পূর্বক সঙ্গে সঙ্গে জাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরপ্তপে প্রায় এক ঘন্টাকাল অনুসন্ধান করিবার পর, একজনের জালে একটি গাটরি বাঁধিয়া গেল। ঐ গাট্‌রিটি উঠাইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে একটি পিরান, একখানি চাদর, ১ জোড়া জুতা ও দুইখানি বড় বড় ইট একখানি গামছায় বাঁধা রহিয়াছে। উহা দেখিয়া অনুমিত হইল, যে ঐ সকল দ্রব্যও ঐ দোয়ার ভিতর কে ফেলিয়া দিয়াছে, ও যাহাতে উহা ভাসিয়া উঠিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত উহার সহিত দুইখানি [য] থান ইট বাঁধিয়া দিয়াছে।

এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইবার পর, হেড কনষ্টেবল ঐ মৃতদেহটি "দোয়ার" পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া সদর রাস্তার উপর রাখিলেন ও পথিকগণের প্রত্যেককে ডাকাইয়া উহা দেখাইতে লাগিলেন। "দোয়ার" ভিতর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, এই কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেক বালক, যুবক ও স্ত্রীলোক উহা দেখিবার নিমিত্ত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, গোচারকগণ আপন আপন গরু ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া, সেই স্থানে আগমন করিল।

কৃষকগণ কৃত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঐ মৃতদেহ যে কাহার, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এইরপ্তপে দেখিতে দেখিতে সেই স্থান একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। হেড কনষ্টেবল তাহাদিগের প্রত্যেককেই উহা দেখাইতে লাগিলেন।

॥ ২৪ ॥

দারোগাবাবু কয়েকজন চৌকিদাব লইয়া ঐ দুই খানি ইট সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। নিকটবর্তী কোন স্থানে ঐ প্রকারের আরও ইট আছে কি না, তাহা দেখিবার বাসনায় তিনি সেই স্থান হইতে গমন করিলেন। কারণ যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিযাছে, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ জমিসকল কৃষিকার্য্যে ব্যবহপ্তত হইয়া থাকে, সুতরাং উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঐ প্রকারের [য] কোন ইট থাকিবার সম্ভাবনা নাই নিতান্ত নিকটে কোন গ্রামও নাই, সুতরাং ইটও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইট কেবল নিকটবর্ত্তী নীলের কুঠিতে ছিল। ঐ কুঠির কোন স্থানে ঐ প্রকারের আরও ইট পড়িয়া আছে কিনা, বা উহার কোন স্থান হইতে ঐ ইট দুইখানি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে কিনা, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত দারোগাবাবু ধীরে ধীরে সেই নীলকুঠিতে গমন করিলেন, জনৈক নীলকর সাহেব ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; সুতরাং একজন সামান্য দেশীয় কর্ম্মচারীর পক্ষে সেই স্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ নহে তথাপি, দারোগাবাবু আপন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে সেই নীলকুঠির হাতার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে, সেই কুঠির গ্লাসকট নামক নীলকর সাহেবও অশ্বারোহণে তাঁহার দাওয়ানের সহিত কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। পুলিস কর্ম্মচারিগণকে সেই কুঠির মধ্যে গমন করিতে দেখিয়া, সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারী দাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহারা" কে?"

উত্তরে দাওয়ান কহিলেন, "অনুমান হইতেছে, উহারা পুলিস কর্ম্মচারী। কোন কার্য্যের নিমিত্ত বোধহয়, কুঠির মধ্যে গমন করিতেছে।"

পুলিস-কর্ম্মচারীকে বল, 'যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি, সেই পর্য্যন্ত উহারা যেন আমার কুঠির ভিতর গমন না করে। কোন আবশ্যিক থাকে, আমি প্রত্যাগমন করিলে যেন আমার নিকট আগমন করে।"

সাহেবের এই কথা শুনিয়া দাওয়ান [য] সেই পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট গমন

করিলেন ও সাহেবের আদেশ তাঁহাকে কহিলেন। সাহেবের কথা শুনিয়া দারোগাবাবুকে নির্ব্বাক হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল; কারণ, তিনি সাহেবের বিনা অনুমতিতে ঐ স্থানে বলপূর্ব্বক গমন করিতে পারেন, আইন অনুযায়ী এমন কোন বিষয় তিনি এ পর্য্যন্ত সাহেবের বিপক্ষে প্রাপ্ত হন নাই।

॥ ২৫ ॥

দারোগাবাবু সেই সময় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে একটু অপমানিত হইয়া, তাঁহাকে সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এই নিমিত্ত তাঁহার মনে একটু ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু সেই ক্রোধভাব প্রকাশ না করিয়া, তিনি সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দারোগাবাবু মনে মনে একটু ক্রোধান্বিত হইয়া নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইলেন ও যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু সেইস্থানে আসিয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, এই কথা ক্রমে নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রামের চৌকিদারগণ অবগত হইতে পারিল, ও ক্রমে ক্রমে তাহারাও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ সকল চৌকিদারগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ মৃতদেহটি উত্তমরূপে দেখিয়া কহিল, "মৃতদেহের অবস্থা এখন যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে উহা যে কাহার মৃতদেহ, তাহা চিনিতে পারা নিতান্ত সহজ নহে; কিন্তু ইহার অবয়বের সহিত "নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামের রামগতি বিশ্বাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে"।

চৌকিদারের এই কথা শুনিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, "রামগতি বিশ্বাস" কে, ও তিনি কি কার্য্য করিয়া দিন যাপন করিয়া থাকেন?

চৌকিদার। তিনি নীলকুঠিতে গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগা। কর্ম্ম করেন তো নীলকুঠিতে কিন্তু, থাকেন কোথায়? নীলকুঠির হাতার মধ্যেই কি তাঁহার বাসা আছে?

চৌকিদার। না, তিনি নীলকুঠির কার্য্য করেন বটে, কিন্তু নীলের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব নাই। তিনি 'মালের' গোমস্তা; নিজের বাড়িতে বসিয়াই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

দারোগা। যে গ্রামে রামগতি বিশ্বাসের বাটী তুমি কি সেই গ্রামের চৌকিদার?

চৌকিদার। হাঁ মহাশয়, আমি সেই গ্রামের চৌকিদার; কিন্তু আমার বাটি সেই গ্রামে

নহে, নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে আমার বাসস্থান।

দারোগা। যে গ্রামের তুমি চৌকিদার, সেই গ্রামে তুমি কোন্ সময় গমন করিয়া থাক?

চৌকিদার। সেই গ্রামে গমন করিবার আমার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, চৌকি দিবার নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে আমি সেই গ্রামে গমন করিয়া থাকি।

দারোগা। তুমি যে গ্রামেব চৌকিদার সেই গ্রামের আর কোন চৌকিদার এখন এই স্থানে উপস্থিত আছে?

চৌকিদার। না, আর কাহাকেও তো এখন এখানে দেখিতে পাইতেছি না।

দারোগা। রামগতি বিশ্বাস এখন তাঁহার গ্রামে উপস্থিত আছেন কিনা, তাহা তুমি বলিতে পার?

চৌকিদার। না, আমি তাঁহাকে চারি পাঁচ দিবস দেখি নাই।

দারোগা। তুমি এখন ইহা গিয়া জানিয়া আসিতে পারিবে কি? যে তিনি এখন কোথায় আছেন?

চৌকিদার। কেন পাবিব না, মহাশয় আমি এখনই গমন করিতেছি।

চৌকিদারের কথা শুনিয়া দারোগাবাবুর মনে দুইটি কারণে কেমন একরূপ সন্দেহ হইল। প্রথমতঃ রামগতি বিশ্বাসের সঙ্গে ঐ মৃতদেহের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীযতঃ, যে নীলকর সাহেব তাঁহাকে কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহারই অধীনে তিনি গোমস্তাগিরি কার্য্য করিয়া থাকেন।

দারোগাবাবুর মনে এইরূপ একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বামগতি বিশ্বাসের সংবাদ আনিবার নিমিত্ত কেবলমাত্র সেই চৌকিদারকে প্রেরণ না করিয়া হেড-কনষ্টেবলকেও তাহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান হইতে রামগতি বিশ্বাসের বাসস্থান ৩/৪ ক্রোশের অধিক নহে। দারোগাবাবুর আদেশ পাইবামাত্র হেড কনষ্টেবল তাঁহার অশ্বে আবোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি রামগতির গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে যাহারা রামগতি বিশ্বাসকে চিনিত, দারোগাবাবু তাহাদিগকে ডাকাইয়া, ঐ মৃতদেহ দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ কহিল, ইহা রামগতি বিশ্বাসের মৃতদেহ, কেহ কহিল রামগতি বিশ্বাসের আকৃতি এই মৃতদেহের সহিত অনেকটা মিলে বটে কিন্তু বোধ হইতেছে, ইহা তাঁহার মৃতদেহ নহে।

॥ ২৬ ॥

এইরূপে ক্রমে চারিঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। চারিঘণ্টা পরে সকলেই দেখিতে পাইলেন, যে দিকে হেড কনষ্টেবল গমন করিয়াছিলেন সেই দিক হইতে দুই ব্যক্তি অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়া দারোগাবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উহাদিগের মধ্যে একজন সেই হেড কনষ্টেবল, অপর ব্যক্তি রামগতি বিশ্বাসের সহোদর।

রামগতির ভ্রাতা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে সেই মৃতদেহের নিকট গমন করিলেন ও উহা দেখিবামাত্রই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ঐ মৃতদেহ তাঁহার ভ্রাতারা দারোগাবাবু তখন তাঁহাকে কহিলেন "এখন আর বোদন করিবার সময় নাই; ইহার পরে রোদন করিবার বিস্তর সময় প্রাপ্ত হইবেন, এখন যে ব্যক্তি কর্তৃক আপনাব ভ্রাতার এই অবস্থা ঘটিয়াছে সেই ব্যক্তি যাহাতে ধৃত হয় ও উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই আপনার কর্ত্তব্য। বৃথা রোদন করিয়া সময় নষ্ট করিবার এখন সময় নহে।"

রামগতির ভ্রাতা। আমাকে কি করিতে হইবে, মহাশয়?

দারোগা। আপনি বেশ চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা আপনার ভ্রাতা রামগতির মৃতদেহ?

রামগতির ভ্রাতা। উত্তমরূপে চিনিতে পারিয়াছি ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দারোগা। এই চাদর, পিরাণ, গামছা ও জুতা কাহার?

রামগতির ভ্রাতা। ইহাও আমার ভ্রাতার।

দারোগা। এই জিন লাগাম প্রভৃতি?

রামগতির ভ্রাতা। ইহাও আমাদিগের। দাদা যখন কোন স্থানে অশ্বারোহণে গমন করিতেন তখন তিনি এই জিন লাগামই ব্যবহার করিতেন।

দারোগা। আজ কয় দিবস হইতে তিনি তাঁহার বাটি পরিত্যাগ করিয়াছেন?

রামগতির ভ্রাতা। অদ্য চারিদিবস হইল।

দারোগা। তিনি কোথায় গমন করিয়াছিলেন?

রামগতির ভ্রাতা। তাঁহার মনিব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কুঠিতে

আসিয়াছিলেন।

দারোগা। কি কারণে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা আপনি কিছু বলিতে পারেন?

রামগতির ভ্রাতা। তাহা আমি অবগত নহি; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কুঠির দুইজন বরকন্দাজের সহিত গমন করিয়াছিলেন।

দারোগা। আপনি যতদূর অবগত আছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট বলুন দেখি।

দারোগাবাবুর কথার উত্তরে রামগতির ভ্রাতা কহিলেন, "আমার ভ্রাতা রামগতি বিশ্বাস অনেক দিবস হইতে নীলকর সাহেবের অধীনে গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করিতেন। আমাদিগের সামান্য একটু জমিদারী আছে। উহা বরাবরই আমাদিগের খাস দখলে ছিল। কিন্তু নীলকব সাহেব ঐ জামিদাবী টুকু আমাদিগের নিকট হইতে কোনরূপে গ্রহণ করিবার মানসে অনেকরূপ চেষ্টা করেন, ও পরিশেষে আমাদিগের উপর অনেকরূপ অত্যাচাব আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের অত্যাচার আমরা কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া, পরিশেষে সাহেবের প্রস্তাবেই সম্মত হই, ও যে গ্রামখানি আমাদিগের জমিদারী ছিল, তাহা দশ বৎসরেব জন্য ইজারা করিয়া দিই। ঐ গ্রামের আদায় উসুল করিবার নিমিত্ত নীলকর সাহেব দাদাকে গোমস্তাগিরি কার্য্য প্রদান করেন। তিনি যে আমাদিগের উপব বিশেষ রূপ সদয় ছিলেন বলিয়া এই কার্য্যে দাদাকে নিযুক্ত করেন, তাহা নহে। ঐ গ্রামে অপর লোক আগমন করিলে, তিনি সহজে প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় উসুল করিতে পারিবেন না, ও প্রজাগণকে সহজে নীলের দাদন লইতে স্বীকার করাইতে পারিবেন না বলিয়াই, তিনি দাদার হস্তে ঐ কার্য্যভার অর্পণ করেন। দাদাও তাঁহার সাধ্যমত মনিবের কার্য্য যতদূর সম্ভব, তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন সাহেবও তাঁহার উপর বিশেষরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন।

সম্প্রতি কয়েকখানি গ্রামে প্রজাগণ কিছুতেই নীল বুনানি করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে, ও নীলকুঠির সাহেবের বিপক্ষে দন্ডায়মান হইয়াছে; দাদা যে গ্রামের তহশীলদারী করিতেন, ঐ গ্রামের প্রজাগণও নীল-বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া, নীলবুনানি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহেবকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে। সাহেব এইসমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, এক দিবস স্বয়ং আসিয়া দাদার নিকট উপস্থিত হন, ও তাঁহাকে কহেন "তুমি প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার নীলবুনানি কার্য্য বন্ধ করিয়াছ। তোমার অভিমত না পাইলে তোমার প্রজাগণ কখনই তোমার বিপক্ষে দন্ডায়মান হইয়া, আমার নীলের কার্য্যে ক্ষতি করিতে সাহসী

হইত না। তুমি প্রজাগণকে এখনও বুঝাইয়া দাও, ও যাহাতে তাহারা নীল বুনানি করে তাহার বন্দোবস্ত কর; নতুবা, ইহার নিমিত্ত তোমাকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইবে।''

সাহেবের কথার উত্তরে দাদা কহিলেন, ''ধর্ম্মাবতার। আমি আপনার চাকরী করি; যাহাতে আপনার অনিষ্ট হয়, এরপ্তপ কার্য্যে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিব না। প্রজাগণ প্রকৃতই আমার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। যাহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নীল বুনানি করে, তাহার নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে বিস্তর বুঝাইয়া দেখিয়াছি ও অনেকরপ্তপ ভয়প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু, তাহারা কিছুতেই আমার ও কথায় সম্মত হয় নাই। এরপ্তপ অবস্থায় আমি প্রজাগণকে যে পুনরায় সহজে বশীভূত করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি প্রজাগণের কোনরপ্তপ পরামর্শের মধ্যে নাই।''

দাদার কথা শুনিয়া সাহেব অতিশয় ক্রোধভাব প্রকাশ কবিলেন ও কহিলেন, ''আমি সব শুনিয়াছি ও সকল কথা জানিতে পারিয়াছি। এই গ্রামের সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ হইয়া নীল বুনানি বন্ধ করার মুলই তুমি। আমি তোমাকে এখনও বলিতেছি যে, সহজে প্রজাগণ যাহাতে অবাধ্য না হয়, তাহার চেষ্টা তুমি কর, ও দুই দিবস পরে আমার নিকট কুঠিতে গিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া আইস''। এই বলিয়া সাহেব সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; দাদার আর কোন কথা তিনি শ্রবণ করিলেন না।

॥ ২৭ ॥

এদিকে দুই দিবস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, দাদা সাহেবের কুঠিতে আর গমন করিলেন না। তিনি কুঠিতে গমন করিলেন না দেখিয়া আমি দাদাকে কহিয়াছিলাম ''দাদা, সাহেব আপনাকে কুঠিতে গমন করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু কৈ আপনি তো গমন করিলেন না?''

উত্তরে দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন ''সাহেব যখন আমার উপর কুপিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট কুঠিতে কি আর গমন করিতে আছে! উহারা সাহেব লোক যদি রাগভরে হঠাৎ আমাকে অবমাননা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারিব; সুতরাং, সেই স্থানে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। না হয় চাকরী হইতে সাহেব আমাকে জবাব দিবেন।'

দাদার এইরপ্তপ কথা শুনিয়া আমি আর কোন কথা কহিলাম না। দাদাও কুঠিতে

গমন করিলেন না। চারি পাঁচ দিবস এইরূপে অতীত হইয়া যাইবার পর, এক দিবস একজন বরকন্দাজ একখানি পত্রসহ আমাদিগের বাটিতে উপস্থিত হইল। পত্রখানি নায়েবের স্বাক্ষরিত উহাতে লেখা ছিল, "আমি শ্রীযুক্ত মনিব সাহেবের আদেশ অনুসারে লিখিতেছি। আপনাকে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আপনাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু, আপনি তাঁহার আদেশ লঙঘন কবিযা এ পর্য্যন্ত কুঠিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। এই কারণে মনিব বাহাদুর আপনাব উপর বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু, আমি অনেক রূপে বলিয়া তাঁহাকে নিবস্ত করিয়াছি। তথাপি আপনি একবার এখানে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার নিকট আসিলে আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া মনিব বাহাদুরের নিকট লইয়া যাইব।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই দাদা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমি কিন্তু কহিলাম, "যখন নায়েব মহাশয় আপনাকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে চাহিতিছেন, তখন একবার গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। কারণ, যে মনিবের নিকট চাকরী করিতে হইবে, তিনি যখন ডাকিতেছেন, তখন তাঁহাব নিকট গমন করা উচিৎ; ও তাঁহার আদেশ কোনরূপেই লঙঘন করা কর্ত্তব্য নহে"।

আমার কথা শুনিয়া দাদা কহিলেন, "তোরা ছেলে মানুষ বুঝিস কি! সাহেব লোক কুপিত হইলে যে পর্য্যন্ত সেই ক্রোধ প্রশমিত না হয়, সেই পর্যন্ত কিছুতেই তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিতে নাই।"

আমাকে এইরূপে বলিয়া দাদা নীলকুঠির নায়েবকে একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের সারম্মর্ম এইরূপ : আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম; কিন্তু আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন ও মনিব বাহাদুরকে ক্ষমা করিতে কহিবেন। দিন দিন আমার শরীরের অবস্থা যেরূপে হইতেছে, তাহাতে আমার বর্ত্তমান চাকরী যে করিয়া উঠিতে পারিব, সে আশা আমার নাই; সুতরাং, আমি আমার চাকরী পরিত্যাগ করিলাম। মনিব বাহাদুরকে বলিয়া আপনি অন্য একজন গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার নিকট আমার নিকাশ দিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে অবকাশ গ্রহণ করিব। শরীর সুস্থ হইলে মনিব বাহাদুর যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় আমাকে চাকরী প্রদান করেন, তাহা হইলে পুনরায় আপনাদিগের তাঁবেদারিতে হাজির হইব। আমার ইচ্ছা

ছিল, আপনার নিকট স্বয়ং গমন করিয়া এই সকল বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিব কিন্তু, অধীনের অবস্থা ভাল না থাকায়, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ্ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন ও যত শীঘ্র পারেন আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে এরপ্তপ লোক পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।"

দাদা পত্রখানি সেই বরকন্দাজের হস্তে প্রদান করিলেন ও তাহাকে বকসিস্ বলিয়া একটি টাকাও দিলেন। বরকন্দাজ পত্র লইয়া হৃপ্তষ্ট মনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর, দুই দিবস আর কোন লোকজন বা চিঠিপত্র কুঠি হইতে আসিল না। তৃতীয় দিবসে অতিশয় প্রত্যুষে দুইজন বরকন্দাজ আসিযা আমাদিগের বাটিতে উপস্থিত হইল। উহাদিগের সহিত সাহেবের স্বাক্ষরিত একখানি হুকুমনামা ছিল। উহাতে লেখা ছিল, "খুবারি সিংহ বরকন্দাজের উপর এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে সে অপর যে কয়েকজন বরকন্দাজের সাহায্য লওয়া বিবেচনা করিবে, তাহাদিগেব সাহায্য লইয়া গোমস্তা রামগতি বিশ্বাসকে আমার সম্মুখে লইয়া আসিবে। হুকুম জরুবী বিবেচনায় যেন তামিল করা হয়।"

হুকুম দেখিয়া দাদা কহিলেন, "এবার দেখিতেছি কুঠিতে গমন না করিলে আর চলিবে না। সহজে যদি আমি গমন না করি, তাহা হইলে বরকন্দাজগণ অবমানিত করিয়া যে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরপ্তপ অবস্থায় গমন করাই কর্ত্তব্য।"

এই বলিয়া দাদা দুইজন বরকন্দাজকে ২টি করিয়া ৪টি টাকা প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, "এই লও তোমাদিগের খোরাকী; ও এস্থানে আহারাদি করিয়া অপেক্ষা কর। অদ্য আহারান্তে বৈকালে বা কল্য প্রত্যুষে তোমাদিগের সহিত কুঠিতে গমন করিব।"

বরকন্দাজগণ রামগতি বিশ্বাস গোমস্তাকে উত্তমরপ্তপে জানিত ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া খোরাকী বা বক্সিস্ বলিয়া কিছু কিছু লইয়া যাইত; সুতরাং, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহারা সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই দিবস বৈকালেও দাদা গমন করিলেন না। পর দিবস অতিশয় প্রত্যুষে তিনি আপন ঘোঁড়াটি সজ্জিত করিয়া তাহার উপর আরোহণ পূর্ব্বক সেই বরকন্দাজদিগের সঙ্গে গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "অদ্যই, নাগাইত সন্ধ্যা প্রত্যাগমন করিব। তবে যদি কোন কারণে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তাহা হইলে এক দিবস বিলম্ব হইলেও হইতে পারে।"

এই বলিয়া দাদা বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন; কিন্তু, সে দিবস আর

প্রত্যাগমন করিলেন না। পরদিবসও ফিরিয়া আসিলেন না। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় আমাদিগেব একটি ভৃত্য আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় বাবু কখন ফিরিয়া আসিলেন?" উত্তরে আমি কহিলাম, "তিনি তো এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করেন নাই।" আমার কথা শুনিয়া ভৃত্য কহিল "কেন আসিবেন না? তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহা ঘোড়া [য] বাগানের ভিতর চরিতেছে; আমি এখনই দেখিয়াই আসিলাম।"

পরিচারকের কথা শুনিয়া আমি তাহার সহিত বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার কথা প্রকৃত। যে অশ্বে আরোহণ করিয়া, দাদা বাটি হইতে বহির্গত হয়িা গিয়াছিলেন, সেই অশ্বটি প্রত্যাগমন করিয়াছে; কিন্তু, দাদা প্রত্যাগমন করেন নাই। অশ্বটিকে দেখিয়া আমার মনে একটু আশঙ্কা হইল। একবার ভাবিলাম, হয়তো দাদাকে কোন স্থানে উহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, তিনি হয়ত আহত হইয়া কোন স্থানে পতিত আছেন; নতুবা, প্রত্যাগমন করিলেন না কেন? আবার ভাবিলাম, পৃষ্ঠের উপর হইতে যদি সে তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া আসিবে, তাহা হইলে জীন তো উহাতেই থাকিবে; কিন্তু, যখন উহার পৃষ্টোপরি জীন নাই, তখন সে কখনই দাদাকে ফেলিয়া দেয় নাই, হয় তো কোন স্থানে চরিয়া খাইবার নিমিত্ত দাদা উহাকে "ছাঁদিয়া" বাঁধিয়া দিয়াছিলেন দড়া [য] ছিঁড়িয়া হয়তো সেই স্থান হইতে পলায়ন কবিয়াছে [য]। মনে মনে এইরপ্তপ নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম সত্য, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদিকে দাদার প্রত্যাগমনের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল মনে মনে ততই আশঙ্কা আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল। অদ্য দাদার অনুসন্ধানে গমন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারই সেই ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বাটি হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, এরপ্তপ সময়ে জমাদার গিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া, তাঁহারই সহিত আমি এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।"

॥ ২৮ ॥

রামগতির ভ্রাতার কথা শুনিয়া দারোগাবাবু স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্য দেখিতেছি সাহেব দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সাহেব ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া এখন বলিতে পারি।"

রামগতির ভ্রাতার সমস্ত কথা শেষ হইয়া গেলে, দারোগাবাবু মনে করিলেন, "এরূপ অবস্থায় কুঠির ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য কিনা?" পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সাহেব কর্ত্তৃক যখন একবার অপমানিত হইয়া সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন সেই সাহেবের বিরুদ্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া, তাঁহার কুঠির হাতার মধ্যে আর কখনই প্রবেশ করিবেন না।

দারোগাবাবু যখন মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, সেই সময় রামগতির ভ্রাতা দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! ঐ খুবারি সিং জমাদার আসিতেছে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন, যে আমার কথা সত্য কিনা!" এই বলিয়া একজন পশ্চিম দেশীয় লোককে রামগতির ভ্রাতা দেখাইয়া দিল।

দারোগাবাবু দেখিলেন, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা, অঙ্গে একটি মৃজাই আঁটা, ও মস্তকে একটি প্রকান্ড সাদা পাগড়ি বাঁধা একজন পশ্চিমদেশীয় লোক, প্রায় পাঁচ হস্ত পরিমিত একটি বংশদন্ড স্কন্ধে ফেলিয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছে। রামগতির ভ্রাতা খুবারি সিং জমাদার বলিয়া ইহারই পরিচয় দারোগাবাবুকে প্রদান করিয়াছিল।

দারোগাবাবুব আদেশ অনুযায়ী দুইজন চৌকিদার তাহার নিকট গমন করিয়া কহিল, 'ঐ দারোগাবাবু বসিয়া আছেন, ও তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন।'

চৌকিদারের [য] কথা শুনিয়া খুবারি সিং দারোগাবাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামগতির ভ্রাতা দারোগাবাবুকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে তিনি খুবারিকে কহিলেন। খুবারি ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিল, "বিশ্বাস মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। গোমস্তাবাবু আমাদিগের সহিত কুঠিতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে লইয়া সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দেন, ও গোমস্তাবাবুকে কহেন, 'তুমি দাওয়ানখানায় গিয়া অপেক্ষা কর। সময়মত আমি তোমাকে ডাকিব।' সাহেব বাহাদুরের এই কথা শুনিয়া গোমস্তাবাবু দাওয়ান খানার দিকে গমন করিলেন। আমরাও আমাদিগের বাসায় চলিয়া আসিলাম। ইহার পর যে কি হইয়াছে, তাঁহা আর আমরা অবগত নহি।

দারোগা। গোমস্তাবাবু কি তাঁহার ঘোড়ায় চড়িয়াই সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন?

খুবারি সিং। ও বাবা! ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেবের সম্মুখে যায় কাহার সাধ্য? হাতার ভিতর একটি গাছে ঘোড়াকে বাঁধিয়া তিনি আমাদিগের সহিত হাঁটিয়া গমন

করিয়াছিলেন।

দারোগা। ঘোড়ার জীন কোথায় রাখিয়া দিয়াছিলেন?

খুবারি সিং। ঘোড়া হইতে জীন লাগাম প্রভৃতি কিছুই খোলেন নাই। লাগাম দিয়া ঘোড়াটিকে গাছের সহিত বাঁধিয়াছিলেন। জীন তাহার পিঠের উপরই ছিল।

খুবারি সিং-এর কথা শুনিয়া দারোগাবাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন, এখন নীলকুঠির হাতার মধ্যে গিয়া অনুসন্ধান করিতে না [য] পারিলে, প্রকৃতকথা বাহির হইবে না। এখন তাঁহার অনুমান হইল, হয়তো নীলকর সাহেব ক্রোধ সংবরন করিতে না পারিয়া, রামগতি বিশ্বাসকে প্রহার করেন ও সেই প্রহার সহ্য করিতে না পারায় রামগতির মৃত্যু হয়, পরিশেষে তাঁহার মৃতদেহ এইরূপুপ উপায়ে গোপন করিয়া রাখা হয়। আরও তিনি অনুমান করিলেন যে এই কার্য্য যদি সাহেবের নিজ হস্তে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি যে স্থানে বাস করিয়া থাকেন বা যে স্থানে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ইহা সেই স্থানেই হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু সেই স্থান কুঠির অভ্যন্তরীণ অপর কোন স্থান নহে; তাঁহার ঘর অর্থাৎ যে স্থানকে "খাস কামরা" বলিয়া থাকে সেই ঘর বা তাহার সংলগ্ন অপর কোন ঘর। ঐ স্থানে যদি এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে অপর কোন সাক্ষী পাইবার উপায় নাই। এক মেম সাহেব সেই স্থানে থাকেন; তিনি যদি দেখিয়াও থাকেন তাহা হইলে তিনি কি আপন স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন? অপর লোকের মধ্যে তাঁহার বেহারাগণ ও সর্দ্দার বেহারা সর্বদাই সাহেবের নিকট থাকে। তাহারা সে সকল বিষয় জানিলেও জানিতে পারে; কিন্তু বেহারাগণের মধ্যে সকলে এক সময়ে উপস্থিত থাকে না। সময়মত আসিয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে সেইসময় কোন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত ছিল তাহাই বা স্থির করিতে পারা যাইবে কি প্রকারে? সর্দ্দার বেহারা যদি সকল কথা স্বীকার করে ও সকল কথা বলিয়া দেয় তাহা হইলেই সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবে; নতুবা এই মোকদ্দমার কিনারা করা নিতান্ত সহজ হইবে না। আর এক কথা যদি এই অনুমানই প্রকৃত হয় তাহা হইলে সাহেব নিজে কিন্তু আসিয়া দোয়ার মধ্যে এইরূপুপ অবস্থায় ঐ লাস প্রোথিত করিয়া যান নাই; আর নিজেও যদি আসিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ লাস কিন্তু নিজে বহন করিয়া লইয়া আসেন নাই, বিশেষ একজনে কখনই ঐ লাস বহন করিতে পারে না। এরূপুপ অবস্থা অপরাপর লোকজন দ্বারা যে এই লাস আনীত ও প্রোথিত হইয়াছিল তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুসন্ধান করিয়া যদি ঐ সকল লোককে বাহির করিতে সমর্থ হই ও তাহারা যদি প্রকৃত কথা কহে তাহা হইলেও এই মোকদ্দমার

কিনারা হইবার কিছু না কিছু আশা হয়।

॥ ২৯ ॥

সাহেবের সর্দ্দার বেহারা ও অপরাপর বেহারাগণ সকলেই সাঁওতাল দেশীয় লোক, বঙ্গদেশে তাহারা "বুনো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নীলকুঠির অধিকাংশ কার্য্যই ঐ বুনোদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহারা সাহেবদিগের বিশেষ রূপ অনুগত। উহারা স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া নীলকর সাহেবদিগের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ও তাঁহাদিগের সমস্ত লালসা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। উহাদিগের বাস করিবার নিমিত্ত নীলকরগণ কুঠির ব্যয়ে ঘর সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। ঐ সকল ঘর প্রায় একস্থানেই প্রস্তুত হয় এবং উহাতে সকলে মিলিয়া বাস করিয়া থাকে। এই রূপে যেস্থানে উহারা বাস করিয়া থাকে সেই স্থানটি ক্রমে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিগণিত হয়। তখন উহা "ধাওড়া" বা "বুনো ধাওড়া" নামে অভিহিত হয়। ঐ সকল ধাওড়া প্রায়ই নীলকুঠির অতিশয় সন্নিকটে বা কুঠির সীমার মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। বুনো বা বুনো-রমণীগণকে অপর কোন স্থানে প্রায় কর্ম্ম করিতে হয় না। নীলকুঠির সমস্ত কার্য্যই তাহাদিগ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ও নীলকুঠি হইতেই তাহারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। যে কুঠির কথা এই স্থানে বিবৃত হইতেছে, উহাতেও বুনোগণের ধাওড়া ছিল। এই ধাওড়া স্থাপিত ছিল—পূর্ব্বকথিত দোয়ার একপার্শ্বে ও নীলকুঠির অতি সন্নিকটে সাহেবের সর্দ্দার বেহারা ও অপরাপর বুনো পরিচারকগণও ঐ ধাওড়ায় বাস করিত।

দারোগার এই সকল বিষয় জানিতে পারিয়া, তাঁহার সমস্ত লোকজন ও খুবারি সিং-এর সহিত সেই "ধাওড়ার" ভিতর গমন করিবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ পরীক্ষার্থ জেলায় পাঠাইয়া দিলেন।

"ধাওড়ার" ভিতর প্রবেশ করিলে যাহাতে উহা হইতে কোন লোক বাহিরে গমন করিতে না পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন; অর্থাৎ "ধাওড়ার" চতুষ্পার্শ্বস্থ ময়দানের মধ্যে কতকগুলি চৌকিদার রাখিয়া দিলেন।

এইসময় দারোগাবাবুর মনে হইল যে তিনি বাঙ্গালী হইয়া সাহেবের বিপক্ষে খুনি মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং, এ সংবাদ এখন তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া টেলিগ্রাফ যোগে এই সংবাদ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রেরণ করিবার মানসে তিনি পূর্ব্বোক্ত

হেড কনষ্টেবলকে রেলওয়ে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ স্থান হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক হইবে না।

যে সবডিবিজনের অন্তর্গত স্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তথায় সেই সময় একজন ইংরাজ বিচারক ছিলেন। হেড কনষ্টেবল তাঁহার নিকট, ও জেলার পুলিশের বড় সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফযোগে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠাইয়া দিলেন।

"লোকনাথপুরের নীলকুঠির সংলগ্ন দোয়ার জলের ভিতর একটি মৃতদেহ বন্ধন অবস্থায পাওযা গিয়াছে। অনুমান হইতেছে নীলকুঠির সাহেবদ্বারা অথবা তাঁহারই আদেশে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়াছে ও পরিশেষে ঐ মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া বাখা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ অনুসন্ধান কবিতেছে। বোধ হইতেছে আর একটু প্রমাণ সংগৃহীত হইলেই, নীলকর সাহেবকে এই মোকদ্দমায় ধৃত করিতে হইবে ও তাঁহাকে কয়েদ অবস্থাতে বাখিতে হইবে। গোচবার্থ এই সংবাদ প্রেবিত হইল।"

"ধাওড়ার" চতুর্দিকে চৌকিদারগণকে সংস্থাপিত কবিযা দাবোগাবাবু কয়েকজন অনুচরেব সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও সেই স্থানে সেই সময় যে সকল পুরুষ উপস্থিত ছিল; তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া নানারপ্তপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন।

যে সময় দারোগাবাবু সেই "ধাওড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময তথায় প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। বুনোরা আপন আপন কার্য্য সমাপন করিয়া আহারাদি করিবার মানসে, সেই সময় আপন আপন ঘরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবের সর্দ্দার বেহারাও সেই সময় ঐ "ধাওড়ায়" আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও কয়েকজন বেহারা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিল।

দারোগাবাবু "ধাওড়ার" ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বুনোগণের মধ্যে যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় একজন নীলকুঠির কর্ম্মচারি সেই স্থান দিয়া গমন করিতে ছিলেন। দারোগাবাবু যেরপ্তপ ভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা তিনি সেইস্থানে কিছুক্ষণ দন্ডায়মান হইয়া দর্শন করেন ও পরিশেষে সাহেবের নিকট গিয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিয়া দেন, আরও বলিয়া দেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বরকন্দাজের জমাদাব খুবারি সিংকে সেই স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; তাহাকে কোন প্রকারে কুঠিতে আগমন করিতে দিতেছেন না।

এই সংবাদ অবগত হইয়া সাহেব পুলিশ কর্ম্মচারিগণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাওয়ানকে দারোগাবাবুর নিকট প্রেরণ করেন, তাঁহা দ্বারা

দারোগাবাবুকে বলিয়া পাঠান যে, পুলিশ তাঁহার বিপক্ষে যেরপ্তপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এরপ্তপ ভাবে কার্য্য করিলে কিছুতেই পুলিশের মঙ্গল হইবে না। "ধাওড়ার" সমস্ত লোকজনকে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি নীলকুঠির কার্য্যের যেরপ্তপ ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরিশেষে সেই ক্ষতি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত সাহেবের বরকন্দাজের প্রধান জমাদার ও সর্দ্দার বেহারা প্রভৃতিকে তিনি যেরপ্তপ অন্যায় রপ্তপে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কোন রপ্তপেই আইনসঙ্গত নহে। দারোগাবাবু যদি এখনই তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া বেআইনি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাহেবও সেইরপ্তপ বেআইনি কার্য্য করিয়া এখনই তাহাদিগকে কুঠিতে আনয়ন করিবে ও পরিশেষে বেআইনি
করা অপরাধে দারোগাবাবুই অপদস্থ হইবেন। ইহা যেন তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখেন।

সাহেব তাঁহার দাওয়ানকে যেরপ্তপ বলিয়া দিয়াছিলেন দাওয়ানও সেই স্থানে আসিয়া দারোগাবাবুকে তাহা বলিতে কিছুমাত্র ভুলিলেন না। অধিকন্তু আরও দুই চারি কথা বাড়াইয়া বলিলেন।

নীলকরগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করা যে কিরপ্তপ দুরপ্তহ ব্যাপাব তাহা দারোগাবাবু পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিলেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যাহাতে তিনি এই মকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ হন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবেন। এবং সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দাওয়ানের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি সাহেবকে যাইয়া বলুন আমি তাঁহার বিপক্ষে কোনরপ্তপ অনুসন্ধান করিতেছি না। বিশেষ তাঁহার বিপক্ষে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কুঠির হাতা হইতে কখনই তিনি আমাকে বহির্গত করিয়া দিতে পারিতেন না। রামগতি বিশ্বাসকে কে মারিয়া জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, কাহা দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমি এই স্থানের প্রজাগণকে দুই চারিকথা জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র। ইহাতে সাহেবের বিরুদ্ধাচারণ আমি কেন করিব? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ, রামগতি বিশ্বাস সাহেবের একজন কর্ম্মচারী, সে সাহেবের কুঠিতে আগমন করিয়াছিল, ও বোধহয় কুঠি হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন তাহার এই

দশা ঘটিয়াছে। আজকাল নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রজাগণ একরূপ নীল বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নীলকুঠির কর্ম্মচারিগণকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগের হৃদয়ে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে; সুতরাং এই কার্য্য যে প্রজাগণ দ্বারা না হইবে তাহাই বা বলি কি প্রকারে? এরূপ অবস্থায় যদি আমি সাহেবের প্রজাগণকে জিজ্ঞাসাবাদ না করি বা তিনি নিজেও যদি আমাকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য প্রদান না করেন তাহা হইলে এই মকর্দ্দামাব কোনরূপেই কিনারা হইতে পারে না। আর যদি এই মকর্দ্দামার রহস্য বহির্গত না হয়, তাহা হইলে সাহেবের অনিষ্ট ভিন্ন কখনই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ প্রকৃত ঘটনা বাহির না হইলে সকলেই মনে করিবেন রামগতি বিশ্বাস প্রজাগণকে সাহায্য করিতেন বলিয়া সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছেন। যদি প্রজাগণের মনে এইরূপ সন্দেহের একবার উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সন্দেহ তাহাদিগের অন্তর হইতে কোনরূপেই দূরীভূত হইবে না; সুতরাং প্রজামাত্রেই সাহেবকে আর বিশ্বাস করিবে না। আর যদি তিনি প্রজাগণের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার নীলকুঠির কার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই সকল অবস্থা আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলিবেন, ও যাহাতে এই অনুসন্ধানে তিনি আমাকে সম্যক রূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা কবিবেন।”

দারোগাবাবু কথা শুনিয়া দাওয়ানজি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠি হইতে সংবাদ আসিল যে “ধাওড়ার” সমস্ত লোকদিগকে সাহেব ডাকিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত লোকই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল দারোগাবাবু কাহারও গতিরোধ করিলেন না। কেবলমাত্র ৪ জন লোককে তিনি গমন করিতে দিলেন না। ঐ চারিজন লোকের মধ্যে একজন সাহেবের সর্দ্দার বেহারা, আর একজন তাঁহার ঘরের বেহারা। অপর দুইজন সেই “ধাওড়ার” অধিবাসী, ও তাঁহারা সাহেবের কার্য্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

॥ ৩০ ॥

“ধাওড়ার” সমস্ত লোকজন যেমন সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলকুঠির উদ্দেশ্যে গমন করিল, দারোগাবাবু ও ঐ চারিজন লোক সমভিব্যহারে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের গ্রামের সীমানার মধ্যে আগমন করিলেন। দারোগাবাবু যে

সময় "ধাওড়ার" মধ্যে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় বুনোগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সাহেবের বেহারার নিকট হইতে কোন কথা জানিতে পারেন ও সেই কথা উপর নির্ভর করিয়া তিনি অপর তিনজনকেও সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যান ও সেইস্থানে বসিয়া উহাদিগকে উত্তম রূপে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন।

দারোগা। তোমার নাম কি বলিলে?

বেহারা। আমার নাম ছিদাম বুনো।

দারোগা। তুমি কত দিবস হইতে সাহেবের কর্ম্ম করিতেছ?

ছিদাম। আমি যতদিবস এখানে আসিয়াছি; বোধহয় ১৯/২০ বৎসব হইবে।

দারোগা। তোমাদিগের জাতির মধ্যে কেহ মিথ্যা কথা কহে না, কেমন?

ছিদাম। আমরা মিথ্যাকথা কহিব কেন? আমরা মনিবের চাকর; তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তখনই তাহা আমরা প্রতিপালন করিব; কিন্তু জীবন থাকিতে কখনই মিথ্যা কথা কহিব না।

দারোগা। আমি জানি যে প্রাণ থাকিতে তোমরা কখনই মিথ্যাকথা কহিবে না; এই নিমিত্তই তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই?

ছিদাম। কি জিজ্ঞাসা কবিতে চাহেন করুন।

দারোগা। তুমি রামগতি বিশ্বাসকে চিন?

ছিদাম। আমি অনেককে চিনি কিন্তু রামগতি বিশ্বাস কাহার নাম জানি না।

দারোগা। তোমার সাহেবের গোমস্তা আজ কয়েকদিবস হইল যে ঘোড়ায় চড়িয়া নীলকুঠিতে আসিয়াছিল, ও যে সেই স্থানে মরিয়া যায়।

ছিদাম। হাঁ! একজন মরিয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু সে কে, কি করিয়া থাকে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। সে কোথায় মরিয়াছিল?

ছিদাম। সাহেবের কামরার সম্মুখে।

দারোগা। কে তাহাকে মারিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না।

দারোগা। কিরূপে সে মরিয়াছিল?

ছিদাম। তাহাও আমি জানি না।

দারোগা। তবে তুমি কি জান?

ছিদাম। আমি এই জানি যে, আমার কাজের ছুটি হইলে সন্ধ্যার পরই আমি আমার ঘরে আসি, ও আহারাদি করিয়া রাত্রি ৯টা কি ১০টার সময় আমি শয়ন করি। তাহার পর সর্দ্দার আসিয়া আমাকে ডাকে। সর্দ্দারের কথা শুনিয়া আমি আমার ঘরের বাহিরে আসি। বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাই সর্দ্দার ও তাহার অপর দুইজন,—জানকী ও পবন—সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি বাহিরে আসিবামাত্রই সর্দ্দার কহে,—"সাহেব তোমাকে ডাকিতেছেন"। মনিব ডাকিতেছেন, এই কথা শুনিয়া আমি সর্দ্দারকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না, তখনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। সর্দ্দার আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একেবারে সাহেবের খাস কামরার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। সেই স্থানে সাহেবকে দেখিতে পাই না; কিন্তু, সেই স্থানে দাওয়ানজি মহাশয়কে দেখিতে পাই। সর্দ্দাব আমাদিগকে একটু দূরে রাখিয়া দাওযানজির নিকট গমন করে, ও তাঁহার সহিত কি পরামর্শ করিয়া তখনই আমাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করে ও কহে, "এই লোকটি হঠাৎ মরিয়া গিয়াছে। ইহাকে এই স্থান হইতে এখনই স্থানান্তরিত করিতে হইবে।" সর্দ্দারের কথা শুনিয়া মৃতদেহ ছুঁইতে প্রথমে আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম "এ ব্যক্তিকে ও কোন্ জাতি তাহা যখন আমরা অবগত নহি, তখন ইহাকে আমরা কিবপ্তপে স্থানান্তরিত করিব?" আমাদিগের কথার উত্তরে সর্দ্দার কহিল, "মনিবের কার্য্য আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে ছুঁইবো না বলিলে চলিবে কি প্রকারে? তাহার উপব সাহেব মদ খাইবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করিয়া বক্‌সিস্ দিতে চাহিয়াছেন। এরপ্তপ অবস্থায় এই কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। আমিও তোমাদিগের সহিত গমন করিতেছি।" এই বলিয়া সর্দ্দার সেই মৃতদেহের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। আমি সর্দ্দারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই মৃতদেহ কোথায় লইয়া যাইতে হইবে?" সর্দ্দার কহিল, "অধিকদূরে লইয়া যাইব না; এই দোয়ার মধ্যে উহাকে পুতিয়া এখনই আমরা চলিয়া আসিব।" এই কথা শুনিয়া আমরা আর কোন কথা কহিলাম না। একখানি চারিপায়ার উপর ঐ মৃতদেহটি স্থাপিত করিয়া আমরা তিন জনেই উহা লইয়া দোয়ার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। সর্দ্দার ও দাওয়ানজি আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দোয়ার সন্নিকটে একস্থানে উপস্থিত হইলে দাওয়ানজি ঐ মৃতদেহ সেইস্থানে নামাইতে কহিলেন আমরা উহা সেই স্থানে রাখিয়া দিলাম। সর্দ্দার দুইখানি "পিনের" কাষ্ঠ ও একটি মুদগর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পরিশেযে সর্দ্দার ও আমরা মিলিত হইয়া দোয়ার জলের মধ্যে অবতরণ করিলাম ও সেই স্থানে "পিন" দুইটি উত্তম রপ্তপে পুঁতিয়া ফেলিলাম। পরিশেষে ঐ

মৃতদেহটি সেই স্থানে লইয়া গিয়া জলের মধ্যে ঐ পিনের সহিত উত্তম রূপে বন্ধন করিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় সেই স্থানে দন্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। উহা জলের মধ্যে উত্তমরূপে বন্ধন করিবার পর কয়েকখানি "ডাল" উহার উপর রাখিয়া দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগের প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া পনেরটি টাকা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন ও যাইবার সময় বলিয়া দিলেন "একথা তোমরা কাহারও নিকট কোনরূপে প্রকাশ করিও না।" আমরা তিনজনেই সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলাম কিন্তু দাওয়ানজি মহাশয় ও সর্দ্দার সেই স্থানে থাকিলেন তাহার পর যে আব কি হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। ঐ মৃতব্যক্তির কাপড় জুতো তোমরা কি করিলে?

ছিদাম। তাহা আমরা জানি না। কাপড় জুতা প্রভৃতি কিছুই আমরা দেখি নাই।

দারোগা। তাহার ঘোড়ার জিন লাগাম প্রভৃতি?

ছিদাম। তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু ঐ গাছের ডালের উপর জিন লাগাম প্রভৃতি কি কি পড়িয়াছিল, তাহা পরে দেখিয়াছি কিন্তু উহা যে কাহারা রাখিয়াছিল তাহার কিছুই আমি অবগত নহি।

দারোগা। তোমরা ঐ স্থান হইতে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, "ধাওড়ায়" না সাহেবেব কুঠিতে।

ছিদাম। সাহেবের কুঠিতে আমরা যাই নাই। ধাওড়াতেই আমরা গমন করিয়াছিলাম।

দারোগা। সর্দ্দার কোথায় গমন করিয়াছিল?

ছিদাম। তাহা আমি জানি না। তাহাকে ও দাওয়ানজিকে আমরা দোয়ার ধারেই রাখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর যে তাহারা কোথায় গমন করিয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি।

দারোগা। এ কথা তোমরা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে?

ছিদাম। না।

দারোগা। কেন?

ছিদাম। এই কথা প্রকাশ করিতে একে দাওয়ানজি মহাশয় আমাদিগকে নিষেধ করিতে দিয়াছিলেন, তাহার উপর আমাদিগকে এ পর্যন্ত কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

ছিদামের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া দারোগাবাবু জানকী ও পবনকে ডাকিলেন, ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, ছিদাম যে রূপ বলিয়াছিল তাহারাও সেইরূপ কহিল। ইহার পরেই তিনি সর্দ্দারকে ডাকিলেন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সর্দ্দার সহজে কোন কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। সে কহিল, ''ছিদাম প্রভৃতি অপরাপর বুনোগণ যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা; আমরা কোন মৃতদেহ জলের ভিতর প্রোথিত করিয়া রাখি নাই, অথবা দাওয়ানজি মহাশয় বা সাহেব আমাদিগকে কোন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে কখন কহেন নাই।

॥ ৩১ ॥

সাহেবের সর্দ্দার বেহারা সর্ব্বপ্রথমে কোন কথা স্বীকার করিল না সত্য কিন্তু পরিশেষে সেও কোন কথা গোপন করিল না। পরে সে বলিয়াছিল, ''রামগতি বিশ্বাস গোমস্তাকে আমি চিনি। সাহেবের আদেশ অনুযায়ী তাহাকে নীলকুঠিতে আনয়ন করা হয়। বরকন্দাজ যখন রামগতিকে সাহেবের সম্মুখে আনিয়া সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত করে সেই সময় সাহেব উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া দাওয়ানজি খানায় গিয়া বসিতে কহেন। রামগতি দাওয়ানজির নিকট দাওয়ানজি খানায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিবার পর সন্ধ্যার সময় দাওয়ানজি মহাশয় পুনরায় সাহেবকে কহেন, রামগতি বিশ্বাস সমস্ত দিবস হাজির আছে, তাহার উপর কোনরূপ আদেশ এখনও হয় নাই। এই কথা শুনিয়া সাহেব তাহাকে তাঁহাকে খাস কামরায় আনিতে কহেন। সাহেবের আদেশে প্রতিপালিত হয়। দাওয়ানজি মহাশয় রামগতিকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। সাহেব তাহাকে দেখিয়া একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, ও কহেন, তুমি আমার চাকর হইয়া প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়াছ ও আমারই বিপক্ষে দন্ডায়মান হইয়াছ; সুতরাং ইহার দন্ড তোমাকে লইতে হইবে। এই বলিয়া তিনি জুতা সহিত সজোরে রামগতিকে এক পদাঘাত করেন। ঐ পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রামগতি সেই স্থানে পতিত হন। সাহেব তাহার উপর আরও দুই চারিবার পদাঘাত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। যাইবার সময় তিনি দাওয়ানজিকে বলিয়া যান যে অদ্য উহাকে গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখ, কল্য প্রাতে ইহার অপরাধের বিচার হইবে।

সাহেবের কথা শুনিয়া দাওয়ানজি রামগতিকে উঠাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু উঠাইতে

সমর্থ হন না। বামগতির অবস্থা দেখিয়া দাওয়ানজি প্রথমতঃ অনুমান করেন যে, সাহেবের প্রহাবে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সহজে গাত্রোত্থান করিতে পারিতেছে না; কিন্তু পরিশেষ জানিতে পাবেন, রামগতি বিশ্বাস ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এ অবস্থা জানিতে পারিয়া দাওয়ানজি মহাশয় তখনই গিয়া সাহেবকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রই সাহেব ও মেম সাহেব সেই স্থানে আসিযা উহাকে দেখিলেন ও বাঁচাইবার নিমিত্ত কত রূপ চেষ্টা কবিলেন; কিন্তু যখন কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন আমাকে ও দাওয়ানজিকে কহিলেন যেরূপে হউক অদ্য রাত্রির মধ্যেই এই মৃতদেহ স্থানান্তবিত কবিয়া ফেল। আমাব বোধ হয়, দোয়াব মধ্যে উহার মৃতদেহ উত্তমরূপে পুঁতিযা বাখিতে পাবিলেই ভাল হয়; কারণ দুই চারি দিবসের মধ্যে ঐ মৃতদেহ পচিযা গেলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। আরও কহিলেন, “উহার বস্ত্র প্রভৃতি যদি কিছু থাকে তাহার কোনবূপ চিহ্ন যেন কুঠির ভিতর দেখিতে পাওয়া না যায়। এই কার্য্য চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিলে তোমরা আমার নিকট হইতে উত্তম রূপে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে।” এই বলিয়া সাহেব ও মেম সাহেব কামরার মধ্যে গমন কবিলেন। আমি দাওয়ানজিব সহিত পরামর্শ করিযা ছিদাম, জানকী ও পবনকে ডাকিযা তাহাদিগেব সাহায্যে ঐ মৃতদেহ দোয়ার মধ্যে প্রোথিত করিয়া বাখিলাম। গোমস্তাব যে সকল বস্ত্রাদি ছিল, তাহাও একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সহিত দুইখানি ইঁট উত্তম রূপে বাঁধিয়া ঐ দোয়াব জলে নিক্ষেপ করিলাম তাহার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলাম ও জিন লাগাম প্রভৃতি ঐ বৃক্ষেব ডালের উপর বাখিয়া আসিলাম, এই রূপে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া আমি ও দাওয়ানজি মহাশয় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম, সাহেব আমাদিগের কথা শুনিয়া আমাদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।”

॥ ৩২ ॥

সর্দ্দার বেহারার কথা শুনিয়া দারোগাবাবুর আর কিছুই অবগত হইতে বাকী রহিল না। তিনি ছিদাম, জানকী, পবন ও সর্দ্দার বেহারার জবান বন্দী সবিশেষ লিখিয়া লইলেন। এখন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অনুসন্ধানের দুরূহ কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃতদেহ গোপন করিয়া হত্যাকারীর সহায়তা করা অপরাধে এখন দাওয়ানজিকে ধৃত করা আবশ্যক। এ কার্য্য নিতান্ত সহজ না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে; কারণ

তিনি এখন পর্য্যন্ত লুক্কাইত বা পলাইত হন নাই। কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় এখনও নীলকুঠি হইতে বর্হিগত হইয়া বাহিরে আসিতে সঙ্কুচিত নহেন; সুতরাং, হাতার ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়াও তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এই মকৰ্দ্দামার প্রধান নায়ক গ্লাসকট সাহেব। সেই সাহেবকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ নহে। তিনি একে ইংরাজ, তাহাতে সেকেলে নীলকর সাহেব; অর্থবল, লোকবল, প্রভৃতি কোন বলেরই অভাব নাই। তাঁহার হস্তে রামগতি বিশ্বাসের যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাঁহাকে হত্যাপরাধে ধৃত করিবাব নিমিত্ত তাঁহার কুঠির মধ্যে প্রবৃষ্ট হইলে, দারোগাবাবুরও যে সেইরপ্তপ অবস্থা ঘটিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর যদি তাহাই না হয়, অসীম সাহসের উপব নির্ভর করিয়া কালা দারোগা যদি সেই গোরা আসামীকে ধরিতেই সমর্থ হন, তাহা হইলেও পরিণামে দারোগাবাবুর অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহা অনুমান করাও নিতান্ত সহজ নহে। তাঁহার উপরিতল প্রধান কৰ্ম্মচারী ও ঐ মহকুমার বিচারক ইংরাজ তাঁহারা যে আসামীর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া একজন দেশীয় সামান্য পুলিশ কৰ্ম্মচারীর পক্ষ সমর্থন করিবেন, এরপ্তপ অনুমান আজকাল করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সময়ে সেই রপ্তপ অনুমান করা একেবারে অসম্ভব ছিল। একশত জন ইংরাজ কৰ্ম্মচারীর মধ্যে ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের স্বজাতীয় বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন, সেইরপ্তপ কর্মচারী সেই সময় একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ। এদিকে দারোগাবাবুকে ঠিক আইন অনুসারে না চলিলেও তাঁহার নিস্তার ছিল না; সুতবাং সেই সময় তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই সহজে স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায় তাহাও তাহার অন্তরে সেই সময় স্থান পাইলেন না, অথচ ইতিপূর্বে তিনি সাহেবের নিকট অবমানিত হইয়া নীলকুঠীর হাতা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল; এখন সেই ক্রোধ প্রবল তেজ ধারণ করিল বলিয়া তিনি সেই সময় ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা তাঁহার অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে; মনে মনে এইরপ্তপে ভাবিয়া সাহেবকে ধৃত করিতেই মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু নীলকুঠির হাতার মধ্য হইতে সাহেবকে ধৃত করিয়া আনা নিতান্ত সহজ নহে। সাহেবের যেরপ্তপ লোকবল ও অর্থবল আছে একজন সামান্য পুলিশ কৰ্ম্মচারীর সেইরপ্তপ লোকবল বা অর্থবল কোথায়? তাঁহাদিগের থাকিবার মধ্যে কেবলমাত্র আইনবল, অনেক সময় সেই আইনের বল আদালতের মধ্যে নিয়মানুযায়ী কার্য্যকরী হয় কিন্তু আদালতের বাহিরে সেই আইনের বল অনেক সময় বে-আইনে পরিণত হইয়া পড়ে।

দারোগাবাবু তাহা উত্তমরূপে অবগত থাকিয়াও কিন্তু সাহেবকে ধৃত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাব যতদূর ক্ষমতা সেই অনুযায়ী চৌকিদার কনেষ্টবলগণকে সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠির দিকে গমন করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার সংগৃহীত চৌকিদার প্রভৃতি যখন জানিতে পারিল, তাহাদিগকে সেই নীলকুঠির সাহেব ও দাওয়ানকে ধৃত করিতে হইবে, তখন তাহারা নীলকুঠির দিকে গমন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ইচ্ছা ক্রমে তাহারা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে, কিন্তু সরকারী চাকরীর খাতিরে তাহারা একেবারে তাহা করিয়া উঠিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রমে তাহাদিগকে নীলকুঠির দিকে অগ্রসর হইতে হইল।

॥ ৩৩ ॥

দারোগাবাবু স্বদলবলে যখন নীলকুঠির দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, সেইসময় পশ্চাৎদিক হইতে অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তিনজন অশ্বারোহী ইংরাজ দ্রুতপদে সেই দিকে আগমন করিতেছেন। ইংরাজ দেখিয়া দারোগাবাবু সেইস্থানে একটু দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী ত্রয় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহাদিগের দুইজনকে দেখিবামাত্রই দারোগাবাবু চিনিতে পারিলেন। একজন তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারী। অপরজন সেই মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তৃতীয় ব্যক্তিকে সেই সময় যদিও চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি জেলার ডাক্তার সাহেব।

ইংরাজ-অশ্বারোহীগণ দারোগাবাবুর নিকটবর্ত্তী হইয়াই আপন আপন অশ্বের বেগ সংবরণ করিলেন। ইংরাজ পুলিশ-কর্ম্মচারী এখন দারোগাবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এরূপ দলবল লইয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ?"

দারোগা। আসামী গ্রেপ্তার করিতে।

কর্ম্মসাহেব। ইহা কি খুনি মকর্দ্দামায় পরিগণিত হইল?

দারোগা। তাহাই তো এখন দেখিতেছি।

কর্ম্মসাহেব। আসামী কে?

দারোগা। নীলকর গ্লাসকট্ সাহেব।

কর্ম্মসাহেব। সাহেবের উপর এই মকর্দ্দামা সপ্রমাণ হইয়াছে?

দারোগা। আমার বিবেচনায় প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

কর্ম্মসাহেব। তুমি সাহেবকে ধরিতে গমন করিতেছ, আমরা না আসিলে এ কার্য্য

তুমি সম্পন্ন করিতে পারিতে?

দারোগা। না পারিলে আর যাইতেছি কেন?

কর্ম্মসাহেব। তোমার সেরপ্তপ বল কই?

দারোগা। আমার বল যথেষ্ট আছে; আইন বলের বল অপেক্ষা আর অধিক বল কি হইতে পারে?

কর্ম্মসাহেব। তুমি আমাদিগের সহিত আইস। আবশ্যক হইলে আমরা সাহেবকে ধৃত করিব। অপর আর কোন লোকজনের আমাদিগের সহিত গমন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া ইংরাজত্রয় সেই নীলকুঠির মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। দারোগাবাবুও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। চৌকিদার প্রভৃতি অপরাপর লোকজন, সাহেবকে ধরিবার নিমিত্ত গমন করিতে হইবে না জানিতে পারিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাহারা সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেবত্রয় অশ্বারোহণে ছিলেন; সুতরাং পদব্রজে গমনকারী দারোগাবাবুর অনেক পূর্ব্বেই তাঁহারা নীলকুঠির মধ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। দারোগাবাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবের কামরার মধ্যে গমন করিয়াছেন; সুতরাং, তিনি সেই কামরার বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন বেহারা আসিয়া দারোগাবাবুকে সেই কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন, পূর্ব কথিত সাহেবত্রয় সেইস্থানে উপস্থিত আছেন। দারোগাবাবু সেই স্থানে গিয়া দন্ডায়মান হইলে, কর্মচারী সাহেব তাঁহাকে কহিলেন, "এই সাহেব যে হত্যা করিয়াছেন, তুমি তাহার কি প্রমাণ পাইয়াছ?" সাহেবের কথা শুনিয়া দারোগাবাবু সেই নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একে একে বর্ণন করিলেন।

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া সাহেবগণ কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া পরিশেষে কহিলেন, "প্রমাণের মধ্যে দেখিতেছি, সাহেবের চাকরগণ তাহাদিগের মনিবের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা এই সকল কথা বলিবে তো?

দারোগা। তাহা আমি এখন বলি কি প্রকারে? কিন্তু সমস্ত সাক্ষীই এখন উপস্থিত আছে? অনুমতি হয়তো আমি এখনই তাহাদিগকে সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যে তাহারা মিথ্যা কথা কহিতেছে, কি

সত্য কথা বলিতেছে।

কর্ম্মসাহেব।। আমি এখন সাক্ষীগণের এজাহার শুনিতে চাই না। তোমার বোধ হইতেছে, সাহেব সম্পূর্ণরূপে দোষী, সুতরাং, তোমার কথা অনুযায়ী আমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেছি। কিন্তু মকর্দ্দামার সময় সাক্ষী দ্বারা তুমি যদি ইহার প্রমাণ না করিতে পার, তাহা হইলে সাহেবকে গ্রেপ্তার করার নিমিত্ত তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

দারোগা। আপনার বিবেচনায় যে রূপ হয়, তাহাই করিবেন; কিন্তু, সাক্ষীগণ এখানে উপস্থিত আছে, তাহাদিগের মুখে শুনিয়া সাহেবকে গ্রেপ্তাব কবিলে ভাল হইত না কি?

কর্ম্মসাহেব। এই মকদ্দমাব অনুসন্ধান করিবার সময় তুমি কতকগুলি নিতান্ত বে-আইন কার্য্য করিয়াছ।

দারোগা। আমি কোনরূপ বে-আইনি কার্য্য করি নাই।

কর্ম্মসাহেব। তুমি অনুসন্ধান করিবার মানসে সাহেবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন কেন?

দারোগা। অনুমতি লইবার সুযোগ আমাকে প্রদান করা হয় নাই। আমি যদি সাহেবের নিকট না আসিব, তাহা হইলে তাঁহার অনুমতি লইব কি প্রকারে? আমি যে সময় তাঁহার হাতাব ভিতর আসিতেছিলাম, সেই সময় সাহেব বাহিরে যাইতেছিলেন; তিনি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার কুঠির হাতার ভিতর হইতে আমাকে দূরীভূত করিয়া দেন; সুতরাং আমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব?

কর্ম্মসাহেব। তুমি আরও একটি নিতান্ত অন্যায় ও বে-আইনি কার্য্য করিযাছ।

দারোগা। কি?

কর্মসাহেব। সাহেবের সর্দার বেহারা সর্দার বরকন্দাজ ও অপরাপর কতকগুলি পরিচারককে নিতান্ত অবৈধরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ।

দারোগা। আমি কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। তবে যে সকল সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া আমি আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছি, সেই সকল লোকদিগকে আমি আপনার নিকট ডাকাইয়া আনিয়াছি ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ও তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিতে আমার যে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাদিগের

উপর কোনরূপ অসদ্ব্যবহার বা তাহাদিগকে অন্যায় রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। আমি যেরূপভাবে সাক্ষিগণের জবানবন্দী গ্রহণ কবিয়াছি, সেইরূপ ভাবে তাহা না করিলে এরূপ মকর্দ্দামার কিছুতেই কিনারা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি আপনার নিকট অপরাধী।

কর্ম্মসাহেব। সাহেবদিগের চাকর প্রভৃতিকে সময় মত তাহাদিগের কার্য্যে আসিতে না দিলে তাঁহাদিগের যে কতদূর কষ্ট হয়, তাহা জানিয়া, তোমার কার্য্য করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, সে সম্বন্ধে এখন আমি তোমাকে আর কোন কথা বলিতে চাই না, তুমি এখনই তোমার লোকজন সমভিব্যবহারে থানায় গমন কর। তোমাকে এই মকর্দ্দামার আর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। যে কর্মচারী এইরূপ মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিবার উপযুক্ত, তাহাকে আমি এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিব। তুমি এখনই তোমার থানায় প্রতিগমন কর কিন্তু, যে পর্য্যন্ত তোমার উপর অপর কোন আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি থানার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না। তুমি এখন ''সসপেন্ড'' অবস্থায় থাকিবে।

এই বলিয়া সাহেব, দারোগাবাবুর নিকট হইতে সমস্ত কাগজ পত্র গ্রহণ করিলেন। দারোগাবাবু আর কোন কথা না বলিয়া, নতমস্তকে সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া গেলেন।

এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পরে সাহেব ত্রয়, সেই নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইলেন এবার তাঁহাদিগের সহিত সেই নীলকর সাহেবও গমন করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনে করিলেন, এবার আর নীলকর সাহেবের উদ্ধার নাই, স্বয়ং বিচারক ও পুলিশের বড় সাহেব আসিয়া যখন তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার স্থান, এবার নিশ্চয়ই জেলের মধ্যে অবধারিত হইবে।

প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যে নিরস্ত থাকিলেন তাহা নহে। সাহেবকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত কেহ কেহ সাহেবদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন ও পরিশেষে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলের নিকট বলিয়াছিলেন, "নীলকর সাহেবকে মোহকুমা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে ও সেই স্থানে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে''। কিন্তু পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, নীলকর সাহেব প্রকৃতই ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই, জামিন বা মুচলেকায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

দারোগাবাবু থানায গমন করিবার পর, এই মকর্দ্দামার অনুসন্ধানের ভার সেই মহকুমার আর একজন পুলিশ কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয়। তিনিও বাঙ্গালি, কিন্তু তিনি উহার পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া যে কিরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহা কেউই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন না; সুতরাং, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

যে দিবস নীলকর সাহেব অপর সাহেব দিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন, সেই দিবস নীলকুঠিতে অপর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই; সুতরাং নীলকুঠির অপরাপর কর্মচারীগণের মনে যে কি রূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যে সময় সাহেবগণ নীলকুঠিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় দাওয়ানজি কুঠিতে উপস্থিত ছিলেন না। কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মনিব-সাহেবকে ধরিযা লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সেই দিবস তিনি আর কুঠিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন না। অপরাপর কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন কার্য্যের ভান করিয়া ক্রমে সেই স্থান হইতে অন্তর্ধান হইতে লাগিলেন। স্থূলকথায় নীলকুঠির কর্মচারী মাত্রই অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া প্রজাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই মকর্দ্দামায় যাহাতে সাহেব দণ্ডিত হন, তাহার নিমিত্ত সকলেই দেব দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুগণ হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে দেবদেবীর পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। মুসলমান স্থানে স্থানে তাহাদিগের দরগায় সমবেত হইয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। স্থানে স্থানে "মৌলুদ সরিফের" আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমানদিগের আরাধনায় বিশেষ কোন ফল ফলিল না। পর দিবস অতি প্রত্যুষে সকলেই দেখিতে পাইলেন সাহেব অশ্বারোহণে নীলকুঠি হইতে বহির্গত হইয়া নীল দেখিতে গমন করিতেছেন।

মহকুমা হইতে সাহেব সেই রাত্রিতেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কর্ম্মচারী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদিগের ভয় তিরোহিত হইতে লাগিল। যাহারা নীলকুঠি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল তাহারাও ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এই অবস্থা দৃষ্টে প্রজাগণের মধ্যে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সোৎসুক হৃদয়ে সকলেই সাহেবের বিচার ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রত্যহই মহকুমায় গমন করিয়া সাহেবের বিপক্ষে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে

লাগিলেন।

সেই সময় মহকুমার মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, রামগতি বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে নীলকর সাহেবের নামে মকর্দ্দামা রুজু হইয়াছে, সাহেবও ধৃত হইয়া জামিনে আছেন। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত ডাক্তাব সাহেবের নিকট হইতে মৃতদেহ পরীক্ষার ফল না আইসে, সেই পর্য্যন্ত মকর্দ্দামার বিচার আরম্ভ হইতেছে না।

এই সময় প্রজাগণেব মধ্যে অনেকে এরপ্তপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে কেহ কেহ জেলা পর্য্যন্তও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিজ হইতে খরচ করিয়া সেই স্থানে গমন করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি কোন গতিকে তাঁহারা অগ্রে সেই মৃতদেহ পরীক্ষার ফল, ডাক্তার সাহেব বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারেন কিন্তু, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব যে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা কোন রপ্তপেই অবগত হইতে না পারিয়া ক্ষুন্ন মনে আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরপ্তপে ক্রমে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। নীলকর সাহেব আপন কুঠিতে অবস্থিতি করিয়া নিজের কার্য্য সকল দেখিতে লাগিলেন। যে সকল সাক্ষিগণ দারোগার নিকট সকল কথা বলিয়া দিয়াছিল; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত কথা একেবারে অস্বীকার করিল। কাহাকেও বা অনুসন্ধানে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না; এদিকে দারোগাবাবু নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থানায় বসিয়া নিজের অদৃষ্ট ফল ভাবিতে ভাবিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরপ্তপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি এই মকর্দ্দামার বিশেষ ফল কেহই অবগত হইতে পারিলেন না; কিন্তু লোকপরম্পরায় শুনা যাইতে লাগিল, যে এখন পর্য্যন্ত খুনি মকর্দ্দামা সাহেবের বিপক্ষে আদালতে দায়ের আছে।

ইহার পর আরও দুই চারিদিবস অতিবাহিত হইয়া গেলে, একদিবস এই দারোগাবাবু আমাদিগের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই সময় সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন না; তিনি স্থানান্তরে গমন করিবার কালীন তাঁহার পরিচিত দুই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিয়া যান যে, সাহেবের বিপক্ষে মকর্দ্দামার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন যত দিবস পুলিশ বিভাগে তিনি কর্ম্ম করিবেন তত দিবস তিনি তাহা ভুলিবেন না; ও এখন হইতে চাকরি বজায় রাখিবার নিমিত্ত যেরপ্তপভাবে

অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই চলিবেন। প্রকৃত বিচার বা অবিচারের দিকে তিনি আর লক্ষ্য করিবেন না। তাঁহার নিকট হইতে আরও অবগত হইতে পারা গিয়াছিল যে, এই মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান উপলক্ষে তিনি একমাস কাল কাৰ্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ঐ এক মাসের বেতন তিনি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন নাই, তদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের এক প্রান্তে যে স্থানে জলহাওয়া ভাল নয়, বা যে স্থানে কোন ইংরাজের সংস্রব নাই, সেই স্থানে তাঁহাকে বদলি হইতে হয়।

॥ ৩৪ ॥

যে মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দারোগাবাবু দন্ডিত হইলেন, সেই মকৰ্দ্দামার ফলও ক্রমে সংবাদপত্রে বাহির হইয়া গেল। তখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, ঐ মকৰ্দ্দামা পরিণামে কি দাঁড়াইল! সেই সময় যে সকল সংবাদপত্রে এই বিষয় বাহির হইয়াছিল, তাহার একখানি ইংরাজি পত্রের ভাবার্থ এই স্থানে প্রদত্ত হইল :

“গ্লাসকট্ নামক জনৈক নীলকর সাহেবের বিপক্ষে তাঁহার একজন কৰ্ম্মচারী রামগতি বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে যে নালিশ হইয়াছিল এখন জানা গেল, সেই অভিযোগ নিতান্ত অন্যায়রূপে আনা হইয়াছিল। প্রথমে পুলিশের অনুসন্ধান যে সকল বিষয় স্থির করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে পুলিশ সেই সমস্ত বিষয় নিতান্ত অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিয়াছিল। সাহেবের বিপক্ষে অন্যায়রূপে রিপোর্ট করিলে বা তাঁহার উপর নিতান্ত অলীক মকৰ্দ্দামা রুজু করিলে পরিণামে অনুসন্ধানকারী কৰ্মচারী যেরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বর্তমান ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী দারোগাবাবুও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুলিশ বিভাগে উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী কর্তৃক তিনি উপযুক্ত দন্ডে দন্ডিত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও পুলিশ কৰ্ম্মচারিগণ যে সতর্ক হইতে চাহেন না, ইহাও বড় লজ্জার কথা। এক ব্যক্তি তাহার নিজের কোন কারণবশতঃ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল, আর পুলিশ কৰ্ম্মচারী তাহার অনুসন্ধান করিয়া একজন বিশিষ্ট ভদ্র ইংরাজের নামে এক খুনী মকৰ্দ্দামা দায়ের করিয়া দিল। পুলিশ দ্বারা ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কাৰ্য্য আর কি হইতে পারে? আজকাল দেশীয় পুলিশ যেরূপ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আর কিছু দিবস পরে যে কোন ইংরাজ অধিবাসীর মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, তাহা বোধ হয় না। গভর্ণমেন্টের কর্তব্য এই সময় হইতেই পুলিশের পধান কৰ্ম্মচারির পদ দেশীয় দিগের

হইতে একেবারে উঠাইয়া লওয়া। রামগতি বিশ্বাস দেশীয় লোক, সে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিল। দেশীয় পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিয়া একজন ইংরাজের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া তিনি রামগতিকে হত্যা করিয়াছেন এইরূপ ভাবে এক মকর্দ্দামা তাঁহার বিপক্ষে রুজু করিলেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ও ঘৃণাকর বিষয় আর কি হইতে পারে? এই মকর্দ্দামার বিচারক ইংরাজ না হইয়া যদি একজন দেশীয় হইতেন ও রামগতির মৃতদেহ একজন ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত না হইয়া যদি একজন দেশীয় ডাক্তার দ্বারা উহার পরীক্ষা কবা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, বিনা দোষে একজন ইংরাজ চরম দন্ডে দন্ডিত হইতেন। রামগতি বিশ্বাসের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব স্পষ্টই বলিয়া দেন, "জলমগ্নই ইহার মৃত্যুর কারণ। ইহার শরীরে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন নাই বা অপর কোনরূপে যে ইহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় সে আত্মহত্যা করিবে বলিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত কাষ্ঠের সহিত আপনার হস্তপদ বন্ধন করিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে; কারণ বোধ হয় তাহার মনে ভয় ছিল, ডুবিয়া মরিতে গেলে পাছে ভাসিয়া ওঠে ও মরিতে না পারে এই নিমিত্তই সে অগ্রে তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া রাখে।"

এইরূপ সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সকলেই জানিলেন যে, আসামীর বিচারের পরিণাম কি হইল!

ইংরাজের বিচারে ইংরাজ আসামীর কিছু হইল না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। এই ঘটনার দুই চারি বৎসরের মধ্যেই সেই নীলকুঠি বিক্রয় হইয়া গেল। যে যাহা পাইল সেই তাহা খরিদ করিল। এই সকল অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ লেখকও পরিশেষে তাহার একটু বিষয় খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। নীলকর সাহেবের সমস্ত বিষয় বিক্রয় হইয়া গেলে, পরিশেষে তাঁহার অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, ও পরিশেষে রেলওয়ে কোম্পানীর অনুগ্রহে তিনি একটি চাকরি পাইয়া আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থাও তাঁহাকে অধিক দিবস ভোগ করিতে হয় নাই। পরিশেষে তিনি অস্বাভাবিক মৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়া এই যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

॥ ৩৫ ॥

প্রধান ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা মত যে পুলিশ কর্ম্মচারী পরিশেষে এই

মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম। এই ঘটনার পূর্ব্বে দুইবার দুইটি মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন বলিয়া তাহার নাম এখন এই স্থানে প্রকাশ করিলাম না, তিনি পরিশেষে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কলিকাতা শহরেই বাস করিতেছেন।

যে দুইটি মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান উপলক্ষ্যে তিনি পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন তাহার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদিগের গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় বংশসম্ভূত যে সকল ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকের অবস্থাক্রমে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগের বিবাহ করিতে হইলে কন্যার মাতা পিতাকে অনেক অর্থপ্রদান না করিলে কেহই তাঁহাদিগকে কন্যা প্রদান করিতেন না, সুতরাং অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলে অনেকেরই বিবাহ হইত না। তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি কেহই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে একাকী তাঁহার বাটীতে বাস করিতে হইত। সেই সময় তিনি গ্রামের একটি বালবিধবা বৈষ্ণব কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। একথা কিছু দিবস গোপন থাকিয়া ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সকলেই যখন এই বিষয় ক্রমে অবগত হন তখন তাঁহারও লজ্জা ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়, ঐ স্ত্রীলোকটি ক্রমে তাঁহার বাটীতে আসিতে আরম্ভ করে ও ক্রমে পরিবারের মত সেই বাটীতেই অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বহু দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়। সেই সময় কলকাতায় কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ মহাজনের অফিসে একটি ওজন সরকারী কার্য্য তিনি কোন গতিকে যোগাড় করিয়া লন, ও তাহাতে বেশ দশ টাকা উপার্জন করিতে আরম্ভ করেন।

কার্য্যের গতিকে সেই সময় তাঁহাকে কলিকাতাতে প্রায়ই থাকিতে হইত, সুতরাং সকল সময় দেশে যাইতে পারিতেন না। বাটীর সমস্ত ভার তাঁহার সেই বৈষ্ণবী ও একটি বাঙালি পরিচারকের উপর ন্যস্ত ছিল।

অসৎ স্ত্রী লোককে তুমি যতই কেন ভালবাস না, বা যতই তাহাকে বিশ্বাস কর না, তাহার স্বভাবের কিছুতেই পরিবর্তন হয় না। ঐ বৈষ্ণবী এত দিবস গৃহস্থের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে ঐ পরিচারকের সহিত দুষ্ক্রিয়ায় আসক্তা হইয়া পড়িল, ও সুযোগমত এক দিবস সেই ভদ্রলোকের গৃহে যে সকল অলঙ্কার নগত টাকা,

তৈজসপত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্ত গ্রহণ করিয়া ঐ পরিচারকের সহিত পলায়ন করিল। সেই ভদ্রলোক কলিকাতায় থাকিবার কালীন এই সংবাদপ্রাপ্ত হন ও বাটীতে গমন করিয়া দেখেন, তাঁহার এত দিবসের সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল তাহার কিছুই নাই। এই অবস্থা দৃষ্টে তিনি থানায় গিয়া উহাদিগের উপর চুরির অভিযোগ করেন। পরিশেষে উহারা উভয়েই ধৃত হয় ও অপহৃত্ত সমস্ত দ্রব্য উহাদিগের নিকট পাওয়া যায়। পূর্ব্ব কথিত দারোগাবাবুই ঐ মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান করেন। আসামীদ্বয় ধৃত হইবার পর অনুসন্ধান উপলক্ষে বিচারকের আদেশ লইযা দারোগাবাবু ৭ দিবস আসামীদ্বয়কে থানায় রাখেন। পরিচারকের থাকিবার স্থান হয় থানার হাজত গৃহে, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটিকে আর হাজতে থাকিতে হয় না। সেই সময় দারোগাবাবুর বাসায় তাঁহার পরিবার প্রভৃতি কেহই ছিল না, সুতরাং ঐ বাসাতেই সে সেই কয় দিবস অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়।

অনুসন্ধান করিয়া দারোগাবাবু গ্রামে আসিয়া পরে ইহাই প্রকাশ করেন যে. সমস্ত দ্রব্যই সেই স্ত্রীলোকের, তাহার উপর মিথ্যা করিয়া এই নালিশ উপস্থিত করা হইয়াছে। সুতরাং, মিথ্যা অভিযোগ আনা উপলক্ষে ফরিয়াদীর নামে মকদ্দমা রুজু করা আবশ্যক। ভদ্রলোক এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইলেন. ভাবিলেন কি দুষ্কর্ম করিয়াই তিনি থানায় গিয়া মকৰ্দ্দামা রুজু করিয়াছিলেন। যাহা হউক দারোগাবাবুর নিকট অনেক তদ্বির করিয়া তিনি সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন। স্ত্রীলোকটিও অব্যাহতি পাইল, কেবলমাত্র সেই পরিচারকটি কয়েক মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইল। অপহৃত্ত অলঙ্কার, নগত টাকা ও অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা পুলিশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা আর ঘরে আসিল না, স্ত্রীলোকটিও শূন্য হস্তে আপন গৃহে গমন করিল।

ইহা হইতেই ভদ্রলোকটির পাপ কাটিয়া গেল; অর্থের যোগাড় করিয়া তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; ও তাহার সন্তান সন্ততি ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিল।

ঐ বৈষ্ণবী, তাহার শেষ জীবন এই কলিকাতা নগরীতে দাস্যবৃত্তি করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল ইহাও আমি দেখিয়াছি।

দারোগাবাবু যে আর একটি মকৰ্দ্দামার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে হইলে লেখনী অপবিত্র হয়, শ্রবণ করিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়।

আমাদিগের গ্রামে এক ঘর মালির বাস ছিল। সে অবিবাহিত, তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর হইবে। তাহার ২০ বৎসর বয়স্কা একটি বিধবা ভগ্নী তাহারই গৃহে বাস করিত। উহাদিগের একটি বৃদ্ধা মাসীও তাহাদিগের সংসারে থাকিত। ঐ

বৃদ্ধার দুই তিন শত টাকা ছিল। সে উহা বাটীর ভিতরই একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া ছিল, একদিবস দেখিল তাহার সেই টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইল, পরিশেষে সকলের পরামর্শ মত থানায় গিয়া সেই চুরির সংবাদ প্রদান করিল। দারোগাবাবু নিজেই অনুসন্ধান করিতে আসিলেন, আমরাও গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম। দারোগাবাবু সেই স্থানের অবস্থা উত্তম রূপেপে দেখিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই মালি ও তাহার সেই বিধবা ভগ্নীকে সন্দেহ করিলেন। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল, প্রথমতঃ গালি গালাজ ও তাহার পর মারপিট যথেষ্ট হইল; তাহারা যে ঐ অর্থ অপহরণ করিয়াছে তাহা কিন্তু তাহাবা কিছুতেই স্বীকার করিল না। তখন সেই স্থানে সেই সময় যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদিগের সকলের সম্মুখে দারোগাবাবু তাঁহার একজন মুসলমান কনষ্টেবলের সাহায্যে উভয়কেই বিবস্ত্র করিয়া ফেলিলেন ও সামনাসামনি করিয়া উভয়কেই একসঙ্গে তাহাদিগের কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেন, ও কহিলেন যে পর্য্যন্ত তাহারা সমস্ত কথা স্বীকার না করিবে সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে না। উহারা উভয়ে চক্ষু মুদিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা সকলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম দুই ঘন্টা কাল উভয়কে ঐ রূপেপ ভাবে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা কোন কথা স্বীকার করে না। উহারা চুরি করিয়াছিল না, মিথ্যা স্বীকার করিবে কেন? বলা বাহুল্য ঐ মকর্দ্দামার কিনারা দারোগাবাবুর দ্বারা হইল না।

॥ ৩৬ ॥

যে সময় আমি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম তাহার পূর্ব হইতেই আমার লিখিবার একটু সখ ছিল। সময় সময় দুই একটি পদ্য লিখিতাম ও গদ্যতে কখন কখন প্রবন্ধাদি লিখিতাম। কৃষ্ণনগরে বালকগণের একটি "ক্লাব" ছিল, আমিও তাহাদিগের মধ্যে একজন সভ্য ছিলাম, মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমি সেই স্থানে পাঠ করিতাম। ঐ সকল প্রবন্ধ বা পদ্য কোন পত্রাদিতে বা পুস্তক আকারে প্রকাশিত বা অন্য কোন রূপেপে মুদ্রিত হইত না। বাস্তবিক সেই সকল বাল্য-রচনা মুদ্রিত হইবার উপযুক্তও হইত না। উহা ক্রমে নষ্ট হইয়াই যাইত। আমার বাল্যকালের কাগজপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এখন আর তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না, কেবলমাত্র চারিটি কবিতা পাইলাম, স্থানে স্থানে উহার অর্থের ও ভাবের অসামঞ্জস্য থাকায় ও

উহা মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত না হইলেও, কেবল বাল্য কালের রচনা বলিয়া উহা এই স্থানে পাঠকগণের সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। উহার মধ্যে শত শত দোষ থাকিলেও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। পদ্য কয়টিই হেমবাবুর অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল।

চির নির্বাসিতের পত্র

সেই দিন হয় কি স্মরণ?

১

সেই দিন প্রিয়তম, হয় কি স্মরণ?
হলো বহুদিন গত,
ইহ জনমের মত,
লয়েছিনু একদিন বিদায় গ্রহণ
বিদায় গ্রহণ প্রিয়ে! মুছিয়া নয়ন!!

২

দুঃখিত অন্তরে প্রিয়ে মুছিয়ে নয়ন,
দিয়াছিনু আমি হায়।
এখন কি মনে হয়?
তাপিত অন্তরে যবে করেছ ক্রন্দন?
এখন কি হয় প্রিয়ে সেদিন স্মরণে?

৩

সেই দিন বলেছিলে ধরিয়া চরণ,
যেও নাকো প্রিয়তম,
বধিয়া হৃদয় মম,
দিও না কোমল প্রাণে যাতনা এখন।
চরণে পড়িয়া কত করেছ ক্রন্দন।
সেই নিদারুন দিন আছে কি স্মরণ?

৪

সেই দিন হয়েছিল প্রভাত যখন
সেই দিন দুইজনে,

হয়েছিনু দুই স্থানে,
(হেন আশা নাই মনে
পুনরায় দুইজনে হইবে মিলন!)
সেই দিন ঘটেছিল বিচ্ছেদ ঘটন;
সেই দিন ওহে প্রিয়ে হয় কি স্মরণ?

৫

কাল স্রোতে পড়িয়াছি উভয়েই হায়।
নাহি দেখি কুল ভূমি,
কেমনে উঠিব আমি?
কেমনে উঠিবা তুমি?
ভাবিয়া ভাবিযা মোব তনু ক্ষয় যায?
কালের স্রোতেতে মোরা পড়িয়াছি হায?

৬

পাইব কি পুনরায় জীবনের ধন
এই স্রোত তেয়াসিয়া,
আশায় বাঁধিয়া হিয়া,
রাখিতে পারিব কি এ ছার জীবন?
দেখিবার তরে মোর প্রণয়ী রতন,
জীবন তরণী মোর সুখের সদন;
সেই দিন প্রিয়তমে হয় কি স্মরণ?

অশোক বনে কোকিল

১

কুহু কুহু রব করি অশোক শাখায়
বসিয়া ডাকিছ কেন ও মধুর স্বরে?
হয়েছে কি মনে তব সুখের উদয়
রাখিয়া আপন তনু ফুলের মাঝারে?

২

অথবা রে মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোল

লইয়া আপন করে অশোকের ফুল
নাড়িতেছ ধীরে ধীরে করিতে শীতল
চামর ব্যজন সম তোমার শরীর?

৩

তাই ফিরে ওহে পাখি মনের হরষে
ছাড়িয়া দিয়াছ তুমি সুমধুর তান!
যে স্থান আবৃত ছিল বিষম বিরসে
সেই স্থানে আজি তব কে শুনিবে গান?

৪

ডেক নারে পাখি তুমি ডেকনা এখানে,
যে স্থান পূরিত ছিল হাহাকার রবে,
সুমধুর রব তুমি তুলনা সেখানে,
ডেকনা ডেকনা তুমি "কুহু কুহু" রবে।

৫

বসিয়া ডাকিছ তুমি যে বৃক্ষের ডালে
মধুমাখা রবে তুলি সুখের লহরী
একাকিনী বসি সতী সেই বৃক্ষ মূলে
যাপিতেন রাত্র দিবা রাম প্রাণেশ্বরী।

৬

সেই স্থানে রামপ্রিয়া সীতা সাধ্বী সতী
নয়ন নির্ঝর নীরে তিতিয়া বসন
কাঁদিতেন অধোমুখে বসি দিবারতি
নির্দ্দয় রাবণ বাক্যে পাইয়া বেদন।

৭

যে স্থানে ধরাসনে করিয়া শয়ন
মরি মরি! মন দুঃখে দিবস রজনী
মলিন বসনে করি অঙ্গ আচ্ছাদন
যাপিতেন মন দুঃখে জনক নন্দিনী।

৮

সেই স্থানে পিকবর হরিষ অন্তরে
বসিয়া অশোক ডালে মুদিয়া নয়ন
অমৃতের ধারা ঢালি শ্রবণ বিবরে
"কুহু কুহু" রব তুমি কর কি কারণ।

৯

যখন রাবণ আস্য বিবর রহিয়া
বাহিরিত মন্দ কথা ভুজঙ্গের হিয়া
দংশিবার হেতু সেই সুকোমল হিয়া
রামের মানস ছবি জানকীর হায়।

১০

তখনই মুদিয়া দুঃখে নয়ন যুগল
ভিজাতেন এই স্থান অশ্রুপাত করি
কখন বা করলগ্ন করিয়া কপোল
যাপিতেন বসি দুঃখ দিবস শর্বরী।

১১

এই যে অশোক বৃক্ষ যাহার শাখায়
বসিয়া করিছ তুমি সুমধুর গান;
ইহারাও কাঁদিয়াছে সীতার দশায়,
ঢাকিয়াছে পুষ্প ফেলি এই উপবন।

১২

অতএব পাখি তুমি ডেক না এখানে,
পরিহারি শীঘ্র এই অশোকের বন
গমন করহ তুমি অন্য কোন স্থানে
তুষিতে পারিবে যথা মানবের মন।

প্রিয়তমার প্রাণান্তে বিলাপ

১

কেনরে সরস সরে আমি পদ্ম দোলেরে
মম সম অভাগারে
কাঁদাইতে বারে বারে
সবস সরসী নীরে
আজি পদ্ম ফোটেরে
মাতিয়া পবন সনে কেন পদ্ম নাচেরে?

২

কতদিন এই স্থানে সখে বসি একাসনে
দুই জনে হৃষ্ট মনে
কত কথা বলেছি;
কতদিন মন সুখে কত পদ্ম হেরেচি।
এখন বুক বিদরয়
নয়নেতে বারি বয়
দুঃখিনীরে ভাসিছি
তবে আজ কি সুখেতে এই স্থানে রয়েছি?

৩

ওরে দুষ্ট দুরাচার!
কি করিলি অভাগার,
আমার হৃণ্ডদয়ে হার
কোথা রেখে আসিলি?
মম-সুখ-মুলাধার
আমা সেই প্রাণাধার
পূর্ণিমার শশধর
কোথা তুই রাখিলি?
কেন সে মধুর হার
আমাদের প্রেম হার

ওরে কাল দুরাচার
অকারণে ছিঁড়িলি,
আমার হৃদয়ে নিধি কোথা রেখে আসিলি,

৪

সেই সুমধুর স্বরে
সম্ভাসি আদর স্বরে
কে আর ডাকিবে মোরে
প্রাণনাথ বলিয়ে।
কে আসিবে সযতনে
কায়মনপ্রাণপণে
আহার লইয়া সনে
অভাগার লাগিয়ে
কে আর ডাকিবে আজি প্রাণনাথ বলিয়ে?

৫

আমিই বা আজি কারে
ডাকিয়া স্নেহেরি ভরে
দুঃখের সুখের কথা কার সনে বলিব
কার সনে বসি হয় সেই সুখ লভিব?

৬

সুখাইয়েছে আজি হায
দুঃখে বুক ফেটে যায়
স্নেহের নির্ঝর হতে বহিত যে নদী
প্রেমের তরঙ্গ যাতে বতো নিরবধি
ভাসিবে না আজি আর
আশার তরণী সার
উৎসাহেতে চলিবে না (সেই) স্রোতস্বতী নদী
স্নেহের নির্ঝর হতে বহিত যে নদী।

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে

কে মানব ঐ?

১

কে মানব ঐ, হাতে করি বীনা
হৃদয়ের সহ আপন যাতনা
গাইতে গাইতে চলেছে ধীরে?

২

নয়নের তেজে দুঃখ প্রকাশিছে
বিন্দু বিন্দু বারি তাহাতে ঝরিছে
দুখেতে ঢেকেছে বদনের আভা
যেন মেঘাচ্ছন্ন প্রভাকর প্রভা
পোহাবেনা ভাবি দুঃখের যামিনী
পদভরে যেন কাঁপায়ে মেদিনী
চলেছে মানব দুঃখেরি ভরে।

৩

কে মানব ঐ, হাতে করি বীনা
হৃদয়ে সহ আপন যতনা
গাইছে মৃদুল মধুর স্বরে?

৪

ঐ শুন গায় দুঃখেরি জ্বালায়
পাবনা, পাবনা, পাব নাকি হায়
নাহি কি বিশাল ভারত ভিতরে
রবি শশী, তারা, যথায় বিহরে
অরণ্যে নগরে গহন বিপিণে
পর্বতে কন্দরে অথবা পুলিনে
দয়ার আধার মানব এক?

৫

পাবনাকি হায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
সমস্ত ভারত ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
সকল মানব দেখিয়া দেখিয়া
দাতার প্রধান মানব এক?

৬

যাহার দয়ায় ভাসাইয়ে প্রাণ
গাইতে পাইব সুখেবই গান
হাতে করি বীনা দ্বারে দ্বারে দ্বাবে
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
গাইয়া বেড়াব ভুধবে ভূধরে
তাহারই দানের মহিমা গান।

৭

যাইব তথায় যেখানে দেখিব
মানবের ছায়া, অথবা শুনিব
নরের হৃদয় বিদারণ রব।
যাহাদের তেজ গিয়াছে নিবিয়া
শোণিত যাদের গিয়াছে শুখাইয়া।
যাদের হৃদয় গিয়াছে জ্বলিয়া
শবের মতন হইয়াছে সব।

৮

গিয়াছে হৃদয় জ্বলিয়া যাহার
জ্বলিয়াছে তনু দাবানল প্রায়
নাহিক শোণিত ধমনী শিরায়
উৎসাহেতে মন নাচে নাক আর।
দেখেনা যাহারা মেলিয়া নয়ন
জগতের শোভা হৃদয় রঞ্জন
লোহিত বরণে ভানুর কিরণ

সুনীল গগনে চাঁদেরি শোভন
রাহু ধুমকেতু তারা অগণন
নূতন নূতন জ্যোতিষ্ক আর।

৯

দেখেনা যাহারা নয়ন মেলিয়া
জগতের সুখ হৃদয় ভোরিযা,
হইতেছে ক্ষীণ ভাবিয়া ভাবিয়া
ভাবিয় তাহার নিজেবদশা;
যাইয়া তথায় কহিব সবায়
'দুঃখের দিন কি চির কাল বয
চিরস্থায়ী কিছু এ জগতে নয়
জনমিলে পুন হইবেক লয়
হইবে উদয় সুখেরি দশা'।

১০

যাইব তথায়—নিবিড় কাননে
দেখিব যেখানে যোগি জনগণে
একাগ্র হৃদয়ে বসি একাসনে
করিছেন সবে যোগ আরাধন।
কাঞ্চনে, প্রস্তরে যার সমজ্ঞান,
ধাম্মিকে, তস্করে দেখয়ে সমান
পারে নাক ভীতি করিতে বিধান
মহিষ ভল্লুক বরাহ গণ।

১১

কর-যুগ-জুড়ি সবায় প্রণমি
ধীরে ধীরে ধীরে কহিব গো আমি
আপনারা সবে জগতের স্বামী
জগতের রীতি জানেন ভাল;
পারেন বলিতে হাসিতে হাসিতে

জগতের গতি দেখিতে দেখিতে
পবনের স্বর শুনিতে শুনিতে
ভূত ভবিষ্যত সকল কাল।

১২

বলুন সকলে বিতরি কৃপায়
বলুন বলুন হবে কি উপায়?
হবে কি উপায় বলুন সবায়
ভারতের দুঃখ যাবে কি আর?
উদিবে কি পুন সুখেরি দিন?
দুঃখের দিন হবে কি বিলীন?
অনশন দুঃখ হইবে কি ক্ষীণ?
হৃদয়েতে সুখ পাবে কি আর?

১৩

আপনারা সবে আছেন হেথায়
ছাড়িয়া স্বদেশ ছাড়িয়া সবায়
দেখুন হেথায় ফিরিয়া হোথায়
কি দশা সবার হতেছে এবে।
পেটের জ্বালায় জ্বলিছে আগুন
ক্রমশ আগুন হতেছে দ্বিগুণ
নিবাতে তাহায় সকলে নিঃগুণ
জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িছে সবে।

১৪

সহেনারে আর যাতনা নিকর
সহিবেনা আর যাতনা নিকর
সহিচেনা আর যাতনা নিকর
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বলায়ে দেছে।
জ্বলিছে হৃদয় ধুধু ধুধু করি
ধুধু ধুধু করি দিবস শর্বরি
পুড়িতেছে আশা তাহার উপরি

উৎসাহ তেজ নিবিয়া গেছে।।

১৫

কে মানব ঐ, হাতে করি বীণা
হগুদয়ের সহ আপন যাতনা
মধুর স্ববেতে মৃদুল গাইছে।

* * *

পিতৃদেব র্স্বগারোহণ করিবার পর আমি মহা বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই তরুণ বয়সেই সংসারের সমস্ত ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইল। তাঁহার সেই বিস্তৃত কারবার পরিচালনের ভারও আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। বাল্যকাল হইতেই খেলা করিয়া ও লেখাপড়া করিয়া বেড়াইয়াছি, সংসারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না, কারবারের দিকেও কখন লক্ষ্য করি নাই, এই সমস্ত বিষয়েই আমি সম্পূর্ণরগুপে অনভিজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং কি করিয়া কি করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আমি সেই সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেই গ্রামে আমার এবগুপ আত্মীয় কেহই ছিলেন না যে আমার শুভাশুভের দিকে দৃষ্টি রাখেন, বা আমাকে কোনরগুপে সৎ পরামর্শ প্রদান করেন।

হঠাৎ লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় মনে অতিশয় কষ্ট হইল। ভাবিলাম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেহ এই সময় পিতার পরিত্যক্ত কারবার পরিচালন করেন ও তাহার আয় হইতে সংসারের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি আমার লেখাপড়া বন্ধ করি না।

আমাদিগের পাড়ায় ঁনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বাস করিতেন। পিতা যে সকল কারবার করিতেন, কেবল কাপড়ের কারবার ব্যতীত তিনিও সেই সকল কারবার করিতেন। পিতার কারবার অপেক্ষাও তাঁহার কারবার অতিশয় বিস্তৃত ছিল, সুতরাং বাহিরে যাহাই হউক ভিতরে পিতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। পিতার স্বর্গারোহণের পর তিনি সমস্ত কথা ভুলিয়া, তাঁহার সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে তাঁহার উদার চরিত্র দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। আমিও তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার খুড়া মহাশয় আমার পিতার জীবিত অবস্থাতেই জয়রামপুর হইতে তাঁহার বাসস্থান উঠাইয়া শান্তিপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি তাঁহার বাসোপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন

না; তাঁহার শ্বশুর আলয়েই সেই সময় বাস করিতেছিলেন।

নবীনবাবুর পরামর্শমত আমি খুড়া মহাশয়কে এক পত্র লিখিলাম, ঐ পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল—পিতা স্বর্গারোহণ কবিয়াছেন কিন্তু আপনি এখনও বর্তমান আছেন। আপনাকে পিতা অপেক্ষা ভিন্ন বলিয়া আমি মনে করি না। এখন যদি আপনি এই স্থানে আসিয়া আমাদিগকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করেন ও পিতার পরিত্যক্ত কারবার পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা হইলে আমাকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে হয় না। আপনি এখন আমাদিগের পিতৃস্থানীয়, যত শীঘ্র পারেন এই স্থানে আসিয়া কারবার ও সংসারের ভার গ্রহণ করিবেন।

খুড়া মহাশয় কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বা একবারের জন্যও আমাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। সেই সময় আমার মাতামহ ঁদ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও মাতুলদ্বয় ঁহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঁনীলরত্ন বন্দ্যোপাধায় বর্তমান ছিলেন। খুড়া মহাশয়ের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া ঁমাতামহ [য] মহাশয়কে এরূপ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলাম। তিনি সেই সময় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাব পত্র পাইয়া [য] তিনি আমার জেষ্ঠ্য মাতুল ঁহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদিগের বাটিতে পাঠাইয়া দিলেন, মাতুল মহাশয় কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া দুই দিবস মাত্র সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্বক আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই দিবস হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি অনশনে মরিতেও হয় তাহা হইলেও আপনার নিতান্ত আত্মীয়ের নিকট কখন গমন করিব না। পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না কিন্তু আপনার কাহারও নিকট কখন গমন করিব না।

পিতার পরলোক গমন করিবার পর সৎকারার্থ তাঁহার দেহ চাকদহে লইয়া যাইতে হয় ইহা আমি পূর্ব্বেই পাঠকগণকে বলিয়াছি। কিন্তু বিনা পয়সায় ঐ সকল কার্য্যসম্পন্ন হয় না। সুতরাং কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল। পিতার মৃত্যুর পর দিবস প্রাতে নবীনবাবু আসিয়া আমাদিগের সকলের সম্মুখে পিতার লোহার সিন্দুক খুলিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন উহার মধ্যে চব্বিশটি কি পাঁচিশটি টাকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে আর কিছু টাকা হওলাত স্বরূপ প্রদান করিয়া আমাকে চাকদহ পাঠাইয়া দিলেন।

কারবারে অনেক টাকা "বিলাত" পড়িয়া থাকায় ও পিতার পরলোক গমনের কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সাবেক বাটীতে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি বাটী প্রস্তুত করায় ভিতর ভিতর তাঁহার অর্থের টানাটানি পড়িয়াছিল, কিন্তু সেকথা বাহিরের লোক বিন্দু

বিসর্গও জানিতে পাবিয়াছিল না। যখন তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করেন সেই সময় তাঁহার ইষ্টক-নির্মিত বাটী প্রস্তুত শেষ হয় না। পাওনা টাকা আদায় করিয়া পরিশেষে আমাকে ঐ কার্য্য শেষ করিতে হয়, তদ্ব্যতীত তাঁহার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আরও কিছু অর্থ বাহির হইয়া যায়, সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে আমাকে বিশেষ রূপ অর্থের কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামে কাপড় বিক্রয়ের প্রধান সময় বৎসরে দুইমাস আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার সময় ও চৈত্র মাসে চৈত্র সংক্রান্তির সময়। তাহাও প্রায় নগদ বিক্রয় হয় না আশ্বিন মাসে কাপড় লইবার সময় লোকে চৈত্র মাসের কাপড়ের দেনা মিটাইয়া দেয় ও চৈত্রমাসে আশ্বিন মাসেব দেনা দিয়া থাকে। এইবরূপ লোকের নিকট যেমন অনেক টাকা পাওনা থাকে, কাপড়ের মহাজনের নিকটও সেইরূপ অনেক টাকা দেনা থাকে। যে রূপ নিয়মে পিতা তাঁহার কাপড়ের টাকা আদায় করিতেন সেইরূপ নিয়মে তিনি তাঁহার কাপড়ের মহাজনকেও টাকা দিয়া পরিশোধ করিতেন। তাঁহার কাপড়ের প্রধান মহাজন ছিল শান্তিপুরের জনৈক ব্যক্তি—জাতিতে শুঁড়ি। যে সময় পিতা পরলোক গমন করেন সেইসময় ঐ মহাজনের নিকট তাঁহার প্রায় আড়াই সহস্র টাকা দেনা ছিল। ঐ টাকা তিনি আশ্বিন মাসে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চারি পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের কাপড় আনিতেন ও ক্রমে টাকা দিয়া নাগাইদ চৈত্র উহা একেবারে পরিশোধ করিয়া দিতেন, ইহাই তাঁহার নিয়ম ছিল।

ভাদ্র মাসের শেষে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং পূজার সময় নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছিল। সেই সময় মহাজনের টাকা না দিলে; কাপড় আনিবার সুবিধা হইবে না, অথচ কাপড় আনিয়া খরিদ্দারদিগকে প্রদান করিতে না পারিলে তাহাদিগের নিকট যে সকল টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু সেই সময় তহবিলে কিছুমাত্র টাকা ছিল না। অথচ লোকের নিকট কাপড়ের দরুন প্রায় সাত আট হাজার টাকা পাওনা ছিল।

অনেক চেষ্টা করিয়া যাহাদিগের নিকট টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া কোন গতিকে কিছু আদায় করিলাম, ও কিছু হাওলাত করিয়া পরিশেষে বারশত টাকার যোগাড় করিলাম। কিন্তু অবশিষ্ট তেরশত টাকা আর কোনরূপেই যোগাড় করিতে পারিলাম না। ঐ বারশত টাকা লইয়া শান্তিপুরে মহাজন বাটীতে গমন করিলাম। তাঁহাকে আমার সমস্ত অবস্থা বলিলাম ও ঐ বারশত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিয়া, পিতা যেরূপ নিয়মে তাঁহার নিকট হইতে কাপড় গ্রহণ করিতেন,

আমিও সেইরপ্তপ নিয়মে তাঁহার নিকট হইতে কাপড় লইতে সম্মত হইলাম। অবশিষ্ট যে টাকা বাকী রহিল তাহা পূজার দুই পাঁচ দিবস পরেই তাহাকে প্রদান করিতে চাহিলাম, কারণ জানিতাম পূজার সময় অনেক টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে।

মহাজন আমাকে দুই তিন দিবস সেই স্থানে অপেক্ষা করাইয়া পরিশেষে কহিলেন "এত টাকা বাকী থাকিতে এই সময়ে আমি কাপড দিই কি প্রকারে? অভাবপক্ষে যোগাড় করিয়া আপনি আর পাঁচশত টাকা আনিয়া কাপড় লইয়া যান। অবশিষ্ট টাকা পূজার পর প্রদান করিবেন।

॥ ৩৮ ॥

মহাজনের এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে অনেক কবিযা কহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার কথায় সম্মত হইলেন না। অগত্যা আমাকে পুনবায় বাটী আসিতে হইল। বাটী আসিয়া নবীনবাবুকে সমস্ত কথা কহিলাম, তিনি মহাজনের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও অনেক চেষ্টা করিয়াও আরও যাহা কিছু হাওলাত করিতে পারিলাম তাহা সংগ্রহ করিয়া কোন গতিকে আর তিনশত টাকাব যোগাড় করিলাম, পাঁচ শত টাকার যোগাড় কোন রপ্তপেই করিয়া উঠিতে পারিলাম না, এই টাকা লইয়া পুনরায় মহাজনের নিকট গমন করিলাম। এবার নবীনবাবু তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা উভয়ে শান্তিপুরে গিয়া সেই মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, ও তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলাম, তিনি যে পাঁচশত টাকা চাহিয়াছিলেন, এখন হঠাৎ তাহার সমস্ত যোগাড় হইয়া উঠে নাই, তবে তিনশত টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়াছি, এই কথা তাঁহাকে কহিলাম। তিনি ঐ টাকা চাহিলেন।

তাঁহার কথার উত্তরে নবীনবাবুর কর্ম্মচারী কহিলেন "যাঁহার নিকট কাল রাত্রে ঐ টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি এখন বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া ঐ টাকা এখন আনা হয় নাই, আপনি যদি ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় কাপড় দিতে চাহেন তাহা হইলে কাপড় দিন, বৈকালে আসিয়া ঐ টাকা দিয়া যাইব ও ঐ কাপড়ের চালানও লইয়া যাইব"। এই বলিয়া সেই কর্ম্মচারী সেই সময় ঐ টাকা সেই মহাজনকে প্রদান করিলেন না, টাকা তিনি কোন স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন না, উহা তাঁহার নিকটই ছিল, তাহার ইচ্ছা ছিল যদি মহাজন এবারও কাপড় না দেন তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ টাকা এখন প্রদান করা হইবে না। ঐ টাকা দিয়া অপর কোন স্থান হইতে যতদূর সম্ভব কাপড় খরিদ

করিয়া লইয়া যাইবেন।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া মহাজন কি একটু চিন্তা করিলেন ও পরিশেষে আমাদিগকে কাপড় প্রদান করিতে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রদান করিলেন ও আমাদিগকে কহিলেন প্রথমবার অধিক টাকার কাপড় গ্রহণ করিবেন না, দেখিয়া শুনিয়া সকল রকমের কাপড়ে দুই কি আড়াই হাজার টাকা মূল্যের কাপড় গ্রহণ করুন। অগত্যা আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, ও যেরূপ ভাবে কাপড় সেই সময় আমার খরিদ্দারগণের লইবার সম্ভাবনা সেই প্রকারের নানা রূপ কাপড় বাছিয়া বাহির করিলাম, হিসাব করিয়া ঐ সকল কাপড়ের মূল্য প্রায় তিন সহস্র টাকা হইল, এইরূপে কাপড় বাছিয়া লওয়া কার্য্য শেষ হইলে আমরা সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। মহাজন সেই সকল কাপড় মোট বাঁধাইয়া রাণাঘাট স্টেশনে নিয়মিত রূপ পাঠাইয়া দিবেন ইহা আমাদিগকে বলিয়া দিলেন। আমরা পুনরায় বৈকালে গিয়া তাহার দোকানে উপস্থিত হইলাম। মহাজন আমাদিগকে দেখিবামাত্রই কহিলেন আপনাদিগের কাপড় রেলে চলিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের আনীত তিনশত টাকা তাঁহাকে প্রদান করিলাম, তিনিও যে কাপড় পাঠাইয়া দিয়াছেন কহিলেন তাহার একটি চালান আমাদিগকে প্রদান করিলেন। উহা লইয়া আমরা রাণাঘাট রেলওয়ে স্টেশনে গমন করিলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমাদিগের কাপড় দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম কাপড়ের গাড়ি সেই স্থানে আসিয়া তখনও পৌঁছে নাই, সুতরাং সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সেই দিবস সেই স্থানে পৌঁছিল না, পর দিবসও উহা আসিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় আমরা সেই স্থান হইতে শান্তিপুরে গমন করিলাম কিন্তু মহাজনের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না, তিনি আমাদিগের সম্মুখে আর বাহির হইলেন না। সেই স্থানে আমাদিগের আরও দুই দিবস গত হইয়া গেল। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া পরিশেষে সেই দোকানের একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে কহিলেন "আপনারা নিরর্থক কেন কষ্ট করিতেছেন, মহাজন আপনাদিগকে আর কাপড় দিবেন না, বা আপনাদিগের সহিত আর কারবার করিবেন না, আপনারা যে কাপড় বাছিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন সে কাপড় আপনাদিগের নিকট রাণাঘাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয় নাই, উহা অপর একজন ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। আপনারা দেশে গমন করুন বা যদি অপর কোন স্থান হইতে কাপড় খরিদ করিতে পারেন তাহার যোগাড় দেখুন"।

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম মহাজন যে

আমাদিগের সহিত এইরূপ প্রতারণা করিবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিয়া ছিলাম না।

॥ ৩৯ ॥

যে মহাজন আমাদিগকে এইরূপে বিশেষ রূপ বিপদগ্রস্ত করিলেন তাহার দোকানের কিছুদূরে একটি ব্রাহ্মণ মহাজনের একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। পিতা কখন কখন তাঁহার দোকান হইতে কিছু কিছু কাপড় নগত খরিদ করিতেন। তাহার নিকট কখন কোনরূপ দেনা থাকিত না। যে সকল কাপড় সময় সময় ঐ শুঁড়ি মহাজনের নিকট পাওয়া যাইত না, সেই সকল কাপড় তিনি তাঁহার দোকান হইতে নগত খরিদ করিয়া লইতেন। তাঁহার সহিত পিতার যে এইরূপ কারবার ছিল তাহা আমরা কেহই অবগত ছিলাম না।

আমাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমাদিগকে ডাকিলেন ও আমাদিগেব নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমাকে কহিলেন, আপনার পিতার সহিত আমার অতিশয় সামান্য কারবার ছিল। এই সময় যদি আপনি আপনার খরিদ্দারদিগকে কাপড় না দিতে পারেন তাহা হইলে আপনার বিস্তর টাকা লোকসান হইবে। আমি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া কিছু কাপড় দেনায় দিতেছি, উহা লইয়া গিয়া কোন গতিকে আপনার কারবার বজায় রাখুন, আমি কিন্তু আপনাকে পাঁচশত টাকার অধিক কাপড় প্রদান করিতে পারিব না। ঐ পাঁচশত টাকা আমাকে প্রদান করিলে পুনরায় আবশ্যক অনুযায়ী কাপড় আমি আপনাকে দেনায় দিতে পারিব। সেই ব্রাহ্মণ মহাজনের কথা শুনিয়া আমি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলাম তাহা বলিতে পারি না। সেই মহাজনই দেখিয়া শুনিয়া পূজার সময় বিক্রয় উপযোগী পাঁচশত টাকার পরিমিত কাপড় আমাকে প্রদান করিলেন। ঐ কাপড় গ্রহণ করিয়া আমরা হৃষ্টপুষ্ট মনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। নিতান্ত আবশ্যক অনুযায়ী ঐ কাপড় কিছু কিছু করিয়া আমার খরিদ্দারদিগকে প্রদান করিয়া সেই সময় কোন গতিকে কারবার রক্ষা করিলাম সত্য, কিন্তু যে সকল লোকের কাছে আমার টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগকে, তাহাদিগের আবশ্যকমত সমস্ত কাপড় প্রদান করিতে না পারায় [য] অধিকাংশ পাওনা টাকা সেই সময় আদায় করিতে পারিলাম না। কোন গতিকে সহস্র টাকা আদায় হইল। বলা বাহুল্য একাদশীর দিনই শান্তিপুরে গমন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ মহাজনের টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া আসিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহারই সহিত আমার কাপড়ের কারবার চলিতে লাগিল। সেই

সময় সেই শুঁড়ি মহাজন সেই সহস্র মুদ্রার তাগাদা করিলেন। আমি তাহাকে কহিলাম "ঐ টাকা আমি এখন কিছুতেই প্রদান করিতে পারিব না, তবে পিতৃঋণ আমি কোনরপ্তপেই রাখিব না, ক্রমে আমি সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিব।

|| ৪০ ||

এই সময় ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আমি একটি নিতান্ত অধর্মাচরণ করিয়াছিলাম। দুই তিন মাসের মধ্যে সেই শুঁড়ি মহাজন যখন আমার নিকট হইতে টাকা পাইলেন না, তখন তিনি ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবার নিমিত্ত রাণাঘাটের আদালতে আমার নামে এক মকর্দ্দামা রুজু করিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল আমার নামে ডিক্রী করিয়া যে সময় আমার বাটীতে অপর মহাজনের দ্রব্যাদি পাইবেন তাহা ক্রোক করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা আদায করিয়া লইবেন। তাহাতেও যদি কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে আমাদিগের পাকা ভদ্রাসন বাটী ও জমি প্রভৃতি যে কিছু সামান্য বিষয় ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া নিজের টাকার কিনারা করিবেন।

সমন পাইবার পব আমি সেই মহাজনের নিকট গমন করিলাম, তাহার প্রাপ্য টাকা কোনরপ্তপে বন্দোবস্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ [য] রপ্তপ অনুরোধ করিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, ও পুনর্বার তাঁহাকে আবার অনুরোধ করি এই ভাবিয়া পরিশেষে তিনি আমার সহিত আর সাক্ষাৎও করিলেন না। সুতরাং নিতান্ত দুঃখিত হপ্তদয়ে আমাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

মকর্দ্দামার ধার্য্য দিবসের [য] পূর্বদিন আমি রাণাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরদিবস প্রাতে সেই মহাজনও সেই স্থানে আগমন করিলেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিস্তর খোসামোদ করিলাম, সেই সময় কোনরপ্তপে ঐ টাকা প্রদান করিবার ক্ষমতা আমার নাই তাহা তাঁহাকে বিশেষ রপ্তপ কহিলাম, আরও কহিলাম বিচারকের নিকট আমি কবুল ডিক্রী দিতেছি, আপনি মাসে মাসে ঐ টাকা একটি কিস্তিবন্দী করিয়া লউন। তিনি তাহাতে কোন রপ্তপেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে আমি তাঁহার হাতে পর্য্যন্ত ধরিলাম তাহাতেও তাঁহার মন নরম হইল না। আমার অবস্থা দেখিয়া সেই সময় সেই স্থানে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও তাঁহাকে বিশেষে [য] রপ্তপ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না ও কহিলেন যাহার পাকা বাটী আছে তাহার ঐ বাটী বিক্রয় করিয়া যখন সেই টাকা অনায়াসেই আদায় হইতে পারিবে তখন তাহার সহিত কিস্তিবন্দী করিব কেন?

॥ ৪১ ॥

সেই সময় আমার অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া আসিতেছিল। ঐ টাকা প্রদান করিবার উপায় আমার ছিল না বলিয়াই কিস্তিবন্দীর নিমিত্ত মহাজনের এত খোসামোদ করিতেছিলাম।

পিতার আমলের যিনি গোমস্তা ছিলেন তিনিও আমার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। মহাজনের কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় চটিয়া গেলেন ও আমাকে কহিলেন, ইহাকে খোসামোদ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ইনিই নীচ জাতি কিন্তু বিচারক ইহার ন্যায় নীচ জাতি নহেন; তোমার অবস্থা শুনিলে তাঁহার যে একেবারে দয়া হইবে না তাহা নহে তিনি যাহা করিয়া দিবেন তাহাই হইবে। এই বলিয়া আমাকে লইয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আদালতের নিকটবর্তী একটি আম্রবৃক্ষতলে গিয়া আমরা উপবেশন করিলাম।

সেই স্থানে উপবেশন করিবার পর তিনি আমাকে কহিলেন ঐ ব্যক্তি যেরূপ ভাবে আমাদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাতে উহাকে সহজে টাকা দেওয়া হইবে না। ঐ টাকার ডিক্রী করিতে যাহাতে সে একটু বেগ পায় তাহা করিতে হইবে।

আমি। কি রূপে উহাকে বেগ দিবে? উহার প্রকৃত টাকা ধারি এক কথায় উহার ডিক্রী হইয়া যাইবে।

গোমস্তা। তাহা বলা যায় না। উহাকে যখন এত খোসামোদ করা গেল কিন্তু কিছুতেই যখন উহাকে কিছুমাত্র নরম করিতে পারিলেন না, তখন এই মকর্দ্দামায় জবাব দিতে হইবে।

আমি। কিরূপ জবাব দিব?

গোমস্তা। জবাব এই দিতে হইবে যে আমার পিতার কেবলমাত্র ১৫০০ টাকা দেনা ছিল তাহা দিয়া আমি পরিশোধ করিয়া দিয়াছি, আমি আর কিছুমাত্র ধারি না।

আমি। এইরূপ মিথ্যা কথা বলিব কি প্রকারে? ও তাহা প্রমাণ করিবই বা কি প্রকারে?

গোমস্তা। তোমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না, তোমার পিতার কোথায় কি দেনা আছে তাহার সমস্ত অবস্থা আমি অবগত আছি তুমি খাতাপত্রে যাহা দেখিতেছ তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ তোমার পিতার কোথায় কি দেনা আছে। মহাজনের

হিসাব, জমা খরচ ও সমস্ত কাগজপত্র আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ইহা বেশ ভাল করিয়া দেখ। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে বর্তমান মহাজনের কেবলমাত্র ১৫০০ টাকা পিতার নিকট পাওনা ছিল, তাহার মধ্যে তুমি একবার ১২০০ টাকা ও আর একবার ৩০০ টাকা দিয়াছ। সুতরাং মহাজন আর একটি পয়সাও পাইবে না।

এই বলিয়া গোমস্তা আমাকে আমাদিগের খাতাপত্র সমস্ত দেখাইল; দেখিলাম যেসময় পিতা বর্তমান ছিলেন সেই সময় এক তারিখে মহাজনের নামে এক সহস্র টাকা এরূপভাবে খরচ লিখিয়া রাখিয়াছে যে তাহা দেখিয়া কোনরূপেই বুঝিতে পারা যায় না যে উহা পরের লেখা। একদিবস মহাজনকে ১০০ টাকা দেওয়া ছিল, এখন সেই ১০০ টাকা ১১০০ শত টাকায় পরিণত হইয়াছে। সেই দিবস বাস্তবিকই এক হাজারের অধিক টাকা জমা ছিল, চাউলের মহাজনকে দিবার জন্য পিতা সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেই দিবসের তহবিলে যে সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না তাহা নহে সুতরাং ঐ টাকা হইতে অনায়াসেই সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইতে পারে। গোমস্তা ঠিক সেইরূপ ভাবে জমা খরচ লিখিয়া রাখিয়া ছিল। চাউলের মহাজনকে যে দিবস ঐ টাকা দেওয়া হয় সেই দিবস একজন ব্যাপারির নামে হাজার টাকা মিথ্যা হাওলাত জমা করিয়া লইয়া জমা খরচ ঠিক করিয়া রাখে।

গোমস্তা যেরূপ ভাবে খাতাপত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে ঐ খাতা দেখিয়া কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে ঐ মহাজনকে আর একবার কিস্তিবন্দী করিয়া লইবার কথা বলা যাইবে, তাহাতেও যদি তিনি সম্মত না হন তাহা হইলে মহাজনের কোন টাকা আমার নিকট পাওনা নাই ইহা বলিয়া জবাব দেওয়া যাইবে। এইরূপ স্থির করিয়া সেই আদালতের একজন উকিলকে অতঃপর নিযুক্ত করা হইল।

নিয়মিত সময়ে আমরা সকলে আদালত গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাজনকে পুনরায় অনুরোধ করিলাম, আমার উকিল পর্য্যন্তও এবার তাঁহাকে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন কিন্তু মহাজন কিছুতেই কিস্তিবন্দী করিতে সম্মত হইলেন না।

সময়মত আদালতে মকর্দ্দামার ডাক হইল। কিছুই ধারি না বলিয়া মোকর্দ্দামায় জবাব দেওয়া হইল। বিচারক মহাজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার খাতাপত্র সমস্ত দেখিলেন। জেরায় মহাজন স্বীকার করিলেন যে আমার নিকট হইতে তিনি একদফায় ১২০০ টাকা ও আর একদফায় ৩০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতার

নিকট হইতে ১১০০ টাকা তিনি যে একদিন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা স্বীকার করিলেন না। ঐ দিবস কেবল একশত টাকা পাইয়াছেন ইহাই কহিলেন, তাঁহার খাতাপত্রেও কেবল উহাই লেখা আছে তাহাও বিচারক দেখিলেন। পরিশেষে আমার জবানবন্দী হইল; আমি কহিলাম আমি নিজে কিছুই অবগত নহি। পিতার পরিত্যক্ত খাতাপত্র দেখিয়া আমি বুঝিয়া পারিয়াছিলাম মহাজনের নিকট তাঁহার ১৫০০ টাকা দেনা আছে, ঐ ১৫০০ টাকা আমি মহাজনকে প্রদান করিয়াছি। পিতার সময় যিনি গোমস্তা ছিলেন তিনি আদালতে উপস্থিত আছেন তিনিই সমস্ত বলিতে পারিবেন।

আমার এই কথা শুনিয়া বিচারক সেই গোমস্তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন তিনি কহিলেন তাহার সম্মুখে মহাজনকে ১১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে ও তিনি উহা সেই সময় খাতায় খরচ লিখিয়াছেন। এই বলিয়া সেই গোমস্ত সেই সকল খাতা বিচারকের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উহা উত্তমরূপে দেখিয়া ও গোমস্তার কথা শুনিয়া ফরিয়াদী বা তাহার উকিলের আর কোন কথা শুনিলেন না, মকর্দ্দামা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন।

মহাজন নিতান্ত বিষণ্ন মনে আদালতের বাহিরে আগমন করিলেন, আমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন করিলাম ও কহিলাম আপনার মকর্দ্দামা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল সত্য কিন্তু আমি আমার পিতৃঋণ রাখিব না। যে রূপেই হউক বা যত দিবসেই হউক আমি উহা আপনাকে প্রদান করিয়া পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব।

আমার কথা শুনিয়া মহাজন কেবল এই মাত্র কহিলেন যাহা আপনার ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন; এখন আমার কোন কথা বলিবার মুখ নাই; এই বলিয়া তিনি আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আমিও আপন গ্রামে গমন করিলাম।

ঐ মহাজনের কলিকাতায় বড়বাজারে একখানি কাপড়ের দোকান ছিল। এই ঘটনার প্রায় ৩ বৎসর পরে আমি কলিকাতা পুলিশে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি, সেই সময় আমার বেতন নিতান্ত সামান্য হইলেও মাসে মাসে উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সেই মহাজনের কলিকাতার দোকানে দিতে আরম্ভ করি ও ক্রমে দশ বৎসরে আমি সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি।

॥ ৪২ ॥

পিতার সেই পরিত্যক্ত কারবার আমাকে কোনরূপে তিন বৎসরের অধিক

চালাইতে হয় না; ক্রমে দেখিতে পাইলাম লোকের নিকট পিতার প্রায় ১০/১১ হাজার টাকা পাওনা ছিল, মহাজন ও কর্জবাবদে তাঁহার দেনা ছিল প্রায় ৭/৮ হাজার টাকা। পিতার মৃত্যুর পর পাওনাদারেরা টাকার জন্য বিশেষ রপ্তপ পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। অথচ যাহাদিগের নিকট পাওনা তাহারা সর্বতোভাবে আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি বিশেষ কষ্ট করিয়া দুই বৎসর কাল কোনরপ্তপে সেই কারবার চালাইলাম। কিন্তু পরিশেষ [য] ক্রমে উহা বন্ধ হইয়া গেল। যাহাদিগের সহিত বিশেষ একটু আত্মীয়তা ছিল বা গ্রামের মধ্যে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাহাদিগের নিকটই আমার অধিক টাকা পাওনা ছিল। তাহারাই বিশেষ অনুকম্পা করিয়া তাহার কিছুমাত্র প্রদান করিলেন না, উহাদিগের মধ্যে দুই একটি ভদ্রলোক তাঁহাদিগের বাকী টাকা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই মনোদুঃখ কোনরপ্তপেই নিবারণ করিতে না পারিয়া আমাকে নানা রপ্তপে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিম্নলিখিত একটি ক্ষুদ্র ঘটনা দেখিলেই পাঠকগণ তাহার আভাস প্রাপ্ত হইতেন।

কাপড় বিক্রয়ের নিমিত্ত পিতার সময় হইতেই কয়েকজন মুচি পাইকের ছিল। তাহারা আমাদিগের বাটি হইতে কাপড় লইয়া গিয়া নানা স্থানে ফেরি করিয়া বা হাটে গমন করিয়া ঐ সকল কাপড় বিক্রয় করিত, বিক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা সন্ধ্যার পর আমাদিগের বাটিতে আনিয়া হিসাব দিত। আমাদিগের বাটি হইতে যে দর সাব্যস্ত করিয়া তাহারা কাপড় লইয়া যাইত, তাহার অধিক মূল্যে তাহারা যাহা বিক্রয় করিতে পারিত তাহা তাহাদিগের হইত। সন্ধ্যার পর কাপড়ের হিসাব দিবার সময় যে সকল কাপড় সেই দিবস বিক্রয় না হইত, তাহা ফেরত দিত ও যাহা বিক্রয় হইয়া যাইত তাহার নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদান করিত। পর দিবস প্রত্যুষে আবার কাপড় লইয়া পুনরায় বিক্রয়ের জন্য বাহির হইয়া যাইত। এই রপ্তপে বহু দিবস হইতে তাহারা পিতার সহিত ওপরে আমার সহিত কারবার করিয়া আসিতেছিল। উহার মধ্যে একজন এক রাত্রিতে আসিল না, সেই দিবস প্রাতঃকালে সে প্রায় ২০০ শত টাকার কাপড় লইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে ফিরিয়া না আসায় পর দিবস প্রাতে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম, তাহার বাটির লোকেরা কহিল সে রাত্রিতে বাটিতে আইসে নাই, কিন্তু পাড়ায় লোকদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম সে কল্য অধিক রাত্রিতে বাটিতে আসিয়াছিল, পুনরায় অতি প্রত্যুষে কাপড়ের মোট লইয়া বর্হিগত হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি আর কোন কথা না বলিয়া আপন বাটিতে প্রত্যাগমন

করিলাম ও সেই দিবসও তাহার অপেক্ষা করিলাম ও সেই রাত্রিতেও সে কাপড় বা টাকা লইয়া আমাদিগের বাটিতে আসিল না, পর দিবস প্রাতে তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলাম, ঐ লোকটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সে কিছু মাত্র কাপড় বিক্রয় করিতে পারে নাই, অদ্য দেখিবে, যদি কিছু বিক্রয় করিতে পারে, তাহা লইয়া সন্ধ্যার পর আসিবে। এই কথা শুনিয়া আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু সে সেই রাত্রিতেও আসিল না। পর দিবস অতিশয় প্রত্যুষে একজন কর্ম্মচারীর সহিত আমি পুনরায় তাহার বাটিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, দেখিলাম আমার নিকট হইতে সে যে কাপড় লইয়া গিয়াছিল তাহার একখানিও তাহার নিকট নাই। জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "গত রাত্রিতে হাট হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন একটি মাঠের মধ্যে কয়েকজন লোক তাহাকে মারিয়া তাহার কাপড়ের মোট ও নগত যাহা কিছু ছিল তাহার সমস্তও কাড়িয়া লইয়াছে।"

উহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম "এ সংবাদ আমাকে প্রদান কর নাই কেন?"

মুচি। আমার আসিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া আমি রাত্রিতে ঐ সংবাদ আপনাকে প্রদান করি নাই।

আমি। থানায় এ সংবাদ দিয়াছ?

মুচি। না।

আমি। তোমার সহিত আর যাহারা আসিতেছিল তাহাদিগের কিছু কাড়িয়া লইয়াছে না কেবল তোমারই মোট কাড়িয়া লইয়াছে?

মুচি। আমার সহিত আর কোন ব্যক্তি ছিল না, আমি হাট হইতে একাকীই আসিতেছিলাম।

আমি। অসম্ভব, রাত্রিকালে বেপারিয়া হাট হইতে আসিবার কালীন কখনই একাকী আসে না।

আমার কথায় সে আর কোনো উত্তর করিল না, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম সে আমার সমস্ত কাপড় বিক্রয় করিয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এখন কি করা যাইতে পারে? সে পরের জমিতে বাস করে, কেবলমাত্র একখানি খড়ের পুরাতন ও ভাঙ্গা ঘর আছে, তাহার মূল্য দশ টাকার অধিক হইবে না, ঘরে কোন তৈজসপত্র বা দ্রব্যাদি কিছুই নাই, যে তাহার নামে নালিশ করিয়া ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারি। থাকিবার মধ্যে তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, উহার মূল্য

৪০/৫০ টাকা হইতে পারে।

উহার ব্যবহার দেখিয়া আমার অতিশয় ক্রোধের উদয় হইল, আমার বাল্য স্বভাব তখন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সুতরাং আমি সেই রাগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার সেই গাভীটি খুলিয়া আমার বাটীতে আনিলাম ও তাহাকে বলিয়া আসিলাম টাকার যোগাড় করিয়া আমার বাটীতে আসিলে তাহার ঐ গাভী আমি ছাড়িয়া দিব, নতুবা উহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব তাহা গ্রহণ করিব, অবশিষ্ট টাকার জন্য উহার নামে নালিশ করিয়া যদি টাকা আদায় করিতে পারি ভালই নতুবা উহাকে জেলে দিব।

॥ ৪৩ ॥

ঐ মুচি আমাদিগেব গ্রামে জনৈক মৌলিক মহাশয়ের প্রজা ছিল, ঐ মৌলিক মহাশয় আমাদিগের নিতান্ত আত্মীয়ের মধ্যে একজন ছিলেন, আমি বাল্যকাল হইতে সদা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের বাটীতে থাকিতাম ও বিপদ আপদের সময় তাঁহাকেই প্রধান সহায় বলিয়া মনে করিতাম। তিনি আমার পিতার একজন প্রধান বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার যদি কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইত, পরামর্শ দিয়া হউক শারীরিক [য] পরিশ্রম করিয়া হউক বা অর্থের দ্বারাই হউক পিতা সর্বদাই তাঁহার উপকার করিতেন। পিতৃবন্ধু বলিয়া আমিও তাঁহাকে সেইরূপ মান্য করিয়া চলিতাম ও সদাসর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী থাকিতাম। আমার সেই মুচি ব্যাপারির গরু ধরিয়া আনার পর মুচি সেই জমিদার মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। ও তাঁহাকে কি বলিল, বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি অমনি আমাদিগের এত দিবসের সমস্ত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা ভুলিয়া, ও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করিয়া, তাঁহার প্রজা সেই মুচির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিজের একজন গোমস্তা তাহার সহিত চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইয়া দিয়া আমার নামে ফৌজদারিতে এক গরু চুরি মকর্দ্দামা রুজু করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি আমার কি রূপ পিতৃবন্ধু ছিলেন ও আমার তিনি কি রূপ উপকারী, সে যাহা হউক তাঁহার অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কোন গতিকে ঐ মুচি ব্যাপারির সহিত ঐ ফৌজদার মকর্দ্দামা মিটমাট হইয়া গেল, আমি ঐ চুরি মকর্দ্দামা হইতে কোনরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিলাম, গরুটি আমি তাহাকে ফেরত দিলাম ও যে দুইশত টাকা তাহার নিকট আমার ছিল তাহাও আর পাইলাম না।

গ্রামের মধ্যে যাহাদিগকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া জানিতাম, যাহাদিগের নিকট আমার অনেক টাকা পাওনা ছিল তাঁহাদিগকে এখন আমি উত্তমরূপে চিনিতে পারিলাম। একজনের পরামর্শে ও সাহায্যে ফৌজদারি মকর্দ্দামার আসামী হইলাম, অপর সকলে প্রাপ্য টাকাগুলি আর আমাকে প্রদান করিলেন না।

পিতা বর্তমান থাকিতেই তিনি আমার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহাকে ইহজীবন পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া তিনি সেই কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সেই বৃদ্ধা পিসি উদ্যোগ করিয়া পরিশেষে সেই কার্য্য সমাপন করিয়া তোলে ১২৮০ সালের মাঘ মাসের প্রারম্ভেই আমার পরিণয় কার্য্য শেষ হইয়া যায়। আমাদিগের গ্রাম হইতে চারি ক্রোশ ব্যবধানে গোপালপুর নামক একখানি পল্লীগ্রামে কালাচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক শুদ্ধ গোত্রীয় বাস করিতেন, তাঁহারই তৃতীয়, বা কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মানদা সুন্দরী দেবীর সহিত আমার পরিণয় কার্য্য সমাপন হইয়া যায়।

আমি সেই সময় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলাম সত্য কিন্তু দিন দিন আমার অবস্থা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। কারবারের অবস্থা ক্রমেই পতন হইতে লাগিল, অর্থের ক্রমেই অনটন হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ নিতান্ত টানাটনি সত্ত্বেও কোন গতিকে কারবার চালাইতে লাগিলাম। যেরূপে পারি পাওনা টাকা আদায় করিয়া ক্রমে কর্জের টাকা ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিতে লাগিলাম। পিতার আমলের যে সমস্ত দেনা ছিল তিন বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্তই প্রায় পরিশোধ করিলাম, কেবলমাত্র তিন সহস্র মুদ্রা দেনা রহিয়া গেল। ঐ টাকা ও পিতার পুঁজির প্রায় তিন সহস্র টাকা লোকের নিকট পাওনা রহিয়া গেল, কোন গতিকে আর তাহা আদায় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কাহারও কাহারও নামে নালিস করিয়া ডিক্রী করিলাম, কিন্তু তাহাদিগের কোনরূপ সঙ্গতি না থাকায় ঐ টাকা আদায় হইল না, কাহারও অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িল যে, তাহার নামে খরচ করিয়া নালিশ করিবার ও প্রয়োজন হইল না। কেহ মরিয়া গেল, কেহ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। গুড়ের কারবার উপলক্ষে যে সমস্ত দরিদ্র প্রজাগণের নিকট দাদনের টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই আর পাওয়া গেল না, গ্রাম হইতে বাসস্থান উঠাইয়া কে কোথায় গমন করিল।

ধানের কারবার উপলক্ষে যাহাদিগের নিকট ধান্য ক্রমে ক্রমে পাওনা হইয়াছিল দুই তিন বৎসর ভালরূপ ধান্যাদি উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজাদিগের নিকট হইতে ঐ

সকল বাকি ধান্য আর আদায় হইল না। প্রথম বৎসর ধান্য ভাল রূপে আদায় না হওয়ায় দ্বিতীয় বৎসর তাহাদিগের আবশ্যক উপযোগী ধান্য আর প্রদান করিতে পারিলাম না। সুতরাং তাহারা অন্য স্থান হইতে ধান্য কর্জ্জ লইল। সেই বৎসর যে সামান্য ধান্য তাহাদিগের উৎপন্ন হইল তাহা নূতন মহাজনকে প্রদান করিয়া আমাকে এত সামান্য পরিমাণে দিতে সমর্থ হইল যে তৃতীয় বৎসর আর তাহাদিগকে কিছুমাত্র ধান কর্জ্জ স্বরূপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলাম না, সুতরাং আমার পূর্ব্বকার সমস্ত পাওনা ডুবিয়া গেল, তাহার কিছুমাত্র আদায় করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহাদিগের নিকট চাউলের টাকা পাওনা ছিল তাহাদিগের নিকট হইতেও টাকা আদায় করিতে পাবিলাম না, অথচ মহাজনের টাকা ক্রমে প্রদান করিয়া তাহাদিগের পাওনা ক্রমে কমাইতে লাগিলাম।

॥ ৪৪ ॥

বাল্যকাল হইতেই আমার গোঁয়ার্ত্তুমি বুদ্ধি ছিল, অনেক কার্য্য গোঁয়ার্ত্তুমির উপর নির্ভর করিয়া সমাপন করিতাম। বাল্যকালে যে সকল গোঁয়ার্ত্তুমির কার্য্য আমা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার একটু সামান্য পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহার পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান না করিয়া এক দিবসের একটি অতি সামান্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে প্রদান করিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে।

যে সময় আমি কারবার উপলক্ষে বাটিতে ছিলাম সেই সময় গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের ভয়ানক উপদ্রব হয়। সময় সময় সে নিকটবর্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইত তাহাকেই দংশন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ৩/৪ দিবসের মধ্যে ৮/১০ টি লোক ঐ ক্ষিপ্ত শৃগাল কর্ত্তৃক দংশিত হয়, তাহার মধ্যে ৪/৫ জন লোক দুই তিন দিবসের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকজন ১০/১৫ দিবস পরে মরিয়া যায়।

গ্রামের লোকগণ এইরূপে দুই তিন দিবস দংশিত হইবার পরই গ্রামের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরূপে ঐ শৃগালটি হত্যা করা যাইতে পারে তাহারই নানারূপ পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহই সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, ঐ শৃগালটিকে হত্যা

করিবার মানসে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলে যদি তিনি তাহা কর্তৃক দংশিত হন তাহা হইলে তাহাকেও ইহজগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যখন দেখিলাম কেহই এই কার্য্যে অগ্রবর্তী হইল না, তখন আমি সকলকে কহিলাম যদি আপনারা সকলেই এইরূপে ভীত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে একে একে সকলকেই ঐ শৃগালের দংশনে মরিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা একজনের প্রাণ দিয়াই যদি এই বিপদ হইতে গ্রামের সমস্ত লোক উদ্ধার পায় তাহা হইলে আমি অগ্রে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন। এই বলিয়া আমি সর্বাগ্রে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার নিকট অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না, থাকিবার মধ্যে আমার নিকট সেই সময় ছিল একটি ছাতি ও একগাছি পিচের মোটা লাঠি। তাহাই লইয়া আমি সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে ঐ রূপে অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই সময় সেই স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার সহিত অনুগমন কবিল। উহার মধ্যে ১২/১৪ হইতে ১৮/২০ বৎসরের বালকের সংখ্যাই অধিক, প্রাচীন লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

গোপীনাথ কোটাল নামক এক ব্যক্তি আমাদিগের বাটিতে ঠিকা কাজ করিত। সে গ্রামের চৌকিদার ছিল ও আমাদিগের বাটিতে সে রাত্রে পাহারা দিত, ও শুইয়া থাকিত। জাতিতে নিতান্ত ছোট হইলেও সে সদা সর্ব্বদা ভদ্রলোকের সংস্রবে থাকিয়াই দিন অতিবাহিত করিত। গ্রামের মধ্যে নাচ গাওনা যাত্রা, বারোয়ারি প্রভৃতি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে সে প্রাণপণে সেই সকল বিষয়ে সাহায্য করিত, ইহা তাহার স্বভাব ছিল।

আমাকে জঙ্গলের ভিতর ঐরূপে অবস্থায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাইবার সময় এক স্থান হইতে প্রায় ৮ হস্ত লম্বা একখানি বাঁশ সংগ্রহ করিয়া লইল, ও উহা হস্তে সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

আমাদিগের বাটির পশ্চিমদিকে একটি জঙ্গল আছে, ঐ স্থানের কোন স্থান নিবিড় জঙ্গল কোন স্থান বাঁশ ঝাড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্যে সামান্য সামান্য আগাছা আছে, ঐ জঙ্গল, চালিতা তলার জঙ্গল নামে পরিচিত।

আমরা যখন সেই ক্ষিপ্ত শৃগালের অন্বেষনে বহির্গত হইলাম সেই সময় এক ব্যক্তি কহিল অতি সামান্য ক্ষণ পুর্বে সে সেই ক্ষিপ্ত শৃগালকে চালিতা তলার জঙ্গলের ভিতর

প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। সে সেইস্থান দিয়া আসিবার কালীন শৃগালটি ঐ জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সে পূর্ব্ব হইতেই তাহা দেখিতে পাইয়া নিকটবর্তী একটি বৃক্ষে আরোহণ করায় সে আর উহাকে দংশন করিতে না, পারিয়া পুনরায় ঐ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

এই লোকটির নিকট হইতে এই বিষয় অবগত হইতে পারিয়া আমরা সকলে সেই চালিতা তলাব জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেই জঙ্গলের ভিতর কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এইরপ্তপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলেই সেই জঙ্গলের ভিতর দূরে দূরে হইয়া পড়িল, পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলাম না।

সেই সময় কোথা হইতে সেই শৃগালটি হঠাৎ বহির্গত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি দ্রুতগতি ছাতাটি খুলিয়া বাম হস্তে গ্রহণ করিলাম ও উহা দ্বারা তাহার গতিরোধ করিতে লাগিলাম। সে আমার চতুর্দিকে ঘুরিয়া কোনরপ্তপে আমায় দংশন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও ঐ ছাতি দ্বারা কোনরপ্তপে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলাম, ও সুযোগমতো আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত সেই পিচের লাঠি দ্বারা মধ্যে মধ্যে তাহাকে মারিতে লাগিলাম ও চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার প্রহারে তাহার কিছুই হইল না, আমার ছাতি কাপড় একেবারে শতধাচ্ছিন্ন হইয়া গেল, মনে করিলাম ইহার হস্ত হইতে কোন রপ্তপেই জীবন রক্ষা করিতে পারিব না, বা উহাকেও সমন সদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া উহাকে মারিবার নিমিত্ত যখন শেষ চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময় কোথা হইতে গোপীনাথ তাহার সেই বংশদন্ড সহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও নিমেষ মধ্যে ঐ ক্ষিপ্ত শৃগালকে এমন এক বংশাঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই সে সেই স্থানে পতিত হইল, দ্বিতীয় আঘাতে সে সেই স্থানে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। আমিই তাহার হস্ত হইতে যে কেবল রক্ষা পাইলাম তাহা নহে, গ্রামের অনেক লোকেই সেই বিপদ হইতে [য] উত্তীর্ণ হইলেন।

॥ ৪৫ ॥

আমাদিগের গ্রামে সময় সময় যে অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হইয়া থাকে এ কথা আমি ইতিপূর্বে পাঠক গণকে বলিয়াছি। ঐ ক্ষিপ্ত শৃগাল হত্যার কিয়ৎ দিবস পরেই গ্রামে

পুনরায় অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় হয়, কয়েকটি ব্যাঘ্র সেই সময় গ্রামের মধ্যে ভয়ানক উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। গ্রাম হইতে রাত্রিকালে গোরু, বাছুর ছাগল ভেড়া ও সুযোগমত মনুষ্যগণকেও ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময় [য] আমারও দুইটি গরু ব্যাঘ্র কর্তৃক হত হয়। আমার পূর্বপুরুষদিগের মত ক্ষমতা আমার ছিল না যে আমি ঐ ব্যাঘ্র ধরিয়া আনিতে পারি, সুতরাং ঐ সকল ব্যাঘ্রদিগকে হত্যা করিবার একটি উপায় আমাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। নবীনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যাঘ্র ধরিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্মিত একটি খাঁচা প্রস্তুত করি। উহা দৈর্ঘে দশ ফিট, প্রস্থে ৪ ফিট, ও উর্দ্ধে ৫ ফিট। উহার চতুষ্পার্শে খুব মজবুত রেলিং দেওয়া হয়, উপর ও নিচে খুব মজবুত তক্তার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। ঐ খাঁচার মধ্যে একদিকে একটি ভেড়া বা ছাগল থাকিতে পারে, এরূপ একটি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে অংশে ছাগল বা ভেড়া রক্ষিত হইবে, তাহার চতুর্দিকের রেল সকল এরূপ ঘনভাবে বসান হয় যে, যাহাতে সেই স্থানে ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ রেলের ভিতর দিয়া তাহার হস্ত প্রবেশ করাইয়া ঐ ছাগল বা ভেড়াকে কোনরূপে হত্যা করিতে না পারে। উহার পর যে তক্তার ছাদ থাকে, তাহাতে এরূপ একটি দরজা রাখা হয় যে, তাহাব ভিতর দিয়া ঐ ছাগল বা ভেড়া উহার ভিতর অনায়াসে রাখা যাইতে পারে বা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঐ খাঁচার অপর প্রান্তে একটি দরজা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, উহার ভিতর দিয়া ব্যাঘ্র অনাযাসে ঐ খাঁচার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ঐ খাঁচার যে অংশ রেল দ্বারা বিভাজিত করিয়া ছাগল বা ভেড়ার থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল, ঐ রেলের গাত্রে যেদিকে বাঘ থাকিবার স্থান হইয়াছে, সেই দিকে ছেঁড়া জালের অংশ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখা হয়। ব্যাঘ্র প্রবেশ করিবার দরজাটি উঠাইয়া তাহাতে সংলগ্ন একগাছি দড়ি ঐ জালের সহিত এরূপভাবে আটকাইয়া রাখা হয় যে, ঐ জাল ধরিলে বা উহাতে সামান্য রূপ হাতের জোর পড়িলেই ঐ দড়ি ঐ জাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ও সেইসঙ্গে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিবার দরজাও পতিত হয়।

এইরূপভাবে খাঁচাটি প্রস্তুত হইলে ছাগল থাকিবার ঘরের ভিতর একটি ছাগল রাখিয়া উহার দরজা উপর হইতে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ব্যাঘ্র প্রবেশের দরজা উঠাইয়া দিয়া, তাহার সংলগ্ন দড়ি ঐ জালের সহিত পূর্ব্বকথিত রূপে সংলগ্ন করিয়া ঐ খাঁচা আমাদিগের সংলগ্ন একটি স্থানে পাতিয়া রাখিলাম। রাত্রিকালে ঐ ব্যাঘ্র, ছাগলের গন্ধ পাইয়াই হউক, অথবা তাহার চিৎকার শুনিয়াই হউক, সেই স্থানে আগমন পূর্বক ঐ খাঁচার ভিতর হস্ত ঢুকাইয়া উহাকে ধরিতে চেষ্টা

করিল। কিন্তু কোন রূপে উহার ভিতর হস্ত ঢুকাইতে না পারিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিল ও প্রবেশের পথ দেখিতে পাইয়াই উহার ভিতর দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক যেমন ছাগলের দিকে গিয়া পুনরায় সেই ঘরের ভিতর হইতে ছাগল ধরিবার চেষ্টা করিল, অমনি ঐ জালে তাহার হস্ত বা পদের আঘাত লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ খাঁচার কপাট পড়িয়া গেল, ব্যাঘ্রও সেই খাঁচায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। গোপীনাথ দূর হইতে উহা দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক যে ছাগলের লোভে ব্যাঘ্র সেই খাঁচার ভিতর আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার নিকট আগমন করিল, ও উপরের কপাট খুলিয়া সেই ছাগলকে সেই খাঁচা হইতে বাহির করিয়া লইল, ও ব্যাঘ্র পড়িয়াছে ব্যাঘ্র পড়িয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া আমরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এইরূপ উপায়ে সর্ব্ব প্রথম একটি ব্র্যাঘ্র আমাদিগের বাটির নিকট সেই খাঁচায় আবদ্ধ করি ও পরিশেষে গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। ইহার পর অপরাপর স্থানে ঐ খাঁচা বাখিয়া ক্রমে ক্রমে চারি পাঁচটি ব্র্যাঘ্র ধৃত করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। ক্রমে গ্রাম বা নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ একেবারে ব্যাঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল।

॥ ৪৬ ॥

কারবার উপলক্ষ করিয়া ক্রমে তিন বৎসর কাল কোন রূপে অতিবাহিত করিলাম। লোকের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করিতে পারিলাম তাহা মহাজনদিগকে দিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের দেনা কমাইতে লাগিলাম। পরিশেষে তিন সহস্র মুদ্রা আর কোন রূপেই সেই সময় দিয়া উঠিতে পারিলাম না, পূর্ব্ব কথিত কাপড়ের মহাজন যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, অপরাপর মহাজন সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহাদিগের নিকট যে টাকা বাকী ছিল তাহার কিস্তি বন্দি করিয়া লইলাম কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে একটি পয়সাও প্রদান করিতে পারিলাম না।

যে সামান্য পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি ও ভদ্রাসন বাটি ছিল ও আমি যাহা কিছু সামান্য বিষয় খরিদ করিয়াছিলাম ও নিজ হস্তে যে একটি বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা বিক্রয় করিয়া দিলে আমার সমস্ত দেনা পরিশোধ না হইলেও অনেক কমিয়া যাইত সত্য কিন্তু তাহার একটুও আমি নষ্ট করিলাম না। সুতরাং মহাজনের দেনাও পরিশোধ হইল না। কিন্তু পরিশেষে চাকরী করিয়া সেই সমস্ত দেনা আমি পরিশোধ

করিয়া দিয়াছিলাম, নিজের উপর যতদূর কষ্টসাধ্য হইতে পারে সেই কষ্ট সহ্য করিয়া, এমনকি কেবল এক সন্ধ্যা মাত্র আহার করিয়া করিয়া ক্রমে আট দশ বৎসরে আমি সেই দেনা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলাম। পিতার মৃত্যুর তিন বৎসরের পরে আমার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল সেই সময় আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। পুত্র জন্মগ্রহনে মনে অতিশয় আনন্দ হইল সত্য কিন্তু অর্থাভাবে মনের কোন সাধই সেই সময় মিটাইতে পারিলাম না, এমন কি সেই সময় স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সময় গ্রামের স্কুলে পড়িতেছিলেন, পিতার সেই বৃদ্ধা পিসির একমাত্র ভরসার স্থল আমিই ছিলাম, কোন গতিকে তাঁহার সেই খরচ চলিতে লাগিল সত্য কিন্তু তাহাও বিশেষ কষ্টের সহিত। আমার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি ছিল এক একখানি করিয়া ক্রমে তাহার প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়া গেল। আমি কষ্টের নিতান্ত চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যাহারা নিতান্ত আত্মীয বা যাহাদিগের ভরসায় ঐ গ্রামে পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিয়া গিয়াছেন ও আমবাও যাহাদিগের ভরসার উপর নির্ভর করিয়া ঐ গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলাম, এইসময় তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন রপ্তপ সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক. তাঁহাদিগের নিকট আমার যে সকল টাকা পাওনা ছিল তাহার একটি দিয়াও সেই সময় কেহ আমাকে সাহায্য করিলেন না।

এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম ঐরপ্তপ অবস্থায় আর কিছু দিবস যদি ঐ স্থানে থাকি তাহা হইলে স্বপরিবারে অনশনে সেই স্থানে মরিতে হইবে। মনে মনে এইরপ্তপ ভাবিয়া আমার স্ত্রীকে তাহার পিতৃ আলয়ে পাঠাইয়া দিলাম, তাঁহার পিতা বর্তমান না থাকিলেও তাঁহার তিনটি ভ্রাতা সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন ও তিনজনেই উপায়ক্ষম ছিলেন, তাঁহারা আদরে তাঁহাদিগের ভগ্নী ও ভাগীনেয়র সমস্ত ভার গ্রহন করিলেন। শ্রীমান প্রমথনাথ সেই স্থানেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

স্ত্রী পুত্রকে সেই স্থান হইতে পাঠাইয়া দিবার ২।১ দিবস পরে যখন আহার করিতে বসিলাম সেই সময় পিতার সেই বৃদ্ধা পিসি আমাকে কহিলেন, এ বেলা কোন গতিকে অন্নের সংস্থান হইয়াছে, কিন্তু রাত্রিবেলা আর কোন উপায় নাই। ঘরে মুষ্টিমাত্রও ধান্য বা চাউল নাই, যাহা হইতে রাত্রির আহারের সংস্থান হইতে পারে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হইল না কেবলমাত্র চক্ষু দিয়া দুই চারি বিন্দু জল পতিত হইল।

যাহাদিগের নিকট আমার ধান্য পাওনা ছিল, শুনিলাম তাহাদিগের একজন কিছু ধান্য সংগ্রহ করিয়াছে, আহারান্তে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম। সে সেই সময় বাটিতে ছিল না, তাহার অপেক্ষায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম। রাত্রি দশটার সময় সে বাটিতে আগমন করিলে আমি আমার দুঃখের কথা তাহাকে কহিলাম ও তাহার বিবেচনায় সেই সময় যাহা ভাল হয় তাহাই তাহাকে কহিলাম সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাকে সামান্য কিছু ধান্য এই নিয়মে দিতে স্বীকার করিল যে তাহার নিকট আমার যে পরিমিত ধান্য পাওনা আছে, ইহা লইয়াই তাহা পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম আমার নিকট তাহার যে পরিমিত ধান্য দেনা আছে, তাহার মধ্যে যে পরিমিত ধান্য সে আমাকে প্রদান করিতে চাহিতেছে তাহা পাওনা ধান্যের একশত ভাগের একভাগ। সেই সময় আমার অপর আর কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তাহার সেই প্রস্তাবেই আমাকে সম্মত হইতে হইল। ঐ সামান্য ধান্য লইয়া আমার সমস্ত পাওনা ধান্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহাতেও আমি সেই সময় তাহা কর্ত্তৃক বিশেষ রূপ উপকৃত হইলাম মনে হইল।

এইরূপ উপায়ে যে ধান্য সংগ্রহ হইল তাহা আমি বাটিতে লইয়া আসিলাম। দেখিলাম উহাতে ভ্রাতার ও সেই বৃদ্ধার একমাস কাল অনায়াসেই চলিতে পারিবে। অধিক রাত্রিতে ঐ ধান্য সংগ্রহ হওয়ায় রাত্রিকালে আর আমাদিগের দুই ভাইয়ের আহার হইল না, অনশনেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিবস অতি প্রত্যুষ হইতেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ধান্য রৌদ্র না পাইলে তাহা হইতে চাউল্ প্রস্তুত করা যাইতে পারে না, সুতরাং ঘরে ধান্য থাকিলেও যে সেই দিবস আহার হইবে তাহা মনে হইল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া ভিজিতে ভিজিতে আমি নবীনবাবুর নিকট গমন করিলাম। রাত্রিকালে যে অনশনে কাটাইতে হইয়াছে তাহা কিন্তু তাহাকে কহিলাম না। আমার স্বভাবই সেইরূপ ছিল না, অনশনে মরিতে হইলেও যাহার নিকট আমার পাওনা থাকিত তাহার নিকট কখনও কোন বিষয় যাচ্ঞা করিতাম না। নবীনবাবুকে কেবল এইমাত্র বলিলাম যে, এরূপ অবস্থায় বাটিতে বসিয়া থাকিয়া অনশনে মরি কেন, ইচ্ছা করিয়াছি আজই আমি স্থানান্তরে গমন করিব ও কোনরূপ কর্ম্মকার্য্যের যোগাড় করিয়া লইতে পার, তাহা হইলেই কোন গতিকে আমার [য] সামান্য প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইব। এরূপভাবে বসিয়া বসিয়া আর সময় অতিবাহিত করিব না। আমি ইতিপূর্ব্বে দুই একবার কলিকাতায় গিয়াছি, দেখিয়াছি পরিশ্রম করিতে পারিলে সেই স্থানে অনায়াসেই লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। আমি এখন

যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারি, এই নিমিত্ত ভাবতেছি কলিকাতায গমন করিয়া কোন সামান্য কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও আমি আমার এই সামান্য পরিবার প্রতিপালন করিব। আমার কথা শুনিয়া নবীনবাবু কহিলেন, "কলিকাতা যে একটি উপার্জনের স্থান সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই স্থানে যাহার থাকিবার উপায় নাই তাহার পক্ষে সেই স্থান অতি কষ্টকর। কলিকাতায় গিয়া যদি থাকিবার কোন স্থান ঠিক করিতে পার তাহা হইলে, যে কোন উপায়েই কিছু না কিছু উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি থাকিবার স্থানের কোনরূপ স্থির করিতে না পার তাহা হইলে সেই স্থানে তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না, ইহা মনে জানিয়া যে রূপ ভাল বিবেচনা হয় কর।"

তাঁহার কথার উত্তরে এইমাত্র কহিলাম "এইস্থানে থাকিয়া অনশনে মৃত্যু অপেক্ষা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, কিন্তু আপনি এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, কলিকাতায় যাইবার খরচ যাহা [য] তাহা আমাকে হাওলাত স্বরূপ দিবেন [য] দেখিবেন ভ্রাতা ও পিতার বৃদ্ধা পিসি যেন অনশনে মারা না পড়েন। আমি যে রূপে পারি পরিশেষে আপনার দেনা পরিশোধ করিয়া দিব"। নবীনবাবু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত আমাকে এক টাকা চারি আনা হাওলাত স্বরূপ প্রদান করিলেন।

ঐ অর্থ লইয়া আমি আমার বাটিতে আসিলাম। দেখিলাম পিতার সেই বৃদ্ধা পিসি আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন। গত রাত্রিতে আমি যে ধান্য আনিয়াছিলাম, রৌদ্র না হওয়ায় তাহার কিছু ধান্য অগ্নিতে গরম করিয়া লইয়া তাহা হইতে কোন প্রকাবে কিছু চাউল বাহির করিয়া লইয়াছেন ও ঐ চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় যেরূপ আহার করিতে পারা যায় তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। সে যাহা হউক কিছু আহার করিয়া সেই বৃদ্ধার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটি হইতে বহির্গত হইলাম।

॥ ৪৭ ॥

আমাদিগের বাটি হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন এক মাইলের উপর, আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কলিকাতায় যাইবার নিমিত্ত সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর একখানি টিকিট এক টাকা সাড়ে তিন আনা দিয়া খরিদ করিলাম। এখন রেলের ভাড়া কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সময় ঐ ভাড়া ছিল। টিকিট খরিদ করিবার পর আমার সম্বল রহিল অর্দ্ধ আনা, ঐ অর্দ্ধ আনা সম্বল লইয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাদিগের গ্রামের তিন চারিজন বালক সেই সময় কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শ্রীনাথ দাসের লেনে ছাত্রদিগের একটি মেস ছিল, তাঁহারা সেই স্থানই থাকিতেন, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। কলিকাতায় অপর কোন স্থানে আমার থাকিবার স্থান না থাকায় আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ছাত্রগণ আমাকে সেই স্থানে থাকিবার স্থান দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে মাস শেষ হইয়া গেলে আমি আমার খরচের টাকা প্রদান করিব।

আমি সন্ধ্যার পর কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, রাত্রিকালে সেই স্থানে অবস্থিত করিবার সময় জানিতে পাবিলাম একটি ভদ্রলোক আমার ন্যায় নিতান্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়া কোন একটি কারবার মানসে সামান্য কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন ও ঐ বাসাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ক্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম তিনি একটি কন্ট্রাক্টরের যোগাড় করিয়াছেন। জাহাজে যে সকল কয়লা বোঝাই হয় সেই সকল কয়লা কুলি দ্বারা বোঝাই করিয়া দিবাব কয়েকটি অফিস আছে তাহারই একটি অফিসে তিনি এইরূপ যোগাড় করিয়াছেন যে কোন কোন জাহাজে তিনি কয়লা বোঝাই করিয়া দিবেন, সমস্ত দিবস যে কার্য্য হইবে। পরদিবস প্রত্যুষেই তিনি ঐকার্য্যে গমন করিবেন। কুলিদিগের সহিত না থাকিলে কুলিরা কার্য্যে ফাঁকি দিবে অথচ তিনি সদা সর্বদা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সেই অফিসেও গমন করিতে হইবে। এই নিমিত্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে এইরূপ আর একটি লোকের অনুসন্ধান তিনি করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সহিত সেই কার্য্যে আপাততঃ আমাকে প্রবৃত্ত হইতে কহিলেন। আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরদিবস অতি প্রত্যুষ হইতে সেই কার্য্যে বাহির হইলাম। যাহার কার্য্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার একটি লোক আসিয়া একখানি জাহাজ ও একখানি কয়লার বোট দেখাইয়া দিল। ঐ লোক কয়েকখানি লোহার হাতা ও কয়েকটি ঝুড়িও দিয়া গেল, ও আবশ্যক অনুযায়ী কুলিরও বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যে স্থানে ঐরূপ কার্য্য হইয়া থাকে সেই সকল স্থানে গঙ্গার ধারে নগদ পয়সা দিলে যথেষ্ট কুলি পাওয়া যায়। সমস্ত দিবস অনাহারে সেই সকল কুলিদিগের দ্বারা বোট হইতে জাহাজের কয়লা উঠাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য নিজের অবস্থারও কুলিদিগের অপেক্ষা কিছু প্রভেদ রহিল না। কয়লার ধূলায় ও কলিতে সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইয়া গেলে,

কুলিদিগের দাম মিটাইয়া দেওয়া হইল। প্রথম দিবসেই তাঁহার প্রায় পঁচিশ টাকা বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর স্থান করিয়া আমরা উভয়েই বাসায় আসিলাম, পরদিবস তিনি অফিস হইতে টাকা পাইলেন না, কিন্তু সেই দিবসও কার্য্য করিতে হইল। অবশিষ্ট পঁচিশ টাকা কুলিদিগকে দিতে হইল, তৃতীয় দিবস কার্য্য করিবার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহার যাহা কিছু ছিল দুই দিবসেই তাহার সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় দিবসও সেই অফিস হইতে টাকা পাওয়া গেল না, ইহার পর অনবরত ৭ দিবস কাল তিনি হাঁটিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহার টাকা আদায় করিতে পারিলেন না। সুতরাং আমিও এক পয়সা পাইলাম না। অবশেষে এক পয়সা পাইলাম না। অবশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম, তিনি যাহার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে জুয়াচোর, বাজারে তাহার অতিশয় বদনাম। সে নিজে জাহাজের কন্ট্রাক্টর নহে। অপর আর একজন কন্ট্রাক্টরের কার্য্য করে। এইরূপে পরের টাকায় কার্য্য করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ৫ টাকা বাহির করিয়া লয়, কিন্তু আসল যে টাকা দিয়া কার্য্য করিল তাহাকে একটি পয়সাও প্রদান করিল না। ভদ্রলোকটি এইরূপে কয়েকটি টাকা লোকসান দিয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন, আমি অপর কোন পন্থা অবলম্বন করিব তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৪-১৮৯৮)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মালখানগর গ্রামে জন্ম হয় গিরিশচন্দ্রের। গিরিশচন্দ্রের জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। 'জন্মভূমি' পত্রিকার মতে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে। অন্যদিকে শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, আদিনাথ সেন বা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে তাঁর জন্ম সন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ। গিরিশচন্দ্র ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। কলেজে পড়বার সময়েই তিনি ইংরেজি ও বাংলায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' (১৮৪৬) পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রধান লেখক, সম্ভবত পত্রিকা প্রকাশেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। প্রবীণ বয়সে গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মজীবনের স্মৃতিকথা লেখেন। 'সেকালের দারোগার কাহিনী' অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়, শ্রাবণ ১২৯৩ থেকে শ্রাবণ ১২৯৪ পর্যন্ত। পরে রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৮৮৮ সালে। বাংলাদেশের কুখ্যাত নীল চাষ পর্বে তিনি ছিলেন সরকারি পুলিশ বিভাগের দারোগা। নীল কমিশনে নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্যও দেন। কারো কারো মতে সেজন্য তাঁর চাকরি যায়। আবার অন্যদের কথায়, শারীরিক কারণে তিনি দারোগার কর্ম পরিত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর শেষজীবন কাটান মালখানগর গ্রামে। নিজের গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সেখানে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর অবদান ছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ভূমিকা

লোকে বলে যে 'ঘড়িকে ঘোড়া ছুটে''। সত্য সত্যই গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যো তাহাই বঙ্গদেশের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মে বিশ্বাস, বাণিজ্য, বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ত্ত-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রকবণ প্রভৃতি সমস্তই প্রলোড়িত হইযাছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় ''পবিবর্ত্তন'' তাহার হস্ত বিস্তাব করিয়া ''স্থায়িত্বকে ' বিনাশ করত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিতেছে। বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় জলযান, বিদ্যুৎসাব, ''দূব'' শব্দকে লোপ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ও ভ্রমণের কষ্ট ও বিঘ্ন বিনাশ কবিযাছে; পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচাবে জনসমূহের জ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে, উন্নত শাসন-প্রণালী ব্যবহারে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ফলে আমাদের জন্মভূমি ক্রমশঃ কিন্তু দ্রুতবেগে সমগ্ররূপে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব পঞ্চাশ বৎসরের সময়ের অবস্থার বর্ণনা শুনিলে, তাহা অবিশ্বাস-যোগ্য অত্যুক্তি বলিয়া লোকের বিবেচনা করা বড় বিচিত্র হইবে না। কত বিষয়ে এইক্ষণ আমাদের সুবিধা হইয়াছে, কত নূতন দ্রব্য আমাদের সুলভ-প্রাপ্য হইয়াছে— তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। দুইটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। পূর্ব্বে বাড়ীর বিধবাদিগের কোন্ দিবস একাদশীর উপবাস হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত গ্রামান্তরে টোলের ভট্টাচার্য্য ঠাকুরে নিকট গমন না করিলে উপায় ছিল না। কিন্তু এইক্ষণ চারি পয়সার একখানা বটতলার ছাপার পঞ্জিকা গৃহে রাখিলে বালক বালিকারাও তাহা বলিতে পারে। রাত্রিকালে টিকা কিম্বা প্রদীপ জ্বালিবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ যাবৎ ঠক্ ঠক্ করিয়া শোলায় চকমকি ঠুকিতে হয় না,এক পয়সার এক বাক্স বিলাতি দিয়াশলাই কিনিয়া রাখিলেই এই মাসের অভাব পূরণ হয়। এই প্রকার শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, কিন্তু তাহা করিয়া এক প্রবন্ধের কায়া-বৃদ্ধি করার আবশ্যক নাই। যে বিষয় বর্ণনা

করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমার প্রস্তাবের প্রচুর পোষকতা হইবে।

তবে, আর এক কথা এই যে আমাদের দেশে ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। পূর্ব্বকালের কথা দূরে যাউক, আমাদের মধ্যে জীবিত বৃদ্ধ লোকের প্রথম কিম্বা মধ্য বয়সে দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, ভবিষ্যতে তাহারও ঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া দুর্ল্লভ হইবে। ইংরাজের অধীনে দেশীয় কত শত বিদ্বান বুদ্ধিমান শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় বিভাগে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু কেহই বঙ্গভাষায় তাঁহার বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক কিম্বা আহ্লাদের কার্য্য বিবেচনা করেন নাই। আজকাল কতজন কত রূপক,কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবীকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনা কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকদিগের সাহায্যের উদ্দেশ্যে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তিকলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব্ব পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমি যে কালের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সকল জেলাতে ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যদিও ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় রঘুনাথ, বৈদ্যনাথ কিম্বা বিশ্বনাথ প্রভৃতি দস্যুগণ যেরূপ অকুতোভয় গৃহস্বামীকে পূর্ব্বে সংবাদ পাঠাইয়া ডাকাইতি করিত, এই সময়ে সেই প্রথার অনেক লাঘব হইয়াছিল, তথাপি ডাকাইতি ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল এবং কখন কখনও অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস ঘটনা সহকারে তাহা নির্ব্বাহিত হইত। চৌর্য্যভয়ে ধনপ্রবাদ— ছিল বিষম প্রমাদ। সমস্ত জীবনে বহু কষ্টে যে ধন উপার্জ্জিত হইত তাহা এক রাত্রিতে অপহৃত হইত, কিন্তু কেবল ধন লইয়া টানাটানি হইত, এমন নহে, কর্ত্তার এবং পুরজন সকলেরই প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কা ছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া হাড়ভাঙ্গা মুষ্ট্যাঘাত এবং পদাঘাত করিয়া যদি দুরাত্মারা ক্ষান্ত থাকিত তাহা হইলেও যাহা হউক, কিন্তু অল্প ধনে যেমন তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইত না, তেমন গৃহবাসীদিগকে অল্প প্রহার করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইত না। আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া ধন না পাইলে অস্ত্রাঘাত এবং মশাল দিয়া শরীর দগ্ধ করাও তাহাদের অসাধরাণ প্রথা ছিল না, এবং এইরূপ গুরুতর এবং নিষ্ঠুর প্রহারের ফল যে কি হইত, তাহা সকলেই

বুঝিতে পারেন। নিষ্ঠুরাচরণ সম্বন্ধে ডাকাইতরা বালক বৃদ্ধ বণিতার বিচার করিত না। অন্তঃকরণে দয়ার কবাট দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া তাহারা ডাকাইতি করিতে যাত্রা করিত। তাহাদের ভয়ে স্ত্রীলোক নাসিকায় নত এবং কর্ণে ঝুমকা কিম্বা অন্যপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া রাত্রিতে শয়ন করিত না; কারণ ডাকাইতের হস্তে ধরা পড়িলে দুরাত্মারা তাহাদিগকে অলঙ্কার খুলিবার অবকাশ না দিয়া, সজোরে টানিয়া মাংস ছেদন করত তাহা আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। আমি এইরূপ ছিন্ন-নাসিকা-কর্ণ-বিশিষ্টি দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি। আমার সহিত তাঁহাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহারা উভয়ই বৃদ্ধা ছিলেন, শুনিলাম যে তাঁহাদের যৌবনকালে এই ঘটনা হইয়াছিল।

ডাকাইতি যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল, তাহা তোমাদের এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হওয়া কঠিন। ডাকাইত পড়িয়াছে শুনিলে আক্রান্ত গৃহের লোকের ত কথাই নাই, গ্রামস্থ সর্ব্বলোকের বর্ণনাতিরিক্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত। বিত্তশালী যাবতীয় মনুষ্য পরিবারদিগকে সঙ্গে করিয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করত বনের মধ্যে এবং দুর্গম স্থানে যাইয়া লুকাইত। "যাউক ধন, থাকুক প্রাণ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রাণ রক্ষা পায়, কেবল তাহারই চেষ্টা করিত। ধন কিম্বা গৃহের দ্রব্য সমস্তের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করিত না। আমি শুনিয়াছি, যে এক গ্রামে এক বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া পৌষ মাসের রাত্রিতে রব উঠিলে পর, প্রতিবাসী আর একজন ধনী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী যুবতী কন্যা ও একটি শিশু বালককে কোলে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত গ্রামের প্রান্তে একটা শৈবালপূর্ণ পুষ্করিণীর জলে প্রবেশ করিল এবং যে পর্য্যন্ত গ্রাম নীরব না হইল, সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলে গলা জলে কেবল মাথা জাগাইয়া দুরন্ত শীত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রায় দুই ঘন্টা কাল অতিবাহিত করিল।

কেবল গ্রামবাসীদিগের ভীরু স্বভাববশতঃ ডাকাইতরা অনায়াসে তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। যে যে স্থানে গ্রামের লোকেরা একত্রিত হইয়া দস্যুদিগকে প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত, সেই সেই স্থানে অধিবাসীরা জয়লাভ করিত। চোর ও সাধুতে অনেক প্রভেদ। অতএব সাধুরা অল্পমাত্র সাহস দেখাইতে পারিলেই চোরে পলাইতে পথ পায় না। ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উলা গ্রাম।

বঙ্গদেশে উলার নাম কে না জানেন এবং উলার বারোয়ারি পূজার কথা কে না শুনিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম স্থিত, এবং কৃষ্ণনগর জেলার নিজ কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রাণাঘাটের ন্যায় উলাও একটি বৃহৎ জনপদ। ইহাতে বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধনী ও সম্পত্তিশালী।

বিশেষতঃ বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের ঘর, দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের এবং মুস্তৌফিদিগের ঘর খুব প্রসিদ্ধ। বামনদাস বাবু বড় জমিদার, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরাও বিত্তশালী; বিশেষতঃ ইঁহারা বড় বলবান এবং ব্যায়াম-বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে খ্যাতনামা বলবান রাধা গোয়ালা, দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের অন্ন খাইয়া এবং তাহাদিগের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়াছিলাম। মুস্তৌফি মহাশয়েরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মধ্যে মিত্রবংশোদ্ভব এবং অত্যন্ত মানী এবং সম্পত্তিশালী; এবং ঐ শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কুলীনও ছিলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে যে তাঁহারা কোন সময়ে মাধব বসু নামক একজন কায়স্থ-কুলের ঘটকের মাথা মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই আক্রোশে ঘটক মহাশয় প্রতিশোধ লইবাব মানসে কুলজী পুথিতে নিম্ন কবিতা ছন্দ লিখিয়া তাঁহাদের কুলে খোঁটা দিয়াছেন—

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল।
তবু না হ'বে মুস্তৌফির কুল।।

আমি দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নহি, অতএব ঠিক বলিতে পারি না যে মুস্তৌফি মহাশয়েরা এখনও কুলীন বলিয়া পরিগণিত কি না। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি লিখিলাম।

উলা একটি বিলক্ষণ গণ্ডগ্রাম এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে পরিপূর্ণ। মহামারীর পূর্ব্বে আমি একদিন অধিক রাত্রিতে কাঁটা-আড়ির ঘাট হইতে বামনদাস বাবুর বাড়ী যাইতে পথিমধ্যে বহু লোক দেখিয়াছিলাম এবং রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থিত বাড়ীতে গীত-বাদ্য শুনিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরে দিবসে সেই পথ দিয়া যাইতে—হায়! কি শোচনীয় দৃশ্য দেখিলাম! পথে লোক নাই, গৃহ সমস্ত জনশূন্য, রবের মধ্যে কেবল এক স্থানে এক দল শৃগালের চীৎকার শুনিলাম।

বামনদাস বাবুর এক পূর্ব্বপুরুষের সময় তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ডাকাইত কে তাহা শুনিয়াও পাঠকের বিস্ময় জন্মিবে। সে ভদ্রবংশোদ্ভব এবং কৃষ্ণনগর জেলার একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর পুত্র। বালককাল হইতে কুসংগসর্গ দোষে কুক্রিয়া সমস্তে রত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও বাড়ীঘর পরিত্যাগ করত ডাকাইতের দলভুক্ত হইয়া ডাকাইতের একজন সর্দ্দার হইয়াছিল। এই ব্যক্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বহু অস্ত্রধারী দস্যু সমভিব্যাহারে ডাকাইতি করিতে প্রবিষ্ট হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পরে উঠানে একখানা চৌকী আনাইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁহার সমুদয় নগদ টাকা প্রদান করিতে আজ্ঞা করিল। কর্ত্তা চতুরতার সহিত দোতলার শিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া এক তোড়া টাকা লইয়া বারেন্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই

স্থান হইতে এক মুষ্টি এক মুষ্টি করিয়া উঠানে তাহা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণ শান বাঁধান ছিল, অতএব উচ্চ হইতে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সকল উঠানের চতুর্দ্দিকে ছত্রাকার হইয়া পতিত হওয়াতে ডাকাইতেরা এক একটি করিয়া তাহা তুলিয়া লইতে বাধ্য হইল। কর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন সেই প্রণালীর কার্য্যে ডাকাইতদিগের অনেক সময় ক্ষয় হইবে এবং যত বিলম্ব হয়, ততই ডাকাইতদিগের অমঙ্গল ঘটিবে। ইত্যবসরে গ্রামের লোকেরা যোটবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ আক্রান্ত বাড়ীর চতুর্দ্দিকে জমা হইতে লাগিল। দশ পাঁচ জন লোক নহে, বহু অস্ত্রধারী মনুষ্য ডাকাইতদিগের চক্ষে পড়িল। বাহির ঘাঁটির পাইক এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া সর্দ্দার বাবুকে জ্ঞাপন করিল। সে তাহাদের সকলকে বাড়ীর ভিতর আসিতে আদেশ করিল। গ্রামস্থ লোকেরা সদর দরজায় এবং গৃহ হইতে বহির্গমনের সমস্ত পথে খড় ও শুষ্ক বাঁশ প্রভৃতি জ্বালনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিয়া অগ্নি জ্বালাইযা ডাকাইতদিগের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক স্থানে অনেক লোক পাহারা দিতে এবং দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। দস্যুরা অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত রাত্রি সেই প্রাঙ্গণে কাল যাপন করিল এবং সম্পূর্ণ অনুপায় দেখিয়া প্রাতে আক্রমণকারীদিগের হস্তে ধরা দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। এই অবধি উলা বীরনগর আখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও এক অসাধারণ ঘটনা হয়। আশাশুনী নামক শান্তিপুবের এক ব্যক্তি সিদ্ধ চোরের রাজা হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাটার দৌরাত্ম্যে কালনা, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, রাণাঘাট, এবং উলা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আশাশুনী কিন্তু সিন্ধ চুরি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার চৌর্য্যবৃত্তিতে রত হইত না; এবং সিন্ধ চুরিতে তাহার অসাধারণ প্রাখর্য্য ছিল। লোকের মনে এমন এক সংস্কার ছিল যে আশাশুনী কি এক মোহিনী-মন্ত্র জানিত এবং সে তদ্দারা জাগ্রত ব্যক্তিকেও অজ্ঞান করিয়া ঘরের দ্রব্যাদি অপহরণ করিত, তাহার কোন ব্যাঘাত হইত না; ফলেও সে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। ধনী মনুষ্য ভিন্ন ডাকাইতের ভয় করে না, কিন্তু সকল অবস্থার লোকেই আশাশুনীব ভয় করিত। বর্ণিত সময়ে সকল বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে বিত্ত অনুযায়ী এক কি ততোধিক প্রহরী রাখার প্রথা ছিল এবং মুস্তৌফি মহাশয়দিগের বাড়ীতেও কয়েকজন দেশী সর্দ্দার ছিল। আশাশুনীর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং সে কুক্ষণে এক রাত্রিতে চুরি করার মানসে তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তি আশাশুনী বলিয়া ব্যক্ত হওয়াতে মুস্তৌফি মহাশয়েরা তাহাকে কৃষ্ণনগর চালান করার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের

বহুকালের প্রহরীরা তৎপ্রতি প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে তাহা "আমরা কখনও করিতে দিব না। এই ব্যাটার ভয়ে আমরা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না, এবং সমস্ত দেশের লোক ইহার ভয়ে সশঙ্কিত। হাকিমের কাছে পাঠাইলে চারি কি পাঁচ বৎসর কারারুদ্ধ থাকিয়া আশাশুনী ফিরিয়া আসিবে এবং পুনরায় সকলকে জ্বালাতন করিবে, অতএব তাহাকে আমরা বিশেষ শাস্তি দিব যে সে আর কখনও চুরি না করিতে পারে। আপনারা ঘরে যাউন আমরা যাহা জানি তাহা করিব।" এই বলিয়া আশাশুনীকে মণ্ডপঘরের সম্মুখস্থিত যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া সন্ধিপূজার ছাগলের ন্যায় প্রহরীরা তাহাকে বলি দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার দেহ জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। এখন অনেকে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে পারেন কিন্তু ধীরভাবে তৎসাময়িক দেশের অবস্থা সমালোচনা করিযা দেখিলে, প্রহরীদিগের এই নৃশংস কার্য্য নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিবেন না। প্রহরীরা কেবল তাহাদের নিজ শত্রু দুর করিয়াছিল এমন নহে, সাধারণের শত্রু বিনাশ করিয়াছিল। কথিত হইতে পারে যে প্রহরীরা যেন তাহাদের ইতরবুদ্ধি অনুযায়ী ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল কিন্তু মুস্তৌফি বাড়ীর কর্ত্তাদিগের তাহাতে সম্মতি প্রদান করা উচিত হয় নাই। তাহা সত্য বটে, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে সেই শান্তি বিপ্লব সময়ে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রহরীর পরামর্শ তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও নিতান্ত সম্ভব যে প্রহবীরা আশাশুনীকে বলি দিবে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই।

উলার এই দুই ঘটনার কোন্ ঘটনা অগ্রে, কোন্ ঘটনা পরে হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানি, যে উভয় ঘটনাই দীর্ঘ কালের কথা।

ডাকাইতি হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত ধনী লোকে অধিক বেতন দিয়া সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী খোট্টা এবং দেশীয় প্রহরী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে শেযোক্ত ব্যক্তিরাই "ঘরে ঢেঁকি কুমীর" হইয়া অন্য ডাকাইতকে আহ্বান করিয়া মুনিবের গৃহ আক্রমণ করিতে দিত, এই সকল ঘটনায় গৃহস্বামীর নিস্তার থাকিত না, কারণ ইহারা গৃহের সমস্ত ছিদ্র সন্ধান অবগত হইয়া অক্লেশে এবং সুন্দররূপে অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইত।

উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ইষ্টকালয়ও ডাকাইতি নিবারণের আর এক উপায় ছিল। কাষ্ঠের কবাটে ঘন ঘন মোটা লৌহ পেরেক মারিয়া রাখার প্রথা ছিল, যে দস্যুরা কুঠারাঘাতে তাহা শিঘ্র ছেদন করিতে না পারে। দ্বিতলে উঠিতে সঙ্কীর্ণ শিঁড়ির মাথায় চাপা কবাট ফেলিয়া দৃঢ় কাষ্ঠের হুড়কা দ্বারা তাহা আবদ্ধ রাখিলে নিম্ন হইতে উপরে যাওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ থাকিত। এবং ছাদের উপরে ছোট বড় ঝামা ও ইট স্তূপ

করিয়া রাখা হইত, যে ডাকাইত পড়িলে ছাদের উপর হইতে তাহা নিক্ষেপ করিলে দস্যুদিগকে দূরীকৃত করিবার এক সহজ এবং সুন্দর উপায় হইত। পল্লীগ্রামে বোধ হয় এখনও অনেক পুরাতন বাটীতে চাপা কবাট এবং লৌহাচ্ছাদিত কবাট দেখিতে পাওয়া যায়।

নীচ জাতীয় লোক দ্বারা ডাকাইতের দল গঠিত হয়। মুসলমান, বাগদি, কাওরা, চণ্ডাল, মুচি এবং গোয়ালারা সাধারণতঃ এই অপকার্য্যে অধিক রত।

কৃষ্ণনগর জেলায় অধিকন্তু গোয়ালারাই ডাকাইতি করিত। এই জেলায় গোপ-জাতীয় বহুলোকের বাস; তন্মধ্যে "গড়ো গোয়ালারা" শরীরে গঠন, বল ও সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্ত "গোড় গোয়ালা" উপমার বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিপুরের গড় হইতে এই বংশীয় গোয়ালারা "গোড় গোয়ালা" আখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। বোধহয় পূর্ব্বকালে ঐ গড় রক্ষার্থে একদল গোয়ালাকে তাহার মধ্যে বাস করিবার স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়াতে কৃষ্ণনগর জেলার নানা স্থানে তাহারা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণ ঐ প্রদেশের এমন গ্রাম নাই যাহাতে দুই চারি ঘর গোয়ালার বাস নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদের আকার প্রকৃতি সমান রহিয়াছে। দীর্ঘচ্ছন্দ, ক্ষীণকটি, প্রশস্ত বক্ষ, শ্যামবর্ণ, ইহাই তাহাদের সাধারণ আকৃতি। ইহারা যেমন দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে, লাঠির ভর করিয়া লম্ফ দিতে পারে, এবং লাঠি খেলায় স্ফূর্তি দেখায়, বাঙ্গালীর মধ্যে তেমন অন্য কোন জাতিই পারে না, এবং এই নিমিত্ত গোয়ালারা বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা উৎকৃষ্ট লাঠিয়াল বলিয়া পরিগণিত। যেমন যশোহর জেলার মুসলমানেরা শড়কিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেইরূপ কৃষ্ণনগর জেলার গোয়ালারা লাঠিয়াল বলিয়া আদরিত ছিল। জাতীয় ব্যবসায়ে গোয়ালাদিগের অন্য জাতীয় পুরুষ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম করিতে হয়। ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য অধিকাংশই স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, পুরুষেরা কেবল একগাছা পাচন (লাঠি) হস্তে করিয়া গরু কিম্বা মহিষের পাল লইয়া মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে। সর্ব্বদা অনাবৃত নুতন নূতন স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করে, পশ্বাদির পশ্চাতে দৌড়ঝাঁপ করে এবং উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করে; এমন কি পান্তাভাতের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খায়। ইহার সকল কার্য্যই স্বাস্থ্যকর এবং বলপ্রদায়ক, কাজেই লাঠিয়ালি করিতে তাহাদের বিশিষ্ট উপযোগিতা হয়; ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন প্রচলনের পূর্ব্বে যখন জমিদার ও নীলকরদিগের সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা করার রীতি ছিল, তখন এই সকল লোকের বিস্তর আদর ছিল, সুতরাং অনেকেই অধিক বেতন এবং লুটের লোভে এই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত; এবং ব্যক্তি

বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে এক কুবৃত্তি হইতে অব্যবহিত অধম কার্য্যে অধোগমন করা বড় বিচিত্র কিম্বা কঠিন ব্যাপার ছিল না। দিবসে লাঠিয়ালি, রাত্রিতে ডাকাইতি, উভয় কার্য্যই এই সকল ব্যক্তির নিকট আদরণীয় এবং অনায়াস-সাধ্য ছিল। বিশেষতঃ আপদে বিপদে ইহারা জমিদার এবং নীলকরের নিকট বিস্তর সহায়তা পাইত। কোনও মোকদ্দমায় নামাঙ্কিত হইলে পুলিসের হস্তে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহারা প্রথমে লাঠিয়ালদিগকে স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে কিম্বা কুঠিতে আশ্রয় দিয়া গোপন করিয়া রাখিতেন, অবশেষে ধৃত হইলে কর্ম্মচারীর দ্বারা সাফাই সাক্ষ্য দেওয়াইয়া তাহাদিগকে আদালত হইতে খালাস করাইতে যত্ন করিতেন। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া দুরাত্মারা ক্রমশঃ পাকা ডাকাইত হইয়া উঠিত এবং কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে পুলিসের হস্তে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইত, সুতরাং অনেক সময় ইহাদের চতুরতা নিবন্ধন পুলিসের চেষ্টা নিষ্ফলা হইত, এবং দুষ্টেরা গায় ফুঁ দিয়া যাবজ্জীবন নিরাপদে বেড়াইয়া বেড়াইত।

কৃষ্ণনগর জেলার মধ্যে শান্তিপুর, কৃষ্ণপুর, মায়াকোল, বাহাদুরপুর, ধুবুলিয়া, মহারাজপুর, বিক্রমপুর, প্রভৃতি গ্রামের গোয়ালারা শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল এবং সেই সময়ে মনোহর, মাণিক, নয়ান, গলাকাটা হরিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল।

কৃষ্ণনগর জেলার মধ্য দিয়া তিনটি সুন্দর নদী বহমান আছে। প্রথম পবিত্র ভাগীরথী, দ্বিতীয় জলঙ্গী অথবা খড়িয়া এবং তৃতীয় মাথাভাঙ্গা,—উহা কোনও স্থানে পাঙ্গাসিয়া নামে এবং হাঁসখালী ও রাণাঘাট অঞ্চলে চূর্ণী নদী বলিয়া অভিহিত। এ তিন নদী পদ্মা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। এইক্ষণ পদ্মার দক্ষিণ কূলে চড়া পড়িয়া তিন নদীরই মোহনা বন্ধ হওয়াতে শুষ্ককালে এই সকল নদীর মধ্যে দিয়া নৌকা যাতায়াতের কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন মোহানা খোলা ছিল, এবং রেলের রাস্তা এবং কলের জাহাজ না থাকাতে, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের সমুদয় পণ্যদ্রব্যাদি নৌকা যোগে এই তিন নদী দিয়া কলিকাতায় আসিত এবং তথা হইতে নানা স্থানে যাইত। বিশেষতঃ পদ্মার এবং এই তিন নদীর উভয় তটে বহু হাট বাজার ও গঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই সকল স্থলে যাত্রী এবং নাবিকদিগের খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কাজেই লোকে সুন্দরবণের কষ্টজনক পথ উপেক্ষা করিয়া এই সকল পথ অবলম্বন করিত। সুতরাং ভাগীরথী ও খড়িয়া ও চূর্ণীর গর্ভ, সকল সময়ে সকল প্রকার নৌকায় পরিপূর্ণ থাকিত এবং তাহাতে দস্যুদিগেরও প্রলোভন জন্মিত। নির্জ্জন স্থানে এবং অসাবধান অবস্থায় পাইলে দস্যুরা নৌকা আক্রমণ করিতে এবং যাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে ত্রুটি করিত না। এইজন্য কৃষ্ণনগর

জেলায় যেমন ডাঙ্গাতে, সেইরূপ জলপথেও ডাকাইতির অভাব ছিল না। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনা সকল সর্ব্বদা জেলার কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইত না, কারণ বিদেশী যাত্রীরা কোথায় হাকিম, তাহার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট করা এবং জানিতে পারিলেও নালিশ করা—কেবল পণ্ডশ্রম বিবেচনা করিয়া যত শীঘ্র পারে, স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে গমন করিত।

আমি নবদ্বীপের দারোগা হই

আমি ইংরাজী ১৮৫৩ সালের ভাদ্র মাসে নবদ্বীপ থানার দারোগা হই। থানা নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর জেলাব শান্তিপুর মহকুমার অধীন, এবং কৃষ্ণনগরের পশ্চিম চারি ক্রোশের মধ্যে ভাগীরথী ও খড়িয়া নদীর সম্মিলন স্থানে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ স্থিত। কিন্তু যে স্থানে বর্ত্তমান নবদ্বীপ বিরাজমান সে স্থানে নিশ্চয়ই প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল না। আধুনিক নগরের কোন্ দিকে আদিশূর প্রভৃতি হিন্দু রাজাদিগের বাসস্থান ছিল, তাহার কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। জনশ্রুতি আছে যে বল্লালদীঘি নামে নবদ্বীপের উত্তরে যে একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই স্থানে উক্ত রাজাদিগের আবাস ছিল, এবং সেই গ্রামের সম্মুখস্থিত মাটির এক বৃহৎ স্তূপ দেখাইয়া লোকে বলে, যে এই স্তূপ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবিষ্ট। এরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে পূর্ব্বে কৃষকেরা ঐ স্থলের মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে মুদ্রা রত্নাদি পাইত। এই অঞ্চলের মনুষ্যের মধ্যে এই কথায় এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে তাহা শুনিয়া সুজনপুরের নীলকুঠির মালিক মেঃ ডুরেপ ডি ডম্বল নামক একজন ফরাসী সাহেবের এক পুত্র এই স্তূপ ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যে তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় বিদ্বান মণ্ডলীতে বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের অধিকারী বলিয়া গৌরবান্বিত হইবেন এবং সেই অভিপ্রায়ে তিনি বাস্তবিক আমার দ্বারা মহারাজা সতীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। আদিশূর বল্লালসেন প্রভৃতি রাজার কথা দূরে থাক, গত চারিশত বৎসরের মধ্যে যে মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্যস্থান অপেক্ষা এত অধিক গৌরবশালী এবং পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই চৈতন্য প্রভুর জন্মগৃহ, পাঠগৃহ এবং লীলার স্থান কোথায় ছিল তাহাও এক্ষণে কেহ জানে না। যে নবদ্বীপের ধূলি ভক্তবৃন্দে পবিত্র রজ বলিয়া শিরে ধারণ করে, সেই স্থানে মহাপ্রভু কখনও পদপ্রক্ষেপ

করিয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহাদের কিছুমাত্র অনুধাবন নাই। আমরা জানি যে আমাদের দেশের নদী সমস্তের পরিবর্ত্তনশীল গতির জন্য শুদ্ধ নবদ্বীপের বলিয়া নয়, নদীতীরস্থ সকল জনপদেরই সীমানার ব্যতিক্রম হয় এবং মূর্ত্তির রূপান্তর হইয়া যায়। তথাপি নবদ্বীপের ন্যায় প্রসিদ্ধ স্থান সকল সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ ইতিহাস কিম্বা বিশ্বস্ত জনশ্রুতি থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অনেক বৃত্তান্ত আছে কিন্তু তৎসাময়িক নবদ্বীপের ভৌগোলিক বিন্যাস এককালে নাই। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় এই সকল বিষয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তিনি যাহা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট এক্ষণে কত গুরুতর কথা বলিয়া বোধ হইতেছে।*

নবদ্বীপবাক্যার্থে বুঝা যায়, আদিকালে এই স্থান জলবেষ্টিত ছিল এবং এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী, পশ্চিমে পোল্‌তার বিল; উহা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ভাগীরথী নদী ছিল; এই বিল পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া পুনরায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়।

আধুনিক নবদ্বীপ তিন খণ্ডে বিভক্ত,—নদিয়া, বুঁইচ পাড়া এবং তেঘরি; তন্মধ্যে নদিয়াই প্রধান। ইহাতে বহু ইষ্টকালয় অনেক মঠমন্দির, চৌপাড়ি আছে এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শিল্পজীবী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনী লোকের বাস; ফল, এই অঞ্চলের মধ্যে নবদ্বীপ একটি বিলক্ষণ ধনাঢ্য স্থান।

---

*ইংবাজীতে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাবা জানেন যে প্রত্নতত্ত্বেব চর্চ্চা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলন্ড দেশে রোমীয় সেনাপতি ও সম্রাটেরা যে সকল দুর্গ ও বর্ত্ম নির্ম্মাণ এবং শিবব স্থাপন কবিযাছিলেন তাহা নির্ণযার্থ সাহেবেবা কত মাপ, পবিমাপ, মৃত্তিকা খনন, বাদানুবাদ এবং পুস্তক প্রকটন কবিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। যে সময বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্‌স্পিয়ার জন্মগ্রহণ কবেন। আমাদের হস্তে চৈতন্যদেবের কিছুমাত্র চিহ্ন রক্ষিত হয় নাই কিন্তু ইংরাজেরা আবন গ্রামে সেক্‌স্পিয়ারের জন্মগৃহ এখন পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর করিয়া পবিত্র দেব মন্দিরের ন্যায় রক্ষা কবিয়া আসিতেছেন। অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন যে কলমে লিখিতেন, ন্যাপোলিয়ান বোনাপার্ট যে যুদ্ধে যে তববারী ব্যবহার কবিয়াছিলেন—তাহাও যত্নে রক্ষিত আছে। আমাদের দেশেও এইরূপ দ্রব্য সমস্ত এক্ষণে সংগ্রহ এবং রক্ষা করার উদ্যোগে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। মহাত্মা বামমোহন রায়ের হস্তলিপি এবং ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য বোধ হয় তাঁহার পৌত্রদ্বয় হরিমোহন ও প্যারিমোহন বাবু ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিতে পারেন! সেইরূপে ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, নিধুবাবু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালীর বংশধর এবং বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে তাঁহাদের চিহ্ন সকল সংগৃহীত হইতে পারে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে অনতিবিলম্বে কলিকাতার বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ মনুষ্যদিগের পরিত্যক্ত দ্রব্য সমস্ত সঙ্কলনের এবং রক্ষার জন্য স্থান করিবার আবশ্যক হইবে এবং তখন এই সকল বস্তু অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।

নবদ্বীপ থানার এলাকা বিস্তীর্ণ ছিল না সুতরাং ইহাতে অল্প পুলিশ আমলা নিয়োজিত ছিল; কেবল একজন দারোগা ও পাঁচজন বরকন্দাজ ভিন্ন, অন্য থানার ন্যায় ইহাতে নায়েব দারোগা কিম্বা জমাদার ছিল না। তখন বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সমুদয় পুলিশের উপরে বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ার সাহেব (পাঠকদের পরিচিত রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বার ড্যাম্পিয়ার সাহেবের পিতা) সুপরিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশ আখ্যায় সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা। সি, টি, মন্ট্রেসর সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি ভাদ্র মাসে দারোগা হই। নবদ্বীপে আমার পরিচিত কএকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা কোথায় আমাকে দেখিয়া আহ্লাদের কথা বলিবেন, না বরং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যে আমি অত মন্দ সময়ে এই কার্য্য-গ্রহণ করিয়াছি। কারণ পূজা সম্মুখে। গত কয়েক বৎসরাবধি এই সময়ে গ্রামের লোক চুরি ডাকাইতির আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছিল এবং উপস্থিত বৎসরেও তাহাদের সে আশঙ্কা স্থায়ী আছে; বিশেষ আশঙ্কার কারণ এই যে, আমি নূতন দারোগা, কে চোর, কে সাধু, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ, কাজেই এমন সংশয় সময়ে আমার দ্বারা শান্তি রক্ষিত হওয়া অসাধ্য না হইলেও, দুরূহ কার্য্য হইবে। কিন্তু তাঁহারা আরও বলিলেন যে নবদ্বীপের মধ্যে বদমায়েস অতি অল্প আছে, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে দস্যুরা আসিয়া ইহাতে চুরি ডাকাইতি করে। দস্যুদিগের নবদ্বীপে ডাকাইতি করার একটি সুবিধা এই ছিল, যে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে নবদ্বীপের উপরিউক্ত তিনখানা গ্রাম ভিন্ন, অন্য কোন গ্রাম কৃষ্ণনগর জেলার অধীন ছিল না; পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামই বর্দ্ধমান জেলাভুক্ত; নবদ্বীপের পুলিশ আমলাকে বর্দ্ধমান জেলার কোন ব্যক্তিকে ধরিতে হইলে, ঐ জেলার পুলিশের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে হইত; কাজেই অনেক বিলম্ব হইত এবং তাহাতে দস্যুরা সাবধান হইতে অবকাশ পাইত।

এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি নিতান্ত ভীত হইলাম। কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রামের শান্তি ও আমার চাকরি রক্ষা পাইবে তাহা, শীঘ্র স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিবার কিম্বা উপদেশ লইবার জন্য আমার অধীনস্থ চারিজন বরকন্দাজ ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নিকটে ছিল না; কিন্তু পূজার সময়ে কিসে দশ টাকা হস্তগত হইবে, সেই চিন্তায় তাহারা ব্যাকুল, এবং তাহাদের ভাব গতিকে আমার বোধ হইল, যে গ্রামে এই সময়ে একটা শান্তিভঙ্গের ঘটনা উপস্থিত হইলেই তাহাদের রোজগারের সুন্দর একটি পন্থা হয়। অন্যান্য থানায় নায়েব, দারোগা, জমাদার এবং অন্যূন

১৫জন বরকন্দাজ থাকে, কিন্তু আমার ভাগ্যে আমার থানায় "দাদা বৈ পাইক নাই।" তথাপি আমার এই ভয়ঙ্কর অমানিশার অন্ধকার মধ্যে একমাত্র আশাপ্রদ রশ্মি ছিল,—গ্রাম্য চৌকীদার। থানার ৪ জন বরকন্দাজ যেমন ক্ষীণকায়, স্বার্থপর এবং অকর্ম্মণ্য, —চৌকীদারেরা ঠিক তাহার বিপরীত। সাধারণতঃ তাহারা বলিষ্ঠকায়, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং পরিশ্রমী; তাহাদের স্ব স্ব চৌকীর লোক নিরাপদে থাকিবে, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, এবং আমার নিকট তাহারা অনেকে প্রকাশ করিল যে, ভিন্ন জেলার লোকে আসিয়া তাহাদের গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া যায়, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত লজ্জা এবং দুঃখ হয়; এবং কহিল যে, যদি আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিকালে সমান পরিশ্রম করিতে স্বীকার করি, তাহা হইলে যাহাতে এই আশঙ্কার কাল নির্ব্বিঘ্নে কাটিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহারা যত্নের ত্রুটি করিবে না। চৌকীদারদিগের মুখে এইরূপ আশ্বাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মনে সাহসের উদয় হইল এবং তাহাদের উপদেশোনুযায়ী কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার আর একটি সুবিধা উপস্থিত হইল। আমার অন্নদাতা মাতুল কৃষ্ণনগর জেলার একজন উচ্চ শ্রেণীর গবর্মেন্টের কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় নৌকা পথে দেশে যাইতেন এবং দস্যু ভয়ে স্বীয় রক্ষার্থ তিন চারিজন এই অঞ্চলের সুশিক্ষিত লাঠিয়াল সর্দ্দার নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে লইতেন। আমিও মাতুলের সঙ্গে বাড়ী যাইতাম। পথিমধ্যে সর্দ্দারদিগের সহিত আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হইত এবং তাহারা আমার অল্প বয়স দেখিয়া নিঃশঙ্কায় কে কি প্রকারে ডাকাইতি এবং লাঠিয়ালি করিয়াছিল, তাহা অকপটে আমার নিকট বর্ণনা করিত। এমন এক বার নহে ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই সর্দ্দার কয়েকজন আমাদের সমভিব্যাহারে যাতায়াত করিয়াছিল এবং প্রতিবার আমি তাহাদের মুখে তাহাদের কীর্ত্তিকলাপের গল্প শুনিতাম। তখন কে জানিত, যে অল্প কালের মধ্যে আমি নবদ্বীপের দারোগা হইয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে বসিব। তাহারাই যে গ্রাম্য চৌকীদার ছিল, তাহাও সে সময়ে আমি জানিতাম না, পরে শুনিলাম, যে অধিক বেতনের লোভে তাহারা থানা হইতে বিদায় লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইত। এই চারি ব্যক্তির মধ্যে তিনজন অর্থাৎ রাজকুমার বাগদী, শ্রীনাথ (ছিরু) বাগদী ও হারান খাঁ নবদ্বীপ থানার অধীন তিনটি গ্রামের চৌকীদার ছিল। চতুর্থ ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিত। উহারা তিনজনেই সরল চিত্তে আমার হিতসাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এদিকে ক্রমশঃ অপর পক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে নিজ

গ্রামের লোকের দ্বারা গ্রামের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামস্থ দস্যুদিগের গতিরোধ করিতে পারিলেই নবদ্বীপের শান্তি সাধন করিতে সক্ষম হইত। এই কল্পনায় অন্ধকার পক্ষের প্রথম রাত্রি হইতে থানায় এক প্রহরের ডঙ্কা দিয়া রামকুমার, ছিরু প্রভৃতি ২০ জন উৎকৃষ্ট চৌকীদার, একটা বন্দুক ও চারিটা মশাল ও তাহার উপযোগী তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কোনও দিন চারি এবং কোনদিন পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া নবদ্বীপকে এক প্রকার বেষ্টন করত সমস্ত রাত্রি চৌকী দিতে আরম্ভ করিলাম। চুরি ডাকাইতি হইয়া গেলে পরে দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিতে পারিলে যে পরিমাণে হিত সাধিত হয়, তদপেক্ষা আমার বিবেচনায় ঐ সকল ঘটনা যাহাতে আদৌ হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করাই অধিকতর হিতকর কার্য্য। অতএব যাহাতে দস্যুগণ বুঝিতে এবং জানিতে পারে যে আমরা সতর্ক এবং দলে বলে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সম্যকরূপে প্রস্তুত আছি, তাহা করিতে ত্রুটি করিলাম না। দণ্ডে দণ্ডে প্রত্যেক দল আপন আড্ডা হইতে পাইকি হাঁকে ডাক ছাড়িত এবং এক দলের চীৎকার শুনিলে আর সকল দল এবং গ্রামের ভিতর চৌকীদারেরাও তাহার অনুকরণ করিত এবং দুই একবার আমি বন্দুকেরও শব্দ করিতাম। এইরূপ শোরগোল করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতাম এবং তদ্দারা শত্রুরাও জানিতে পারিত, যে আমরা তাহাদের নিমিত্ত বিলক্ষণ সাবধানের সহিত প্রস্তুত আছি। ঘোর নিশাকালে জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে যখন রামকুমার কিম্বা ছিরুর 'রে রে' ধ্বনি অন্ধকার ভেদ করিয়া গগনে উঠিত, তখন আমাদের সকলের মনে সাহস হইত, যে দস্যুরা আগমন করিলেও আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব। এই দুর্ভোগের কষ্ট সমস্ত কষ্ট বলিয়া বোধ করিতাম না। যখন আলোক-শূন্য, কেউটিয়া ভরা ক্ষেত্রের পিচ্ছিল আলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতাম, তখন সেই একমাত্র মহীয়সী চিন্তা— নবদ্বীপবাসীগণের মঙ্গল চিন্তা—ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে আসে নাই। সর্পে দংশন করিবে, কিম্বা ডাকাইতের হস্তে প্রাণ হারাইব এবং তাহা হইলে বাটিতে যে বৃদ্ধা জননী, যুবতী স্ত্রী, এবং নবজাতক পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি তাহাদের কি উপায় হইবে—ইহা ভ্রমেও মনে আসিত না। যখন অধিক রাত্রিতে নিদ্রায় আক্রান্ত হইতাম, ও বসিবার স্থান অভাবে কেবল পদব্রজে ৬/৭ ঘন্টা ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শরীর অবসন্ন হইত, তখন চৌকীদারদিগের দা-কোটা তামাকুতে নুটীর আগুণে হুকা অভাবে হস্ত হুকা করিয়া সজোরে দুই চারি টান দিলেই সকল ক্লেশ দূর হইত, এবং সেই তামাকুই বা কত মিষ্ট বোধ হইত। বহুকালপরে মুরশিদাবাদের নবাববাড়ীর সুবাসিত তামাকু খাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা চৌকীদারদিগের তামাকের তুল্য সুরস বোধ হয়

নাই।

কৃষ্ণপক্ষ যতই নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার মনে হইল যে বুঝি বনের বাঘ মিথ্যা, কেবল মনের বাঘের ভয়ে আমাদের এই সমস্ত পণ্ডশ্রম করা হইতেছে; কিন্তু অনতিবিলম্বেই আমার সে ভ্রম দূর হইল। ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশীর রাত্রি দুই প্রহরের পরে টীপটীপ বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ হইল। আচ্ছাদন অভাবে আমরা সকলেই কষ্টবোধ কবিতে লাগিলাম। সঙ্গে যে দুইজন বরকন্দাজ ছিলেন, তাঁহারা চৌকীদারদিগকে সেই স্থানে বাখিয়া আমাকে থানায় প্রত্যাগমন করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, এক যাত্রায় পৃথক ফল হইলে, উচিত কার্য্য হইবেনা। বিশেষ আমি কার্য্যস্থল পবিত্যাগ করিয়া যাইলে পাছে সমভিব্যাহাবী অধিকাংশ ব্যক্তিই আমার পথে অনুগমন করে, তাহা হইলে বিভ্রাট হওয়াব সম্ভাবনা, এই বিবেচনায় আমি বরকন্দাজ মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করত নিকটে কাহারও জানিত উপযুক্ত স্থান আছে কিনা অনুসন্ধান করাতে শুনিলাম, যে কিছু দূরে আরও পশ্চিমদিকে আউশ ধান্য মাড়িবার এক খামারবাড়ী আছে, তথায় যাইতে পারিলে, একখানা একচালা পাওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে একজন বরকন্দাজ ও একজন চৌকীদার লইয়া খামারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে সেখানে সেই গভীর রাত্রিতে দুইজন মানুষ বসিয়া তামাকু খাইতেছে. জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে তাহারা ধান পহব দিতেছে। অন্ধকারে তাহাদিগের আকার কিম্বা মূর্ত্তি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বুঝিলাম, যে আমাদের আগমনে তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ব্যগ্র হইল। কিন্তু আমাদের সম্ভাষণ বাক্যে তাহারা আমাকে ভাল করিয়া এক ছিলাম তামাকু খাওয়াইবার যোগাড় করিল। ইতিমধ্যে আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে আগন্তুক কয়েক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে "কে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অল্প দূর হইতে প্রত্যুত্তর আসিল যে "আমি রামকুমার।" এই বাক্য শুনিবামাত্রই ঐ দুই ব্যক্তি কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া দুইজনেই এক সামরিক লম্ফ দিয়া চালা হইতে নির্গত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিল। আমি অমনি "ধর" বলিয়া চীৎকার করাতে আমার সঙ্গী বরকন্দাজ তাঁহার ঢাল তরবার লইয়া দৌড়িয়া যাইতে খামারের মধ্য স্থানে যে এক একটা বাঁশের খুটি পোতা ছিল তাহা অন্ধকারে ঠক করিয়া তাঁহার মস্তকে লাগাতে তাঁহাকে লাঠি মারিল, বিবেচনায় ভয়ে "দারোগা মশাই মেলে গো" বলিয়া ভূমিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চৌকীদার কিছুদূর পর্য্যন্ত পলাতক ব্যক্তিদ্বয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং প্রকাশ করিল যে অন্ধকারে সে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না।

রামকুমার চৌকীদার আসিয়া উপস্থিত হইলে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল যে 'এ ব্যাটারা অবশ্যই মনোহর এবং তাহার একজন সঙ্গী হইবে, আমি দেখিলে তাহাদের চিনিতে পারিব ভয়ে, তাহারা শশব্যস্তে পলায়ন করিয়াছে।" রামকুমারের কথা সঙ্গত বিবেচনায় আমি তাহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম এবং প্রথম রাত্রিতে আমার মনে যে অভয় উদয় হইয়াছিল তাহা শেষ রাত্রির এই ঘটনা দেখিয়া একেবারে বিলুপ্ত হওয়ায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতার সহিত বোঁদ পাহারা দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৬ রাত্রি অতিক্রান্ত; হৈ হৈ রৈ বৈ করিয়া কাটাইয়া অবশেষে দেবীপক্ষের দেখা পাইলাম। ভাবিলাম এখন পরিশ্রমের লাঘব হইবে, কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়িল। চতুর্থীর প্রাতে সংবাদ পাইলাম যে গত রাত্রিতে বল্লালদীঘির ওপারে গঙ্গার নূতন চড়ার মধ্যস্থিত এক খাড়িতে একখানা মহাজনী নৌকায় ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমা একখানা পাটুলী নৌকা কলিকাতা হইতে এক সাহেবের চালানী বাক্সবন্দী বিলাতী সরাপ বোঝাই লইয়া কাশী যাইতেছিল। বিদেশী, বিশেষ খোট্টা মাঝি-মাল্লা স্থানীয় অবস্থা জ্ঞাত না থাকাতে, কিছু বেলা থাকিতে নবদ্বীপ পৌছিয়া মিথ্যা কালক্ষয় না করার অভিলাষে, যতদূর সাধ্য যাইতে যাইতে দিবা অবসান সময়ে এই খাড়ির মধ্যে লাগান করিয়াছিল। রাত্রিতে দস্যুরা আক্রমণ করিয়া নাবিকদিগের যে যে দ্রব্য অপহরণের উপযুক্ত তাহা এবং ৫টা সরাপের বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। পরে সপ্তমী পূজার রাত্রিতে উপরিউক্ত ঘটনার স্থানের নিকটবর্ত্তী আর এক স্থানে শাল কাষ্ঠের কড়ি বরগা বোঝাই আর একখানা ঐরূপ পশ্চিমা নৌকা লাগান দেখিয়া ডাকাইতেরা তাহাও আক্রমণ করে কিন্তু তাহাতে অপহরণের উপযুক্ত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে এবং খোট্টা নাবিকেরা তাহাদের প্রথমে বাধা দিয়াছিল বলিয়া সেই আক্রোশে মারপিটের দ্বারা তাহাদিগকে নৌকা হইতে তাড়াইয়া দিয়া, নৌকায় ও কাষ্ঠে আগুণ লাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অগ্নি প্রায় ১২ ঘন্টা ধরিয়া জ্বলিয়াছিল এবং আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও বোঝাই মালের কিয়দংশ বাঁচাইতে পারিলাম না। যে স্থানে এই দুই ঘটনা হয়,—তাহার চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের বাস ছিল না।

এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি নৌকায় ডাকাইতি সংবাদ পাইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট এবং আমার অব্যবহিত উপরিস্থিত হাকিম শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া ভবিষ্যতে খুব সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিক সতর্ক হওয়া সাধ্যাতিরিক্ত ছিল।

যাহা হউক আমার অত্যন্ত উৎসাহ ভঙ্গ হইল। দেখিলাম যে গত কয়েক রাত্রির ন্যায় প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী আমার এইরূপ পরিশ্রম করা অসাধ্য হইবে। লোকে যাহা বলিত তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এই সকল ডাকাইতির মূল বিনাশ করিতে না পারিলে কেব্বল চৌকী পাহাবা দিয়া নবদ্বীপ রক্ষা করা যাইতে পারিবে না এবং অধিবাসীগণেরও চিত্তের আশঙ্কা দূর হইবে না। সেই মূল কে তাহা বিবৃত করার উদ্দেশ্যেই ভূমিকা স্বরূপে আমার এই প্রবন্ধ লেখা হইল।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে যে খামারে রামকুমার চৌকীদার দুইজন অপরিচিত মনুষ্যেব বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র মনোহরের নাম উচ্চারণ কবিযাছিল, এবং "মনোহর কে?" বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করাতে, সে তখন সংক্ষেপে উত্তর করে যে "আপনি যেমন পুলিশেব মধ্যে, মনোহরও সেইরূপ চোর ডাকাইতের মধ্যে দারোগা।" সাধারণ লোকেরও সেই বিশ্বাস ছিল। মনোহর কে তাহার শেষ কীর্ত্তি কি এবং যে ঘটনায় এবং যে প্রণালীতে তাহাকে দেশ ছাড়া করার কার্য্য আমার ভাগ্যে হইল, তাহা আমি ইহার পরে বর্ণনা করিব।

মনোহর ঘোষ

মনোহর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা; একডালা পরাণপুর গ্রামে তাহার বাসস্থান ছিল। নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে একডালা পরাণপুর, পূর্ব্বস্থলী—যাহার অন্যতম নাম পূবধুল, চুপি, কাঁকশিয়ালী, গুপীপুর, মেড়তলা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম মালার দানার ন্যায় পাশাপাশি একছত্রে ভাগীরথীর কূলে স্থিত। সকল গ্রামেই ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। পূবধুল গ্রামে পূবধুল থানা সংস্থাপিত ছিল; এবং এই গ্রাম বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ লেখক মৃত অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মস্থান। গঙ্গাপারে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বাস অতি বিরল কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে একঘর বঙ্গজ কায়স্থ স্থাপিত ছিল এবং অক্ষয় বাবু সেই কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। চুপি গ্রামে খ্যাতনামা দেওয়ান মহাশয়দিগের বাস এবং তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের ভক্তিরসের গীত এখনও আমাদিগের মধ্যে আদরণীয়। গুপীপুর মেড়তলাও এক বিগ্রহের স্থান বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোকেব নিকট পবিত্র স্বরূপে পরিগণিত। কাঁকশিয়ালীতে এক নীলকুঠি ছিল। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গ্রামেই ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবী লোক বাস করিত এবং ইষ্টকালয়েরও অভাব ছিল না। আমি যখন দেখিয়াছি, তখন ভাগীরথী নদীর প্রধান স্রোত বহুদূরে বেলপুকুর গ্রামের নীচে বহমান ছিল এবং পূর্ব্বস্থলী গ্রামের নিকট কেবল একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় গঙ্গার জল প্রবাহিত হইত এবং তাহা দিয়া শুষ্ককালে নৌকায় গমনাগমন করা কঠিন হইত। কিন্তু শুনিয়াছি যে, এক্ষণে সেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

মনোহরের পিতার নাম আমি অবগত নহি। তাহার শরীরের অবয়ব কিঞ্চিৎ পরে বিবৃত করিব।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে স্থান এবং সময়ের প্রভেদে বস্তু মাত্রেরই ফলাফলের বিভিন্নতা হয়। উদ্ভিদ জগতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত স্থানে এবং উচিতকালে বৃক্ষ রোপিত

না হইলে নিকৃষ্ট ফলোৎপাদিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে কমলালেবুর বৃক্ষ আনাইয়া অন্য স্থানে রোপন করিলে সহস্র যত্নেও সেইরূপ মিষ্ট এবং সুরস ফল হয় না; অধিক হইলেও অম্লময় নারেঙ্গা হইয়া যায়। মানবমণ্ডলীর মধ্যেও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য দেশ কালের বৈষম্য নিবন্ধ নরোত্তম কিম্বা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাসাভিজ্ঞ মহাশয়েরা জানেন যে লর্ড ক্লাইব যদি খ্রীষ্টীয় আঠার শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ না করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে জন্মিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দশা অতি শোচনীয় হইত। বাল্যকালে চৌর্য্যবৃত্তিতে ক্লাইবের দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া উপায়ান্তর অভাবে তাঁহার বান্ধবেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সমিতির অধীনে এক কেরাণীগিরি উপলক্ষ করিয়া কিন্তু বাস্তবিক ওলাউঠা রোগে কিম্বা হিংস্রক পশ্বাদির মুখে মরিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে ঐ পাপ বিদায় করিয়া দেয়। সেই পাপ ভারতভূমে পদার্পণ করিয়া কিযৎকালের মধ্যে ফরাসীদিগকে পরাজয় করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া, কৃত্রিম লিপি দ্বারা উমিচাঁদকে প্রতারণা করিল এবং অবশেষে কয়েকজন রাজদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, পলাশীতে এক ছায়া যুদ্ধ দেখাইয়া, বালক সেরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গাদি প্রদেশ ইংরাজ বণিকদিগের করে চিরাকলের জন্য প্রদান করিল। সেই যে ব্যক্তিকে পাপ বিবেচনায় তাহার পিতা মাতা মারিবার জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল, সে কয়েক বৎর পরে গৌরবের মুকুট শিরে ধারণ করিয়া জন্মভূমি প্রত্যাগমন করিল, স্বদেশের রাজার নিকট আদৃত হইল, উপাধি পাইল এবং সর্ব্বলোকের নিকট সম্মানিত হইল। ধনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, উপরন্তু সেই ক্লাইব, চিরস্মরণীয় ভাবে ইংরাজের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। যে কলুষিত প্রকৃতি দোষে ক্লাইব বাল্যকালে সহাধ্যায়ীদিগের পুস্তক ও খাদ্যদ্রব্য, ও প্রতিবাসীর বাগিচার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের মূল্যবান ফল, অপহরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারে নাই, অধিক বয়সে সেই প্রকৃতি প্রভাবে, অনুকূল অবস্থা সহকারে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল সেই প্রকৃতি প্রভাবে, অনুকূল অবস্থা সহকারে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল বালকের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পাপ কিম্বা অধর্ম্মাচরণ বলিয়া বিবেচনা করিবে কেন?

কিন্তু এই পাপক্ষেত্রে ক্লাইব্ একাকী নহে। সেকেন্দার সা,* —যাঁহাকে ইংরাজি ভাষায় বীরপ্রবর আলেকাজাণ্ডর বলে, তৈমুর লং, জঙ্গিশ খাঁ, মহম্মদ গজনী, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় খ্যাত্যাপন্ন দিগ্‌বিজয়ী যোদ্ধাগণের একই মনোবৃত্তি এবং একই কার্য্যপ্রণালী। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগবেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা সত্য যুগে হইলে ব্রাহ্মণেরা

তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিতেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার গরিব মনোহর দ্বাপরে আবির্ভূত হইলে, দ্বিতীয় জরাসন্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত।

মনোহরকে পরমেশ্বর বল, বীর্য্য এবং সাহস দান করিতে কৃপণতা করেন নাই এবং জটিল বুদ্ধিও তাহার কম ছিল না। তাহার বল ও কুস্তি বিদ্যা সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি, যে সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলার উপরে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া বসিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুইজন মনুষ্যকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত। মনোহর লাঠির ভর করিয়া সাধারণ উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিতে ক্লেশ বোধ করিত না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে ২০ ক্রোশ গ্রাম্য রাস্তা হাটিতে পারিত। লাঠিয়ালি, সিন্ধচুরি, ডাকাইতি, রাহাজানী, নৌকায় ডাকাইতি—ইহার সকল কার্য্যেই সে পরিপক্ক ছিল। অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সে এমন প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি প্রকাশ করিত, যে তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে তাদের নেতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কথিত আছে যে তেহট্ট গ্রামে এক ধনাঢ্য কলুর বাড়িতে নয়না মানিকা নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ডাকাইতের দলের সহিত মনোহর ডাকাইতি করিতে গিয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। কলুর ইষ্টকালয় বাড়ী ছিল এবং পুরজন ছাতের উপর উঠিয়া এমনভাবে সেই স্থান হইতে ইট ও ঝামা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, যে দস্যুদিগের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ান অতি কঠিন হইয়া উঠিল। নয়না প্রভৃতি প্রস্থানের পরামর্শ স্থির করিল, কিন্তু মনোহর তাহা অতি লজ্জাকর কার্য্য বিবেচনা করিয়া

* সেকেন্দার সার নিকট একজন দস্যুদলের নেতা ধৃত হইয়া আসিলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে দস্যু উত্তর করিল যে "আমি এমন কোন্ কার্য্য করিয়াছি যাহা আপনি করেন নাই। আমার ন্যায় আপনারও পরদ্রব্য অপহরণ করা ব্যবসা। আমি অল্পবিস্তর ধন চুরি করি, আপনি রাজার ভাণ্ডার লুটিয়া থাকেন। আমি একটি গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করি, আপনি রাজ্য দেশ ছারখার করেন। আমি শতাবধি লোক সমভিব্যাহাবে দস্যুবৃত্তি পরিচালন করি কিন্তু আপনি লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া দেশ অধিকার করেন। আমি আমার অভীষ্ট সাধনার্থ কখনও কখনও দুই একজন মানুষকে আঘাত কিংবা বধ করিয়াছি, আপনার প্রত্যেক যুদ্ধে সহস্রাধিক মনুষ্য অশ্ব হস্তী প্রভৃতিকে আপনি যমালয়ে প্রেরণ করেন। আমার কার্য্যে কদাচিৎ কখনও একখানা গৃহ দগ্ধ হয়, আপনি শত শত নগর জনপদ উচ্ছন্নে দিয়াছেন। আমি কেবল আমার পেটের দায়ে এই দুর্বৃত্তি করিতে বাধিত হইয়াছি কিন্তু আপনার সে ওজর নাই, কারণ আপনি রাজার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার যেমন জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের অভাব আপনার তেমনই সকল সম্পূর্ণ ছিল। রাজ্য ধন সকলই প্রচুর। তথাপি আপনি পরদ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই। অতএব আমাতে আর আপনাতে কেবল লঘু গুরু প্রভেদ। আমার শিরশ্ছেদ করিলে যদি আমার পাপের উচিত দণ্ড হয়, তবে আপনাকে সহস্র খণ্ডে ছেদন না করিলে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।" কথিত আছে যে এই উচিত বক্তা দস্যুকে সেকেন্দার সা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

বাহির বাড়ীর একটা ঘরে কাষ্ঠের কবাট ও ঝাঁপ খুলিয়া, রোমীয় সেনারা পূর্ব্বকালে দুর্গ আক্রমণ করার সময়ে যেমন স্বীয় স্বীয় ঢাল দ্বারা তাহাদের মস্তক এবং শরীর আচ্ছাদন কবিযা যাইত, মনোহরও সেইরূপ এই কবাট এবং ঝাঁপ দ্বারা শরীর এবং মস্তকাবৃত করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। মনোহরের সঙ্গীগণ তাহার কথামত কার্য্য করিয়া অনায়াসে স্বকার্য্য সাধন করিল। মনোহর কখনও রোমীয় ইতিহাস পাঠ কবে ন্নই কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেই স্বভাবতঃ তাহার মনে নিক্ষিপ্ত ইট প্রস্তরাদির আঘাত রক্ষার জন্য এইরূপ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দক্ষিণে কালনার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে মৃজাপুবের খাল হইতে উত্তর গোটপাড়া এবং অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার তট মনোহরের কার্য্যক্ষেত্র ছিল; এই স্থানের মধ্যে সুবিধা মতে নৌকা আসিলে নৌকাওয়ালাদের রক্ষা ছিল না। কয়েকবার কৃষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা ও জজ ব্রাউন সাহেবেরও দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা মনোহব ভাগীরথীর ধারে আক্রমণ করিয়া অনেক টাকার মাল অপহরণ করে। কিন্তু মনোহর তাহার নিজ থানায় অর্থাৎ পূবধুল থানার এলাকাস্থিত গ্রাম সকলে কদাচিৎ চুরি ডাকাইতি করিত, কৃষ্ণনগর জেলার অধীন স্থানেই তাহার কার্য্যস্থল ছিল। কারণ থানা তাহার বাসস্থানের অতি নিকট থাকাতে, পূবধুলের পুলিশ আমলার অধিকারের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি পরিচালনা করিলে সর্ব্বদা তাহারা বিরক্ত করিবে বলিয়া, সে তাহাতে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ইহাও শুনা হইয়াছে যে উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীগণের সহিত মনোহরের এরূপ গোপনীয় বন্দোবস্ত ছিল, যে পূবধুলের থানার মধ্যে শান্তি ভঙ্গ না হইলে, তাহারা মনোহরের অন্য কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। পূবধুলের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামে মনোহরের অসীম আধিপত্য ছিল এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অল্প ব্যক্তি ছিল, যে মনোহরকে ভয় না করিয়া কার্য্য করিতে পারিত। কাঁকশিয়ালীর বাজারে অন্যান্য গোয়ালিনীর সঙ্গে মনোহরের ভগিনী ও স্ত্রী দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইত, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মনোহরের পসরা বিক্রীত না হইলে ক্রেতারা অন্যের দধি দুগ্ধের প্রতি হস্তার্পণ কবিতে পারিত না। গ্রামের মধ্যেও মনোহর যখন যাহার নিকট কিছু চাহিত, কিম্বা যাহাকে কোন কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত, সে তাহা না দিলে কিম্বা করিলে অচিরাৎ তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইত। মনোহরের পিতামহীর মৃত্যু হইলে পরে সে সমারোহ পূর্ব্বক তাহার শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্বস্থলী, চুপি প্রভৃতি কাঁসারীর নিকট প্রচুর পরিমাণে তৈজস, বস্ত্র-বিক্রেতার নিকট বস্ত্রাদি, ময়রার নিকট চিড়া, এইরূপ সমুদয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ভিক্ষা চাহিল। এই ভিক্ষা বলি রাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষার ন্যায়। না

দিলেও নয় এবং দিতে হইলেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিতে হয়। মনোহর পিতামহীর শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহিয়াছে লোকে তাহা না দিয়া কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? তুমি আজি ১০ টাকার দ্রব্য দিলে না, কল্য তোমার সে ১০০ টাকার ক্ষতি করিবে। বিশেষ মনোহরের বিরুদ্ধে রাজ দরবারেও প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য, কারণ সহসা কোনও ব্যক্তি মনোহরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করিবে না। এমতাবস্থায় কেহই মনোহবকে তাহার ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতে পারিল না এবং এইরূপে সে তাহার পিতামহীর শ্রাদ্ধকার্য্য অনায়াসে তাহার ইচ্ছানুযায়ীরূপে সম্পন্ন করিল। চৌর্য্যবৃত্তি পরিচালনে মনোহরের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মায়াদয়ার উদ্ভব হইত না এবং সে সকল ঘটনায় প্রাণবধ কবার আবশ্যক না থাকিত, তাহাতেও প্রাণ নষ্ট করা তাহার নিকট আনন্দজনক কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। তাহার এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুণ।

মনোহর ধৃত হইলে পরে নবদ্বীপের একজন অতি প্রধান অধ্যাপক মনোহরের দুর্ব্বৃত্ততার দৃষ্টান্ত আমার নিকট ব্যক্ত করেন, ইহা তাঁহার চক্ষের উপরে ঘটিয়াছিল। তিনি যে প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমিও পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে সেই প্রণালীতে তাহা বিবৃত করিব। ''আমি প্রতি বৎসর ৺শারদীয় পূজার কয়েক দিবস পূর্ব্বে বার্ষিক বৃত্তি আহরণের নিমিত্ত শিষ্য সেবকেব নিকট যাইয়া থাকি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও দুই মাল্লার একখানা ছোট নৌকায় একজন শিষ্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন ভাণ্ডারী লইয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রার নিমিত্ত প্রাতঃকালে নবদ্বীপের ঘাট হইতে যাত্রা করি। মধ্যাহ্ন সময়ে কাঁকশিয়ালীর বাজারে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া সেই দিবসের জন্য এক প্রকার আহারের কার্য্য শেষ করিলাম; রাত্রিতে পাক না করিয়া জলযোগের অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া মাঝিকে যতদূর সাধ্য অগ্রসর হইতে আদেশ করিলাম। অল্পকালের মধ্যেই রোকনপুরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম কিন্তু তখন আমার পাচক ব্রাহ্মণ বলিল যে, ''আমি একটা কথা মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শুনিয়া এখান হইতে অধিকদূর যাওয়া না যাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কাঁকশিয়ালীর বাজারে আমার সহিত মনোহর ঘোষের দেখা হয় এবং আমাকে নূতন লোক দেখিয়া আমরা কে কোথায় যাইতেছি, তাহার তথ্য জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মনোহর আমাকে চিনে না, কিন্তু আমি তাহাকে চিনি এবং সেই নিমিত্ত আমি তাহাকে আমাদের পরিচয় দিলাম না। লক্ষণ বড় ভাল নয়, বিশেষ পূজার সময় নির্জ্জন স্থানে এই বেটার হস্তে পড়িলে আমাদের মঙ্গল নাই।''' এই কথা শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কোন গ্রামের মধ্যে যাইয়া

কোনও ব্যক্তির আশ্রয় লইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভাবিলাম, যে অনতিদূরে বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়িতে যাইয়া আমি ও আমার সমভিব্যাহারী সকল অতিথি হইয়া রাত্রি কালটা অতিবাহিত করিব। বহিরগাছীর গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরের রাজার গুরুবংশ; বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে এবং রোকনপুরের বাজারও তাঁহাদের অধিকারেব মধ্যে। বাজারে উঠিয়া এক দোকানে শুনিলাম যে, গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের একজন যাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল এবং যাঁহার বাড়ীতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে এই বাজার হইয়া নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন কবিবেন এবং বাজারে অপেক্ষা করিলে আমরা তাঁহার সঙ্গে বহিরগাছী যাইতে পাবিব। আমি বাজারে অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে আমাদের পশচাতে একখানা যাত্রাওয়ালার নৌকা আসিয়া সেই বাজার ধরিল। তাহারও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পূজার সময় একজনের বাড়ীতে যাত্রা করিতে যাইতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সেই দোকানে উপস্থিত হওয়াতে, কথায় কথায় আমি যে বিভীষিকা দেখিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া অদ্য আরও অধিক দূরে যাইতে নিষেধ করিযা, কল্য প্রাতে দুই নৌকা একত্রে যাওনের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু হতভাগারা আমার কথা গ্রহণ করিল না; বলিল যে তাহারা অনেকগুলি লোক নৌকায় আছে, ১০/৫ জন ডাকাইতে তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। ক্ষণেক পরে দেখিলাম, যে যাত্রাওয়ালারা নৌকা খুলিয়া বেহালা নামক চর বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু সেই সময় গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রখর থাকায় বিশেষ বড় নৌকা এবং প্রচুর সংখ্যক মাল্লার অভাবে ধীর গতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। এদিকে প্রদোষ সময় উপস্থিত হইল এবং আমি যে ব্যক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আসিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে আশ্বাস প্রদান করত বাজারে তদীয় যে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য ছিল, তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র অন্ধকার হইয়াছে এমন সময় আমাদের কর্ণে বহুদূরে চরের দিক হইতে একটা ভয়ানক শোরগোলের শব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাচক ব্রাহ্মণ অমনি বলিয়া উঠিল যে "ঐ গো শুনুন পাপিষ্ঠ বেটা বুঝি কি না কি করিল।" আমি স্তম্ভিত হইলাম। বাজারে যে দুই চারিখানা দোকান ছিল, তাহার দোকানিরা শশব্যস্তে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, স্ব স্ব গ্রামে প্রস্থান করিল এবং আমার গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে "এক্ষণে শীঘ্র চলুন, ইহা ভাবিয়া আপনি কি করিবেন, মধ্যে মধ্যে এইরূপ কারখানা হইয়াই থাকে।" পর দিবস প্রাতে সেই বেহালার চর বহিয়া যাইতে রোকনপুর হইতে প্রায় ১৪০ ক্রোশ ব্যবধানে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, যে একখানা চড়ন্দার পান্সি নৌকা

একটা ঝোপের ধারে জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে; আমার মাঝি কহিল যে ইহা সেই যাত্রাওয়ালাদিগের নৌকা, কোন সন্দেহ নাই। চড়ার উপরেও একটা ভগ্ন পেটারা ও কয়েকখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। নৌকার যাত্রীদিগের কাহারাও কোন চিহ্ন কিম্বা অনুসন্ধান পাইলাম না। তাহাদের মধ্যে কেহ পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, কি সকলেই সেই দুরাত্মার হস্তে যমভবনে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার পাক বলিল যে "নৌকার কেহই বাঁচে নাই।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম যে, "অসম্ভব; কারণ নৌকার মধ্যে কয়েকটি বালক ছিল, তাহাদিগকেও কি মারিয়াছে?" পাচক মাথা নাড়িয়া কহিল যে, "আপনি ও বেটার চরিত্রের কথা জানেন না, তাহার নিকট কাহারও অব্যাহতি নাই।"

মনোহরের আর এক গুরুতর দোষ ছিল, তাহার রিরংসা অতি প্রবল ছিল। এই অধর্ম্ম প্রবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত তাহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। অধিক কি বলিব, বাঞ্ছিত পাত্রী সহজে সম্মত না হইলে, মনোহর তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলাৎকার করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা ভীরু স্বভাববশতঃ বিশেষ জাতি যাওয়ার এবং লজ্জাব ভয় ও পর্য্যাপ্ত সাক্ষী সাবুদ না পাওয়ার সম্ভাবনায়, গায়ের ঝাল গায়ে মরিতে দিত। প্রতিকারের অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, কেবল পরমেশ্বরকে তাহাদিগকে এই পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে ডাকিত।

মনোহরের বিলক্ষণ ভাগ্যবল ছিল; কারণ তাহার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি এমন দুই পুলিশ থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া যদৃচ্ছারূপে দুষ্কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইত? কৃষ্ণনগরের হাকিমেরাও মনোহরের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং মন্ট্রেসর সাহেব একজন অতি তেজস্বী ও তীক্ষ্ণ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনিও এই দুরাত্মাকে ফাঁদে ফেলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও মনোরথ-সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। জজ ব্রাউন সাহেবের দ্রব্যাদির নৌকা লুঠ করার পর হইতে তাঁহারও মনোহরের উপর কোপ ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে দণ্ডনীয় করার উপায়াভাবে কেবল উপলক্ষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এইরূপে কি অধিবাসী, কি পুলিশ আমলা, কি হাকিম, মনোহর সকলেরই বিরক্তিভাজন হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ন্যায় সে সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া গাত্রে ফুঁ দিয়া বেড়াইত। প্রথমে আমি মনোহর সম্বন্ধে এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, ইহার মধ্যে অনেক রঞ্জিত বৃত্তান্ত বলিয়া সন্দেহ করিতাম, কিন্তু পশ্চাতে আমার এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, প্রত্যুত তখন ভাবিলাম, যে আমি মনোহরের সমুদয় দুশ্চরিত্রের কথা শুনিতে পাই নাই!

পূজার সময় আমার থানায় যে দুই নৌকার ডাকাইতি হইল, তাহাও মনোহরের কার্য্য বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল এবং রামকুমার প্রভৃতি অনেকে মনোহরকে কোন কৌশলে এই দুই ঘটনার উপলক্ষে ধরিয়া আনিয়া প্রচুররূপে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিতে বারম্বার পরামর্শ দিল, যে তাহা হইলে মনোহর কিছুকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত থাকিবে; কিন্তু আমি নূতন কর্ম্মচারী এমন যথেচ্ছাচারী অন্যায় কার্য্য করিতে আমার সাহস হইল না। তাহা দেখিয়া আমার পরামর্শদাতা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, যে এমন ভীত হইয়া কার্য্য করিলে আমি কখনই ভালরূপে দারোগাগিরি করিতে পারিব না।

যাহা হউক এইরূপে রাসপূর্ণিমার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাসপর্ব্বে শান্তিপুরে যেমন রঙ্গ-তামাসা এবং বহু লোকের সমাগম হয়, নবদ্বীপেও এই পূর্ণিমার পটপূজা উপলক্ষে সেইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। নবদ্বীপের পটপূজা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। নামে পটপূজা কিন্তু বাস্তবিক ইহা নানাবিধ প্রতিমার পূজা। দশভূজা, বিন্ধ্যাবাসিনী, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হয়। নদীয়া, বুঁইচপাড়া ও তেঘরিয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই এক একখানি করিয়া প্রতিমা হয়। পটপূজা কোন ব্যক্তি কিম্বা গৃহস্থ বিশেষের খাস পূজা নহে, প্রত্যেক পল্লীতে বারোইয়ারি স্বরূপ এই পূজা হয়, এবং ইহাতে বড় ছোট সকল অধিবাসীগণেরই উৎসাহ থাকে। আমার পাড়ার প্রতিমা শ্রেষ্ঠ হইবে বলিয়া সকলেরই ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, এবং বস্তুত সকল প্রতিমাই সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হয়। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কুমার কারিকরেরা অতি প্রসিদ্ধ, এবং স্ত্রীপুরুষ অনেকে ডাকের সাজ প্রস্তুত করার কার্য্যে অতিশয় নিপুণ। আমি শুনিয়াছি যে টোলের অধ্যাপক অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও সখ করিয়া প্রতিমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। সুতরাং অন্য স্থানে লোকে যাহা বহুব্যয়ে সমাধা করিতে পারে না, তাহা নবদ্বীপ-অধিবাসীগণ স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করে। পটপূজার প্রতিমাগুলি অন্যস্থানের প্রতিমা অপেক্ষা অধিক উচ্চ এবং অনেক পুত্তলি সমবেত; কিন্তু তথাপি ঐগুলির এক বিশিষ্ট গুণ আছে যে, প্রতিমাগুলি অত্যন্ত হালকা এমন কি ৫/৬ জন মজুরে তাহা স্কন্ধে করিয়া নাচাইতে পারে।

নবদ্বীপের পটপূজা দেখিতে বিশেষ প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন অনেক দূর হইতে লোক আইসে। কেবল তামাশা দেখিবার নিমিত্ত নহে, এই উপলক্ষে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় পবিত্র নবদ্বীপে গঙ্গাস্থান করার মানসেও বহু লোকের সমাগম হয়। অনেকে আবার নৌকায় আসিত এবং এই পূণ্যস্থানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া বিসর্জ্জনান্তে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইত। এই পর্ব্ব দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের বারাঙ্গনারা অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত

হইয়া নৌকাযোগে আসিত এবং তাহাদের অলঙ্কারের প্রতি দস্যুদিগের বিশেষ প্রলোভন জন্মিত। ইতিপূর্ব্বে বেশ্যারা নবদ্বীপের ঘাটে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে চলিয়া যাইত কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ মনোহর ইহাদিগের নৌকা আক্রমণ করাতে, তাহারা বিসর্জ্জনের পরক্ষণেই নৌকা খুলিয়া কৃষ্ণনগর গমন করিত; এবং থাকিবার আবশ্যক হইলে রাত্রিকালে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া বাস করিত। দারোগাও সেই কারণে ঘাটের চৌকীদার দ্বারা যাত্রীদিগকে সময়শিরে নৌকা লইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতেন।

এতাদৃশ সময়ে, পটপূজার বিসর্জ্জনের দিন উপস্থিত হইল। যে সকল স্থানে বহু প্রতিমা হয়, তাহার সর্ব্বত্রই বিসর্জ্জনের দিবস কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে দর্শকদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সমুদয় প্রতিমা আনিয়া একত্রিত করা হয় এবং ইহাকে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রতিমার আড়ঙ্গ কহে। পটপূজার প্রতিমার আড়ঙ্গ নবদ্বীপের পোড়া-মা তলা, কাঁসারী শড়ক প্রভৃতি স্থানের রাস্তায় বেলা ২ ||০প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। বলিবার আবশ্যক নাই, যে এই আড়ঙ্গ দেখিতে অধিক ভীড় হয় এবং শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারীরা তথায় উপস্থিত থাকেন। আমি সেই চিরপ্রথা অনুসারে আমার চারিজন বরকন্দাজ ও কতকগুলি চৌকীদার লইয়া আড়ঙ্গে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে কখনও এই তামাশা দেখি নাই। শান্তিরক্ষার প্রতি আমার যত না দৃষ্টি ছিল, তদপেক্ষা প্রতিমার গঠন ও কারুকার্য্য দেখিতে আমার অধিক মনোযোগ হইল।

এমন সময় আমার সঙ্গী একজন চৌকীদার বলিয়া উঠিল যে "এই দেখুন মনোহর যাইতেছে" এবং পথের যে ধারে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহার বিপরীত দিকে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সে একজনকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ দ্বারা তাহাকে ডাকিয়া আনাইলাম। মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম, তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; বোধহয়, আরও সুখ-স্বচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ; কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকর দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষস্থল; পুষ্ট বাহুযুগল; কোমর চিকন; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণবিশিষ্ট; গলদেশ মোটা ও খাটো যাহাতে পারসী ভাষায় 'কোতা গর্দ্দান' বলে। চক্ষু ছোট, পিট্ পিট্ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। হঠাৎ দেখিলে মনোহরকে শ্রীযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহার কলুষিত অন্তরের

প্রতিভা মুখে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইত। কথা কহিতে দেখিলাম, যে তাহার দন্তে মিশির কালিমা আছে এবং উপর পাটির মধ্যস্থিত দন্ত দুইটির প্রত্যেক দন্তে পাশাখেলার পাষ্টিতে যেরূপ গোল ছক্‌কাটা থাকে, সেইরূপ এক একটি ছক্‌-কাটা রহিয়াছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই ধুতি, গায়ে চাদর এবং পায়ে নাগরা জুতা। তখন ইংরাজী জুতোর অধিক চলন ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মনোহরের পায়ে স্প্রিংওয়ালা জুতা দেখিতাম। মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাবভঙ্গীতে বোধ হইল যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কারণ গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।

যে পর্যন্ত আমি মনোহরকে চক্ষে দেখি নাই, সে পর্য্যন্ত আমি মনে মনে একটা কিম্ভুতকিমাকার ব্যক্তি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং আরও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যে তাহার সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হইলে, আমি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিব। কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের সেই ভাব দৃঢ় রহিলনা; মনে হইল, যে এমন সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হঠাৎ বিনাকারণে গালিগালাজ করা কিম্বা অপ্রিয় বাক্য বলা, আমার পক্ষে ভদ্র ব্যবহার হইবে না; অতএব আমি তাহাকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া আমার থানার এলাকার মধ্যে দৌরাত্ম্য না করিতে অনুরোধ করিলাম; তাহাতে সে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর করিল, যে তাহার শত্রুরা আমার নিকট তাহার নিন্দা করিয়াছে, সে কোন্‌কালে ঘি খাইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনও তাহার হাতে আছে, ফলে সে এখন কোন কুকর্ম্ম করে না। এইরূপ অল্প কয়েকটি কথা কহিয়া সে পুনরায় আমাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। মনোহরকে আমি সহজে ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া, আমার পারিষদগণ আমার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইল। তাহারা কহিল, যে মনোহর ভাল মানুষের যম এবং তাহার প্রতি আমার এইরূপ শান্ত ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই সে অদ্য রাত্রে, না হয় শীঘ্র পুনরায় আমাকে কষ্টে ফেলিতে ত্রুটি করিবে না। আমি তাহাদের কথার কোনও উত্তর না দিয়া নবদ্বীপের পুরাতনগঞ্জের ঘাটে যাত্রীদিগের নৌকা সকলের রক্ষার জন্য ঘাটের চৌকীদারকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক থানায় প্রত্যাগমন করিলাম। পথে ভাবিলাম যে অদ্য এবং আর কয়েক রাত্রিতে পূর্ব্ববৎ রোঁদ পাহারা দিতে আরম্ভ করিব। কিন্তু থানায় সন্ধ্যার পরে পদাপর্ণ করিবামাত্রই শুনিলাম, যে বাজারের একটি বেশ্যা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং সেই ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সমাধা করিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, আমার বাঞ্ছিত চৌকী পাহারা দেওয়া

আর সে রাত্রিতে ঘটিয়া উঠিল না। অধিক রাত্রিতে শয়ন করাতে শীঘ্রই অঘোর নিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ অবিচ্ছিন্নরূপে নিদ্রা যাইতে পারিলাম না, কারণ শেষ রাত্রিতে আন্দাজ ৩টার সময় আমার শয়নকক্ষের বাতায়নে কয়েকটি লাঠির আঘাতের শব্দ শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আঘাতকারী কহিল যে সে পুরাতনগঞ্জের চৌকীদার, ঘাটে একটা গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে আমাকে অবগত করিতে আসিয়াছে। "গোলমাল" ভিন্ন সে আর কোন কথা খুলিয়া না বলাতে, আমার অনুভব হইল যে পুরাতনগঞ্জ পল্লীতেই অনেক যাত্রী আসিয়া বাস করে এবং বোধ হয় তাহাদের আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ হেতু গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, বিশেষ আমার নিদ্রার তরুণ অবস্থা কাজেই আমি আর তথ্য না লইয়া, থানা হইতে একজন বরকন্দাজ লইয়া যাইতে চৌকীদারকে আদেশ করিয়া, পুনরায় নিদ্রায় বিহ্বল রইলাম। প্রাতে থানায় যাইয়া যে সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে আমি এককালে বুদ্ধিহারা হইলাম। শুনিলাম, যে ঘাট হইতে সন্ধ্যার পরে সকল যাত্রীর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন চারিখানা মালবোঝাই নৌকা ঘাটে ছিল এবং তাহার সকল নৌকার চড়ন্দার ও অধিকাংশ মাঝি-মাল্লা গ্রামের মধ্যে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে যাইয়া শয়ন করিয়াছিল। এইরূপে কোনও নৌকা জনশূন্য এবং কোনও নৌকায় দুই-একজনমাত্র মনুষ্য ছিল। ইহার মধ্যে এক নৌকা জাহাজের তলার পুরাতন তামার চাদরের চালান লইয়া কলিকাতা হইতে ডাঁইহাট মেটিয়ারি গ্রামে যাইতেছিল। নৌকায় কেবল তিনজন মাল্লা শয়ন করিয়াছিল। দস্যুরা তাহাতে আরোহণ করিয়া রশি কাটিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে যাইবার পরে, মাল্লারা বুঝিতে পারিয়া গোলযোগ উপস্থিত করাতে, ডাকাইতেরা তাহাদের সকলকে খুব প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া গঙ্গার উত্তর পারে নৌকা লাগাইয়া, ১৪টা তামার চাদরের বস্তা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মাল্লা তিনজন সন্তরণ করিয়া পুরাতনগঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং প্রাতে ওপার হইতে নৌকাখানা আনয়ন করে। আমি এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত দিবস মনোদুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিলাম, এবং লজ্জায় কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না, এবং রামকুমার ও অন্যান্য চৌকীদারের ধিক্কারের আশঙ্কায় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপন কক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। কিন্তু এমন অবস্থায় পুলিশ আমলা কতক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে? ঝটিতি ইহার কিছু বিহিত বিধান করা আবশ্যক দেখিয়া বৈকালে পরামর্শের জন্য তাহাদের সকলকে আহ্বান করিলাম। মন্ত্রণার উপসংহারে স্থিরীকৃত হইল, যে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে আমার মনে যে কন্টক ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার পরম শত্রু নিপাতের জন্য

পুলিশ আমলার প্রচলিত ব্যবহারনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমিও দেখিলাম, যে মনোহর যে চরিত্রের মনুষ্য, তাহাতে তাহার প্রতি তদ্রূপ কঠিন ব্যবহার না করিলে, আমাদের নিস্তার নাই; তথাপি আমি আমার পরামর্শদাতাদিগের একটি প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তাহা এই যে, অপহৃত তামার পাতের ন্যায় আরও অনেক চাদর নৌকায় আছে; তাহার কয়েকখানা তামা লইয়া মনোহরের বাড়ীর কোন স্থানে বাত্রিকালে গোপনে রাখিয়া দিবাভাগে তাহা বাহির করিতে পারিলে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে আমাদের কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। এই প্রস্তাব ভিন্ন আমি রামকুমার চৌকীদারের অন্যান্য সকল কথা গ্রহণ করিলাম। যদিও মনোহরকে এই ডাকাইতি করিতে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী চক্ষে দেখে নাই এবং নৌকায় যে তিনজন নাবিককে মনোহর প্রহাব করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহারাও কোন ব্যক্তি মনোহর চেনে না, তথাপি থানার প্রথম রিপোর্টে তাহার নাম ব্যক্ত থাকা আবশ্যক বিবেচনায়, আমি ঘটনাস্থলের চৌকীদারের নিকট, এই মর্ম্মে এজাহার লইলাম, যে সে মনোহরকে নৌকা আক্রমণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। চৌকীদারের এই এজাহার ভিত্তি করিয়া আমি শান্তিপুরের ডিপুটীবাবুর ও কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া মনোহরকে ধৃত করিবার উদ্‌যোগ কবিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, যে চরমে মনোহরকে সম্পূর্ণরূপে অপরাধী করিতে না পারিলেও, যদি তাহাকে আমি থানায় আনিয়া কিঞ্চিৎ প্রহার দিয়া শান্তিপুর কিম্বা কৃষ্ণনগর প্রেরণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার মনষ্কামনা অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে; কারণ আমি জানিতাম যে ঈশ্বরবাবু এবং মন্ট্রেসর সাহেব উভয়েই এমন কৌশলী এবং দুষ্টদমন পক্ষে এমন উদ্যমশীল, যে মনোহর একবার এই উপলক্ষে তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইলে, শীঘ্র অব্যাহতি পাইবে না এবং আর কিছু না হইলেও দীর্ঘকাল হাজতে ক্লেশ পাইবে এবং তাহা হইলে আমরা অন্তত সেই কাল পর্য্যন্ত শান্তিভোগ করিতে পারিব এবং মনোহরও কিছু শিক্ষা পাইয়া আসিবে।

এইরূপ অবধারণ করিয়া অন্যূন ৫০জন উৎকৃষ্ট চৌকীদার লইয়া ঘটনার তৃতীয় রাত্রিতে, রাত্রি অনুমান তিন প্রহরের সময়, মনোহরকে ধৃত করিতে থানা হইতে যাত্রা করিলাম। নৈশ গগনের তিমিরাচ্ছাদন দূরীভূত হওয়ায় প্রভাতের চিহ্ন কেবলমাত্র দেখা যায়, এমন সময় আমরা মনোহরের গ্রামের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রহরী স্বরূপে আমার পালকির পার্শ্বে যে একজন বরকন্দাজ যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, যে "দেখুন মহাশয় সম্মুখস্থিত পথের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে একটা শৃগাল যাইতেছে, দেখিয়া প্রণাম করুণ নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।" ইংরাজী পড়িয়া যাত্রার শুভাশুভ চিহ্ন সকল

অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম, তথাপি মনুষ্যের মনে স্বকাম-সিদ্ধির জন্য স্বভাবতঃ এমনই আকিঞ্চন এবং আগ্রহ যে "মঙ্গল হইবে" বাক্য কর্ণকূহরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি উঠিয়া বসিলাম এবং পালকির শার্শির মধ্যে দিয়া দৃষ্টি করাতে, যথার্থই একটা শৃগাল আমাদের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। "বামে শব শিবা নারী" ইত্যাদি বচনটা মনে পড়িল, কিন্তু শৃগালকে প্রণাম করিলাম না, কেবল বরকন্দাজকে বলিলাম, "দেখা যাইবে কেমন মঙ্গল হয়।" ক্ষণেক পরেই বেহারা আমাকে একটা বাড়ীতে নামাইয়া দিল। যে কিঞ্চিৎ আলোক বিকশিত হইয়াছিল, তদ্বারা দেখিতে পাইলাম, যে বাড়ীতে তিন চারিখানা অনুচ্চ ছোট চালাঘর এবং চতুর্দ্দিক জঙ্গলে আবৃত; উঠানে মধ্যখানে একটা ঢেঁকি স্থাপিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে রামকুমার চৌকিদার আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, যে এই মনোহরের বাড়ী কিন্তু সে কোন্ ঘরে শয়ন করে, তাহা আমি জানি না। সেই সংবাদ আমরা একজন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট অবগত হইলাম। অমনি সকলে লম্ফ দিয়া সেই ঘরের দিকে ধাবমান হইয়া উচ্চ স্বরে "খোল খোল্" বলিয়া দ্বারের কবাটে লাথি ও ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল। মনোহর নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিল এবং তাহার মস্তকে যে এই বিপদ পড়িবে তাহা সে মনেও ভাবে নাই, ভাবিলে বোধ হয়, আমরা বাড়ীতে তাহার দেখা পাইতাম না। মনোহর শশব্যস্তে দ্বার খুলিবামাত্র কতকগুলি চৌকীদার একত্রে, ঝড়ের বেগে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মনোহরকে কেহ চুলে, কেহ হস্তে, কেহ পদদেশে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে শূন্যভাবে তাহাকে উঠানে আনিয়া ফেলিল, কিন্তু প্রহার থামিল না। তাহার লম্বা চুলে ধরিয়া মাটির মধ্যে তাহাকে কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরাইতে লাগিল এবং যাহার যে ইচ্ছা সে সেইরূপ তাহার শরীরে আঘাত করিল। আমি বোধ করি যে আমরা মনোহরকে নিদ্রিত অবস্থায় এবং অপ্রস্তুতভাবে পাইয়াছিলাম বলিয়াই চৌকীদারেরা তাহাকে এইরূপ লাঞ্ছনা করিতে ক্ষমবান হইয়াছিল, নচেৎ তাহার হস্তে লাঠি থাকিলে এবং অনাবৃত স্থান পাইলে মনোহর আমাদিগকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইলাম। আমার বোধ হইল, যে আর কিছুক্ষণ তাহার উপরে এইরূপ নির্দ্দয় আঘাত করিলে, তাহার প্রাণে বাঁচা কঠিন হইবে সুতরাং হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে। এই বিবেচনায় আমি আমার সঙ্গীগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাহারা সকলে একমুখে বলিয়া উঠিল যে "আমরা আপনার কথা শুনিব না। মনোহরকে মারিয়া আমরা ফাঁসী যাইব। ও ব্যাটা আমাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ না পাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না। উহাকে আমরা কখনও পাই নাই, আজ

ভাগ্যবলে পাইয়াছি কখনও ছাড়িব না!" আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে অবশেষে ক্ষান্ত করিতে পারিলাম।

এই সময় মনোহরের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাহার মস্তকের সুন্দর লম্বা কেশ ও পরিধানের নূতন বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সমস্ত শরীর ধুলিলুণ্ঠিত, প্রহারের আঘাতে অনেক স্থানের চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, রক্তও পড়িতেছে এবং ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত একগণ্ডুষ জল অতি কষ্টে চাহিতে পারিল। এই দুরবস্থায়ও তাহাকে অবশেষে উঠানের মধ্যস্থিত ঢেঁকির সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়া অপহৃত দ্রব্য সমস্তের অনুসন্ধানে তাহার ঘরবাড়ী বিচরন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পূর্ব্বস্থলীর থানায় রীতিমত সংবাদ দিয়া সহায়তার নিমিত্ত যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইলাম। আমরা মনোহরের গৃহে এবং তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানে অন্বেষণ করিয়া মালের কোনও ঠিকানা পাইলাম না। কেনই বা পাইব? মনোহর এমন অপরিপক্ক চোর নহে, যে সে তাহার অপহৃত দ্রব্য সমস্ত ঘটনার অল্পকাল মধ্যে তাহার নিজগৃহে কিম্বা গৃহের নিকট কোনও স্থানে রাখিবে। আমি অনভিজ্ঞ দারোগা, মনোহরের খানাতল্লাসী করিয়াছিলাম, অন্য একজন কর্ম্মক্ষম পুলিশ আমলা হইলে, সে কখনই এইরূপ বৃথা খানাতল্লাসী করা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। বিফল খানাতল্লাসী করিয়া কতক্ষণ পরে আমি পুনরায় যে স্থানে মনোহর বন্দী ছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে পূর্ব্বস্থলী থানার জামাদার আমার প্রেরিত সংবাদমতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই জমাদার একজন আদর্শ পূর্ব্ব পুলিশ আমলা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। দীর্ঘকায়, স্থূলকার খোট্টা। গৌরবর্ণ, আকর্ণ ব্যাপ্ত গুম্ফ এবং তদুপযুক্ত গালপাট্টা। পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে আঁটা কাছা বিশিষ্ট নবধৌত পাইড়াদার ধুতি, গায়ে খোট্টাই আঙ্গরাখা এবং মস্তকে একটি কাপড়ের সাদা টুপি। দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে দ্বারবান্ পরে থানায় বরকন্দাজ এবং অবশেষে জমাদার হইয়া আধো আধো বাঙ্গালা ভাষা কহিতে শিখিয়াছে, কিন্তু দন্ত্য সয়ের উচিত উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে। গরীব দুঃখীর বিশেষ ভদ্রলোকের যম, কিন্তু মনোহরের ন্যায় দুগ্ধ-প্রদ চোর ডাকাইত তাহার স্নেহের পাত্র। পুলিশের কার্য্যে মূর্খ হইলেও ধনোপার্জ্জন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত। দুই চারি কথায় আমাকে সম্বোধন করিয়া জমাদার মনোহরের নিকট গমন করিল এবং মনোহর যে ঢেঁকিতে বাঁধা ছিল, তাহার ধূলা একজন চৌকীদারের বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করত, মনোহরের পার্শ্বে ঢেকির উপরে উপবিষ্ট হইল। মনোহরের অবস্থা দেখিয়া মনোহরকে শুনাইয়া অনেক আক্ষেপ

করিবার পরে, মনোহর সম্বন্ধে সে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে,মনোহর মন্দ চরিত্রের মানুষ নহে এবং পূবধুলের থানায় তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। জমাদারের বিশ্বাস এই যে, মনোহর ডাকাইতি করিয়া থাকিলে সে তাহা গোপন করিবে না, অতএব তাহার বন্ধন মোচন করিতে জমাদার অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করাতে, সে বিরক্ত হইয়া, আমি ছোকরা দারোগা, পুলিশের কার্য্য জানি না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

জমাদার চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই রামকুমার চৌকীদার আমাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া অনতিদূরে এক নির্জ্জন স্থানে এক অর্দ্ধবয়স্ক মানুষ্যের নিকট উপস্থিত করিল এবং বলিল যে "এই ব্যক্তির নাম হলধর ঘোষ, মনোহরের মাতুল, আপনি যদি অভয় প্রদান করেন এবং বলেন, যে ইহাকে রক্ষা করিবেন, তাহা হইলে সে এই ডাকাইতির সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিবে।" অমৃতে কাহার অরুচি? আমি তৎক্ষণাৎ হলধরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলাম, যে যদি সে অপহৃত মালের সন্ধান করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিব। হলধর আমার এই কথায় বিশ্বাস কবিয়া ব্যক্ত করিল যে,—

"পটপূজার বিসর্জ্জন দেখিতে যাইয়া মনোহর নবদ্বীপের ঘাটে কৃষ্ণনগরের বেশ্যাদিগের দুই তিনখানা নৌকা দেখিয়াছিল এবং তাহা লুট করিবার অভিলাষে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমি (হলধর) এবং অন্য ৮ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধরাত্রের পরে, সকলে গঙ্গার কাছাড়ের ছায়া অবলম্বন করিয়া, লোকে দেখিতে না পায় এমনভাবে, পুরাতনগঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, যে সকল নৌকা আক্রমণ করার নিমিত্ত তাহারা আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একখানও সেই স্থানে নাই; তাহাতে মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সম্মুখস্থ প্রথম বোঝাই নৌকায় প্রবেশ করিল এবং নাবিকদিগকে মধ্যগঙ্গায় ফেলিয়া ওপারে যাইয়া, তামার বস্তা সকল নৌকা হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু বস্তাগুলি অতিশয় ভারী দুইজন বলবান মনুষ্য না হইলে একটি বস্তা নাড়িতে পারিবে না দেখিয়া মনোহর নৌকা হইতে চরে নামিল এবং তথায় ইতস্ততঃ করিয়া অল্প দূরে একখানা ধীবরের খালি নৌকা দেখিয়া, তাহা বোঝাই নৌকার সন্নিধানে আনয়ন করত তাহাতে ১৪খান বস্তা ও একটা বৈঠা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্বস্থলী গ্রামাভিমুখে চালাইতে লাগিল। কিন্তু বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে রাত্রিশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়া, নদীর ধারে চরের উপরে এক জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে আমরা অনেক কষ্টে অপহৃত বস্তাগুলি উঠাইয়া গোপন করিয়া রাখিলাম এবং খালি নৌকায় আমাদের

গ্রামের নিকট উত্তরণ করিয়া নৌকাখানা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার পর, মনোহর তাহার একজন পরিচিত ব্যক্তির নৌকা সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় আমাদের সকলকে লইয়া সেই গোপনীয় স্থান হইতে অপহৃত বস্তুগুলি নৌকায় উঠাইয়া পূর্ব্বস্থলীর এক ঘাটে উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে আমরা দুই দুই জনে এক একটা বস্তা মাথায় করিয়া, গোপাল পোদ্দার নামক একজন সুবর্ণবণিকের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম। গোপাল পোদ্দার মনোহরের "থাঙ্গিদার"। মনোহর যখন যেখানে যাহা অপহরণ করে তাহা গোপাল পোদ্দারের নিকট লইয়া যায় এবং গোপাল তাহার বিনিময়ে মনোহরকে নির্দ্ধারিত হারে টাকা দেয়। আমরা গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিয়াছি কিন্তু সে তাহা লইয়া কি করিয়াছে, কিম্বা কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় বলিতে পারি না, আপনি সেই বাড়ীতে তল্লাস করিলেই পাইতে পারিবেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে পটপূজার তামাশা দেখিতে আমাদের তিনজন কুটুম্ব আসিয়াছিল তাহারাও আমাদের সঙ্গে ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল এবং মনোহরের নিকট অপহৃত মালের অংশ পাওয়ার লোভে তাহারা এখনও মনোহরের বাড়ীতে আছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আনিলে, তাহাদের দ্বারা আমি একরার করাইয়া দিতে পারিব; কিন্তু আমার নিজের কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে দিব না।"

মনোহরের বাড়ীর অন্য এক ঘরে প্রথমেই চৌকীদারেরা দুই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাহাদিগকে হলধরের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র তাহারা স্বচ্ছন্দে হলধরের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্ত দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে লিখাইয়া দিল, কিন্তু বলিল যে, তাহারা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে না, কারণ তাহারা পূর্ব্বে কখনও পূর্ব্বস্থলীতে আসে নাই, সুতরাং পথঘাট চিনে না। এমতাবস্থায় হলধর নিজেই গোপাল পোদ্দারের বাড়ী দেখাইয়া দিতে আমাদের সঙ্গে চলিল।

মনোহর যে স্থানে আবদ্ধ ছিল, সেই স্থানে তাহাকে ও তাহার কুটুম্বদ্বয়কে উচিত প্রহরীর জেম্মায় রাখিয়া, আমরা সকলে গোপাল পোদ্দারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনোহরের বাড়ী হইতে গোপাল পোদ্দারের বাড়ী যাইতে পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। সেইখানে দেখিলাম যে পথের ধারে থানার দারোগা একটি রূপা বান্ধান হুকা হাতে করিয়া কয়েকজন লোক সঙ্গে (বোধ হয়, আমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া) আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক আকিঞ্চন করিলেন কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আমার লক্ষিত স্থানাভিমুখে ধাবমান হইলাম।

থানা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে হলধর একটি বাড়ীর সম্মুখে আমাদিগকে আনিয়া তাহা গোপাল পোদ্দারের বাড়ী বলিয়া দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ী, বাহিরে একটি একতালাঘরে বস্ত্রের একখানি দোকান আছে। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। চতুর্দ্দিকে দ্বিতল চকমিলান কোঠা, নিম্ন তালার সম্মুখে এক উচ্চ প্রশস্ত দৌড়দার রোয়াক এবং সমস্ত উঠান টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। উচ্চ শ্রেণীর একজন গৃহস্থের বাড়ী বোধ হইল। এমন বিত্তশালী ব্যক্তি চোরামালের কারবারে লিপ্ত থাকিবে,তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত ইহাও ভাবিলাম, যে হয়ত এই ঘৃণিত ব্যবসাই গোপালের ধনের মূল। যাহা হউক মনে বড়ই সন্দেহ হইল। কিন্তু যে স্থলে একজন চোর তাহাব নাম উচ্চারণ করিয়াছে এবং সেই কথায় আমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি, তখন দেখিলাম যে আইন অনুসারে তাহার খানাতল্লাসী না করিলে আর উপায় নাই।

আমি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে কয়েকবার গোপাল পোদ্দারের নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিলাম। কিন্তু কাহারও কোন উত্তর পাইলাম না। বাড়ী জনশূন্য বোধ হইল। অতএব অল্পক্ষণ বিলম্ব করিয়া গ্রামের তিনজন প্রজা আনাইয়া আমি গোপাল পোদ্দারের খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবেচনা করিলাম যে এই কার্য্যে আমার সঙ্গী সকলকে অনুমতি করিলে গৃহস্থিত অনেক মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় হইবে, অতএব সকলকেই উঠান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল জমাদার ও ছিরূ চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া, আমি প্রথমে নিম্ন তালার কুঠরী সমস্ত পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে ঘরে অর্দ্ধখণ্ড ব্যাপিয়া প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত খড়ের পোয়াল স্তুপ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অপর পার্শ্বের এককোণে কয়েকটি স্ত্রীলোক একত্রে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দৃষ্টে স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম। স্ত্রীলোক, বিশেষ এমন শঙ্কাযুক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোকগুলিকে দেখিয়া আমি এককালে দ্রব হইয়া পড়িলাম, এবং তাহাদের শঙ্কা দূর করিবার মানসে আমি তাহাদিগকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া করুণ বাক্যে বলিলাম, যে আমি কেবল চোরাদ্রব্যের অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি স্ত্রীলোক কিম্বা নির্দ্দোষ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে আসি নাই, অতএব তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রতি কাহাকেও কোন কুব্যবহার করিতে এমন কি এই ঘরের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না! এইরূপ বক্তৃতা ঝাড়িয়া, আমি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম এবং কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে তাহার মধ্যে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলাম। আমি যেমন বর্ব্বর, তেমনই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিলাম। বেণের

মেয়েরা যে সেই স্থানে চোরামালের প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আছে, তাহা আমার "শিক্ষা বিভ্রাটের" ফলে, মনে উদয় হইল না। অবলা নারী দেখিয়া কেবল তাহাদের মঙ্গল কামনাতেই আমার চিত্ত ব্যাপৃত রহিল, প্রতিকূল চিন্তা কিম্বা সন্দেহ আসিয়া প্রবেশ করিতে তাহাতে স্থান পাইল না। এক্ষণে তাই ভাবি, যে যদি তখন রামকুমার কিম্বা ছিরু চৌকীদার সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে সেই দিবস আমার নাক কাণ রাখিয়া আসিতে হইত।

এইরূপ আমি নীচের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া কোন স্থানে আমরা বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। হতাশ চিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোক-শূন্য একটা প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট দ্বার দেখিলাম। আমার সঙ্গী ছিরু চৌকীদার তাহা হস্ত দ্বারা ঠেলিযা খোলাতে তন্মধ্যে একটা অন্ধকার চোরাকুঠী আবির্ভূত হইল। ছিরু এই কুঠুবী মধ্যে তাহার হস্তস্থিত একটা শড়কি চালাইয়া দেওয়াতে "মারিও না আমি বাহিরে যাইতেছি" বলিয়া এক ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য বাহির হইয়া লম্ফ দিয়া ভূমিতে নামিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গোপাল পোদ্দার বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আমি তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিলাম, ধরিয়া বোধ হইল যে তাহার শোণিত জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর শিরার রক্তের ন্যায় দ্রুতবেগে বহিতেছে এবং গাত্রের চর্ম্মও সেইরূপ উত্তপ্ত এবং আতঙ্কে শরীর কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাকে প্রহার করিব না বলিয়া অভয় প্রদান করত বাহিরে আসিলাম। গোপাল পোদ্দার হ্রস্বচ্ছন্দ মনুষ্য, ফুট গৌরবর্ণ, তাহার হস্ত-পদের গঠন সুন্দর ও মুখশ্রীও উত্তম। যদিও কৃশ তথাপি তাহার অস্থি ও শিরা সকল অদৃশ্য। বয়স চল্লিশের উর্দ্ধ নহে। সহাস্য বদন। এমন ঘোর বিপদের সময়ও সে হাস্য বদনে আমার প্রশ্ন সমস্তের উত্তর দিয়াছিল। জিজ্ঞাসামতে কহিল, যে সে আমাদের আগমনে ভয়ে চোরাকুঠরীর মধ্যে পলাইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু অপহৃত মাল সম্বন্ধে সে এমন কথা মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করিল না, যে তাহার গৃহে নাই। সে যে কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। তাহা এই যে "আমার ঘরে ত অনেক প্রকার দ্রব্য আছে, তল্লাস করিয়া দেখুন, যদি তাহার মধ্যে আপনার কোন জিনিস হয়,তবে আর আমার বলিবার কি আছে?" চোরামাল নাই বলিয়া সে মুখ তুলিয়া আমাকে বলিতে পারিল না। পোদ্দারের কথার ভাবে আমার কিঞ্চিৎ আশার উদয় হইল এবং দ্বিতলের কক্ষগুলি দৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। সেখানেও যাহা দেখিলাম, তাহাতে গোপাল পোদ্দার ও তাহার পরিজনের উপর আমার শ্রদ্ধার আধিক্য হইল। সকল ঘরের দ্রব্যজাত সুন্দররূপে সজ্জিত। কাষ্ঠের এবং ধাতুর তৈজসসমস্ত মার্জ্জিত

এবং ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। যেখানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, তাহা সেই স্থানে রাখা হইয়াছে এবং কোনও ঘরে কোনও অপবিত্র জিনিস নাই। এক ঘরেও একজোড়া বিনামা দেখিতে পাইলাম না; বোধ করি, তাহা অপবিত্র বলিয়া ঘরে স্থান পায় নাই। গোপালের শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারের উপরে প্রভু নিতাই চৈতন্যের এক পট এবং তাহার নিম্নে হরিনামের মালার কারুকার্য্য শোভিত সাটিনের একটি কুথলী ঝুলিতেছে। এই সকল দেখিয়া বোধ করিলাম যে পোদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব। সকল ঘর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোন ঘরেই আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলাম না। তাহাতে মনোভঙ্গ হইয়া নীচে আসিলাম এবং একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া গোপাল যে চোরাকুঠবী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহাব মধ্যে অনুসন্ধান করিতে ছিরূ চৌকিদারকে উঠাইয়া দিলাম। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রান্নাঘরের পার্শ্বে একটা অন্ধকার ঘর দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই ঘরে ঐ এক দ্বার ভিন্ন অন্য দ্বার কিম্বা বাতায়ন ছিল না ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের হস্তে প্রদীপ না থাকিলে বোধ করি তাহার মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি ভালরূপে দেখিতে পাইতাম না। প্রদীপের আলোতে দেখিলাম যে এক প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানা তক্তা হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা দুইজনে সেই তক্তার নিকট দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। ছিরু অন্যমনস্কে তাহার হস্তের শড়কির মাথা একস্থানে দুই তক্তার মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর চালাইয়া দেওয়াতে তাহা কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া একটা দ্রব্যে ঠেকিয়া ঝন্‌ করিয়া উঠিল। ছিরু অমনি আমার হস্তে প্রদীপ দিয়া, একখানা তক্তা টানিয়া অপসারিত করিল এবং তাহার মধ্যে তক্তার দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েকটা বস্তা উপর্য্যুপরি সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ উভয়ে আহ্লাদভরে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক সেই একই সময় রামকুমার চৌকীদার ঐরূপ শব্দে চীৎকার করিয়া আর এক ঘর হইতে আমাদের নিকট ধাবমান হইতেছিল। রামকুমারের লাম্পট্য-দোষ ছিল, সে বেণেদের স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্যে উৎসুক হইয়া অবশেষে আমি যে ঘরে স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া কবাট বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম, সেই ঘরে "মাল" আছে বলিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। কুরুচির ভাষায় সুন্দরী স্ত্রীলোককে "মাল" বলিয়া উক্ত হয়। রামকুমার মাল দেখিবার জন্য সজোরে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রাশে জড়সড় হইয়া কক্ষমধ্যস্থিত খড়ের পোয়ালের স্তূপের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাতে আলগা

পোয়ালগুলি শর্ শর্ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহার মধ্যে আমার আবিষ্কৃত বস্তার ন্যায় কয়েকটা বস্তা ব্যক্ত হইল। আমাদের বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ "মাল" দেখিয়া রামকুমার নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইল এবং আমার সংবাদও অবগত হইয়া, আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। প্রাঙ্গণের চৌকীদারেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ আবিষ্কৃত দ্রব্যের ঘরে, কেহ রামকুমারের ঘরে, প্রবেশ করিয়া দুই-তিনজনে এক একটা বস্তা টানিয়া রোয়াকে আনিল এবং সেইখান হইতে উঠানে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উঠানের শানের উপর প্রত্যেক বস্তার আঘাতে ঝন্ করিয়া শব্দ হইল এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ জন চৌকীদারের উল্লাসোত্তেজিত কণ্ঠ হইতে এককালে এক একটা জয়ধ্বনি উঠিল। এমন একবার নহে। রামে এক, রামে দুই, রামে তিন করিয়া চৌদ্দখানা বস্তার চৌদ্দটা ঝনাৎ শব্দে মিলিত হইয়া চৌদ্দবার জয়ধ্বনি গগনে উঠিল। গগনে উঠিল, পোদ্দারের ইষ্টক-নির্ম্মিত চারিচক ভেদ করিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া ধাবমান হইল। অধিবাসীরা প্রথমে ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোরামাল ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহাদের মনে আনন্দোদ্ভব হইল। ক্রমে দুই-একজন করিয়া এত অধিক লোক উপস্থিত হইল যে, অবশেষে প্রাঙ্গণে তাহাদের স্থানাভাব হইয়া পড়িল। কিন্তু কি দর্শক, কি আমার সঙ্গী চৌকীদার, সকলেই আহ্লাদে প্রফুল্ল। বিশেষ রামকুমার চৌকীদার। সে ইহার মধ্যে কি প্রকারে বলিতে পারি না, এক ছিলাম গাঁজা টানিয়া আসিয়া, আমাকে বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া মুখে "ওমা দিগম্বরী নাচো গো" গীত গাইতে গাইতে সকল চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া অপহৃত বস্তাগুলি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিল।

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কিন্তু নৃত্যের পরক্ষণেই সকলের পেটে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি তাহা শুনিয়া আহারীয় দ্রব্যের জন্য রামকুমারের হস্তে চারি টাকা প্রদান করিলাম। সে টাকা লইয়া বাজারে গেল কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বাজারের কয়েকজন দোকানদার সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইল যে, মনোহরকে ধৃত করাতে এবং গোপাল পোদ্দারের বাড়ীতে চোরামাল বাহির হওয়াতে বাজারে দোকানী পসারীরা অত্যন্ত উপকার বোধ করিয়াছে, অতএব আমি অনুমতি করিলে, তাহারা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনামূল্যে আমার সঙ্গীগণকে জলখাবার দিতে প্রস্তুত আছে। আমি সম্মত হইলাম এবং চৌকীদারেরা সকলে আহার করিতে গমন করিল। তখন আমি গোপাল পোদ্দারের জবাব লিপিবদ্ধ করিলাম। সে কহিল ডাকাইতির কথা সে কিছুই অবগত নহে, কিন্তু মনোহর এই চৌদ্দটা বস্তা বিক্রয় করাতে, সে তাহার

মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থলীর থানার সেই জমাদার পুনরায় আমার নিকট আসিয়া আমাকে এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিল যে "আপনি ত আপনার কার্য্য বেশ হাসিল করিয়াছেন, মনোহরকে ধরিয়াছেন এবং মালও বাহির করিয়াছেন, এখন ইচ্ছা করিলে কিছু টাকাও পাইতে পারেন। আপনি যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে এই সকল বস্তাগুলি গোপালের বাড়ীর মধ্যে পান নাই তাহার পিছাড়ার বাগিচার মধ্যে পাইয়াছেন, তাহা হইলে গোপালের পুত্র আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছে।" ইহা শুনিয়া আমি তাহার কথায় কোন উত্তর করা উচিত বিবেচনা করিলাম না।

চৌকীদারেরা আহার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমাদের আহ্লাদের গোলমালের সময় হলধর পলয়ান করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম যে হলধর কর্ত্তৃকই আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি অধিকন্তু তাহাকে নিষ্কৃতি দিব বলিয়া আমি তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম এবং আবশ্যক হইলে যখন ইচ্ছা তাহাকে ধৃত করিতে পারিব, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলাম।

তিনখানা শকটে বস্তাগুলি উঠাইয়া এবং মনোহর ও তাহার দুইজন সঙ্গী ও গোপাল পোদ্দারকে লইয়া আমরা সকলে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বস্থলীর থানার সম্মুখে আসিয়া শুনিলাম যে দারোগা এবং তাহার অধীনস্থ আমলারা কেহ থানায় নাই; বোধ করি, তাহারা থানার নিকট হইতে অন্য জেলার দারোগা আসিয়া চোরামাল ধরিয়া লইয়া যাওয়াতে লজ্জা বিবেচনা করিয়া আমার সহিত দেখা করিল না। পথিমধ্যে দেখিলাম যে গ্রামের অধিবাসীগণ আবালবৃদ্ধবনিতা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকে বিশেষ ব্রাহ্মণেরা আমার মস্তকে যজ্ঞোপবীত ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং সকলে বলিল "যেন ছাড়া না হয়, এই দুরাত্মারা গ্রামে যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে।" ইহাতেই প্রতীয়মান হইল যে মনোহরের দৌরাত্ম্যে গ্রামস্থ সকল লোক জ্বালাতন হইয়াছিল; নচেৎ সে ধৃত হওয়াতে সর্ব্বজনের মনে কেন অসীম আহ্লাদ হইবে এবং সে ফিরিয়া আসিতে না পারে তাহার নিমিত্ত কেনই বা সকলে এমন আকিঞ্চন প্রকাশ করিবে?

অতঃপর আমরা দিবা অবসান সময় নবদ্বীপ পৌঁছছিলাম। সে স্থানেও মনোহরকে দেখিবার নিমিত্ত দুই দিবস পর্য্যন্ত বহু জনতা হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি, খ্যাতনামা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, রত্নবিশেষ কিন্তু স্বল্পায়ু গোলকনাথ ন্যায়রত্ন

প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়েরা, যাঁহারা কখনও থানার ত্রিসীমায় আইসেন নাই, তাঁহারাও সেই দিবস মনোহর ও গোপাল পোদ্দারকে দেখিবার নিমিত্ত থানায় পদার্পণ কবিয়াছিলেন।

তদনন্তর উচিত সময়ে দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য সহিত শান্তিপুর এবং অবশেষে দাওরার বিচাবের নিমিত্ত কৃষ্ণনগর প্রেরিত হইল। জজ ব্রাউন সাহেব মনোহরকে চির নির্ব্বাসনের ও তাহাব দুইজন সঙ্গীকে চৌদ্দ চৌদ্দ বৎসরের ও গোপাল পোদ্দারকে দশ বৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং সদর নেজামত আদালতেও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থির রহিল। এইরূপে নবদ্বীপ অঞ্চলের শান্তির কণ্টক নির্ম্মূল হইল এবং আমার তিনশত টাকা পুরস্কার ও পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি ও সদর থানায় বদলি হইল। কিন্তু মনোহরের কীর্ত্তি এখনও সমাপ্ত হইল না। আরও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে।

সদর নিজামতের হুকুম আসার পর রীত্যনুসারে মনোহর আলিপুরের জেলখানায় প্রেরিত হয় ও তথা হইতে কযেক মাস পরে ৫০/৬০ জন পঞ্জাবী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দায়মালী কয়েদীর সঙ্গে, নির্ব্বাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশের থায়েটমিউ নগরে ক্ল্যারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্রমধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কারাবাসীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক বিপ্লব উপস্থিত করে এবং জাহাজের কাপ্তান ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার নিমিত্ত কয়েকজন দেশী খালাসীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন রাজার রাজ্যে জাহাজ চালাইতে আদেশ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ এক রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানওয়ারের কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অকয়েব বন্দরে লইয়া যায় এবং তথায় মনোহর প্রভৃতির বিচার হইয়া ফাঁসী হয়।

নীলকুঠি

প্রস্তাবনা

আমি এই প্রবন্ধে যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম নব্য পাঠকদিগের তাহা সুন্দররূপে বুঝিবার জন্য ভূমিকা স্বরূপে সেকালের নীলকরদিগের চরিত্রের এবং কার্য্যপ্রণালীর সংক্ষেপ বিবরণ আবশ্যক।

বঙ্গের প্রায় সকল প্রদেশেই নীল জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলাই পূর্ব্বে নীলের গৌরবের স্থান ছিল। নীল উত্তম এবং অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ঐ সকল স্থানে সাহেবদিগের অনেক কুঠি স্থাপিত ছিল এবং বিস্তর টাকাও ব্যয় হইত। সাহেবেরা যে প্রণালীতে নীল প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে কোনও একজন সাহেবের নিজের টাকা দ্বারা কুঠী কিম্বা কনসারণ খুলিতে সাধ্য হইত না। অল্প কিম্বা অধিক সংখ্যায় কয়েকটি কুঠী এক অধিকারস্থ হইলেই তাহাকে কনসারণ বলিত, এবং কনসারণ স্থাপনা করিতে না পারিলে ও কার্য্যের সুবিধা হইত না। এইক্ষণে যেমন বহু সাহেব একত্রিত হইয়া আসাম ও কাছাড় প্রভৃতি দেশে চা-বাগিচা খুলিতেছেন, পূর্ব্বেও সেই প্রণালীতে কয়েকজন সাহেবের এক এক কোম্পানী গঠিত করিয়া নীলের কনসারণ স্থাপন করিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ওয়াটসন কোম্পানী অধিক ধনী ও ব্যাপক ছিল। কৃষ্ণনগর জেলায় প্রায় সমস্ত স্থানেই ইহাদের কুঠী ছিল। যদি কেহ এই প্রদেশের বিমানে উঠিয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের স্ত্রীলোকে চটের উরে বড়ি দিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবে কৃষ্ণনগর জেলার মাটির উপরে নীলকুঠিগুলি দৃষ্ট হইত। যাঁহারা বাবু দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নীলকর সাহেবদের

চরিত্রের কেবল দোষের ভাগই জানিতে পারিয়াছেন। ঐ পুস্তকের লিখিত বিবরণ সমস্ত যে নিতান্ত অমূলক তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহা নিশ্চয়, যে নাটকের প্রয়োজনীয় অত্যুক্তি সকল বাদ দিলে দীনবন্ধুবাবুর পুস্তকে অনেক সত্য বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে নীলকর সাহেবদিগের চরিত্রে কোনও প্রশংসা বিষয় ছিল না এবং সকল নীলকরই মিত্রজার বর্ণিত সাহেবের ন্যায় পামর এবং অত্যাচারী ছিলেন, তাহা নহে। নীলকর সাহেবদিগের যেমন দোষ ছিল, তেমন পক্ষান্তরে অনেক গুণও ছিল এবং তাঁহাদের প্রাধান্যের সময় তাঁহারা দেশের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। অনেক নীলকর যেমন নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিল, তেমন অনেকে খুব দয়াশীল এবং ধর্ম্মভীত ছিলেন। আমি নাটক কিম্বা কবিতা লিখিতেছি না, সাদা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য; অতএব আমি পক্ষপাত না করিয়া নীলকর সাহেবদিগের দোষ ও গুণ সমভাবে বিবৃত করিতে বাধ্য এবং তাহা সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য" বলিয়া আমাদের মধ্যে যে চিরপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ঘটিবার দুইটি মূল কারণ ছিল। ঐ দুইটি কারণ দূর করা অসাধ্য না হইলেও নীলের ব্যবসার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমন কঠিন কার্য্য ছিল, যে তাহা প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ধানের ভূমিতেই নীল উত্তম জন্মে এবং ভূমি যত উৎকৃষ্ট হয়, নীলও সেই পরিমাণে অধিক উৎকৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ নীলের ও ধানের চাষ একই সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষকেরা ধানের চাষেরই অধিক পক্ষপাতী, নীলের চাষ করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। কারণ ধানে প্রজার সম্বৎসরের আহার, গরুর খোরাক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয় কিন্তু তাহারা নীলকর সাহেবদিগের নিকট নীলের গাছের জন্য যে মূল্য পাইত, তাহাতে তাহাদের তত্তুল্য লাভ হইত না। বিশেষ সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার দর ছিল না। সাহেবেরা যে একদর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই হারে চিরকাল ধরিয়া, জন্মা-অজন্মার তারতম্য বিবেচনা না করিয়া, প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন, এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামতে স্থিরীকৃত হয় নাই, সাহেবদিগের ইচ্ছামতে স্থির হইয়াছিল, এবং ইহাতে কৃষকদের কখন লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমি সকলে নীলকরেরা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না সুতরাং নীলের প্রতি প্রজার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং পারগপক্ষে তাহারা নীলের চাষ করিতে ইচ্ছা করিত না। দ্বিতীয় কারণ

এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কৰ্ত্তন করিতে হয় কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া তাহা কুঠীতে দাখিল না করিলে, কুঠীর লোকে প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপণ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি বোধ হইত এবং ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকিত।

ধানের জমিতে নীলের ন্যায় পাটও জন্মিয়া থাকে এবং এক্ষণে আমাদের অনেক প্রদেশে প্রজারা ধানের চাষ পরিত্যাগ করিয়া পাটের চাষে প্রবৃত্ত হয়, কারণ কোনও কোনও বৎসর ধান অপেক্ষা পাটে তাহারা অধিক লাভ করে। নীলকর সাহেবেরা যদি সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রজার লাভ হয়, এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কখনও নীলের দুর্গতি হইত না বরং প্রজারা নীল করিতে অগ্রসর হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া সাহেবেরা কেবল প্রজাকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কিসে প্রজা বাধ্য করিতে পারেন, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। মফঃস্বলে আসিয়া সাহেব দেখিলেন, যে জমিদার হইতে পারিলেই প্রজার প্রতি যথেচ্ছা কার্য্য করা যাইতে পারে, অতএব কুঠীর এবং কনসারণের এলাকাস্থিত ভূমির অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারী ক্রয় করা সহজে এবং সর্ব্বদা ঘটিয়া উঠে না দেখিয়া অন্তত ইজারা ও পত্তনী লওয়ার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজদের চরিত্রের এক মহৎ গুণ এই যে, যখন কোন কার্য্য করিতে তাহারা সংকল্প করেন, তখন যে যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সংসাধিত হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। সহস্র ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও, তাহা পরাজয় করিতে উদ্যত হন। টাকার আবশ্যক হইলে তাহা জলবৎ ঢালিতে পারেন।

প্রজাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত সাহেবেরা জমিদারের নিকট হইতে বাহুল্য জমায় এবং বিস্তর সেলামী দিয়া ইজারা এবং পত্তনী লইয়া ভূম্যাধিকারী হইলেন। কাজেই সেকালের মূর্খ প্রজারা সাহেব তাহাদের জমিদার হইয়াছে দেখিয়া ভয়ে সাহেবের বাধ্য হইয়া পড়িল। শুদ্ধ জমিদার হওয়ার বাসনায় নীলকরেরা বাহুল্য ধনক্ষয় করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিত না। নীল করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; ভূম্যাধিকারী না হইলে প্রজা বাধ্য করিতে পারে না এবং প্রজা বাধ্য না হইলেও নীল চাষের সুবিধা হয় না বলিয়াই তাঁহারা জমিদার হইতেন। কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ নীলের চাষ করিতে প্রজাদিগকে বাধ্য করা ভিন্ন,প্রজার প্রতি অন্যরূপ অত্যাচার করা সাহেবদিগের মূল অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কাল সহকারে নীলকরদিগের প্রভুত্ব যতই গাঢ় হইতে লাগিল, ততই অন্যান্য বিষয়ে প্রজাদিগের উপরে দৌরাত্ম্যবৃদ্ধি হইল। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন নীলকরের এত অধিক প্রভূত্ব হইয়াছিল, যে নীলকরের প্রজা নীলকর সাহেবের অনুমতি ভিন্ন

দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে পারিত না। পুলিশের কর্ম্মচারীরাও নীলকর সাহেবের বিনা অভিপ্রায়ে তাঁহার অধিকারের ভিতর কোন দোষী ব্যক্তি ধৃত করিতে পারিত না। ইহার এক বিশেষ কারণ এই ছিল যে প্রত্যেক কনসারণে যে সকল সাহেব মেনেজর অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেন তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতার সদাগর সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং জেলার হাকিমেরা তাঁহাদের কথার উপরে স্বভাবতঃ বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদিগকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই সকল মেনেজর যে অকারণ প্রজাদিগের প্রতি অহিতাচরণ কিম্বা নিকটবর্ত্তী ভূম্যাধিকারীদিগেব প্রতি অহিতাচরণ কিম্বা অযথা ব্যবহাব করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হাকিমদিগের মনে সম্ভবপর বোধ হইত না।

বাস্তবিকও জেমস্ ফরলং প্রভৃতি সাহেবের ন্যায় অনেক মেনেজর উচ্চদরের সাহেব ছিলেন। ইঁহারা সদ্‌বংশজাত, সৎচরিত্রান্বিত এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তি; কোন বিষয়ে সিবিলিয়ন হাকিমদিগের ন্যূন ছিলেন না। অনেক নীলকর অত্যন্ত দাতা ছিলেন এবং তাহাদের দাতব্যতার গুণে জেলার আদালত ফৌজদারীর আমলাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেকালে আমলাদিগের হস্তেই আহেলে মামলা অর্থাৎ অর্থী-প্রত্যর্থীদিগের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। কাজেই আমলা মহাশয়দিগকে খুশী রাখিতে পারিলে অনেক সময় মোকদ্দমায় জয়লাভ করা বড় কঠিন কার্য্য ছিল না। নীলকর সাহেবদিগের দানশক্তির একটি দৃষ্টান্ত দেখিলেই, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা কিরূপে সরকারী আমলাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন।

ওয়াটসন কোম্পানীর শিকারপুর কনসারণের একজন মেনেজর ছিলেন। তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই। তিনি দাতা, ভোক্তা এবং অতি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান সাহেব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন এবং এই কনসারণের অনেক শ্রীবৃদ্ধিও করিয়াছিলেন। শিকারপুরের কুঠী থানা করিমপুরের এলাকাভুক্ত ছিল এবং সেই সময়ে সেই থানায় একজন ব্রাহ্মণ দারোগা ছিলেন এবং তিনি যে কোন কারণে হউক, ঐ সাহেবের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। কিছুকাল পরে, দারোগা করিমপুর হইতে কৃষ্ণনগরের সদর থানায় বদলী হইয়াছিলাম। পূজার সময় কুঠীর নীল প্রস্তুত হওয়ার পরে, সাহেব কলিকাতা যাইতে কৃষ্ণনগরের ঘাটে পিনেস লাগাইয়া জেলার সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিতেছিলেন। সাহেব কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিযা, দারোগা তাঁহাকে সেলাম করিতে গেলেন। দারোগা সাহেবের নিকট কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। সাহেব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং অনেকদিন

যাবৎ তাঁহার সহিত দেখাশুনা হয় নাই বলিয়া তিনি কেবল মিত্রভাবে সাহেবকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব কতক্ষণ তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া কোর্ত্তার জেবের মধ্যে হাত দিয়া একখানা বেঙ্ক নোট টানিয়া আনিয়া দারোগার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে "দারোগা আমি এক্ষণ কলিকাতায় যাইতেছি, অধিক দিতে পারিলাম না, ফিরিয়া যাইবার সময় তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আরও কিছু দিয়া যাইব।" দারোগা উত্তর করিলেন, যে তিনি কিছু পাইবার মানসে আসেন নাই, সাহেব তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেইজন্য তিনি কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন শুনিয়া, শুষ্ক সেলাম করিতে আসিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া দারোগা নোটখানা ফেরৎ দিলেন কিন্তু সাহেব তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনরায় দারোগাকে তাহা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। নোটখানা কতটাকা মূল্যের নোট তাহা সাহেবও বলিয়া দেন নাই এবং দারোগাও তখন খুলিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন না। কিন্তু থানায় পৌঁহুছিয়া নোটখানা বাক্সে বন্ধ করিবার সময় দেখিলেন, যে তাহা একহাজার টাকার নোট। দারোগার মনে হইল, যে সাহেব নিঃসন্দেহে ভুলক্রমে তাঁহাকে এই নোটখানা দিয়াছেন, অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবকে তাহা ফেরৎ দেওয়ার নিমিত্ত পিনেসে প্রত্যাগমন করিলেন। সাহেব দারোগাকে দেখিয়া ভাবিলেন যে দারোগা বুঝি কম টাকা পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়াছে। কিন্তু দারোগা যখন যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন, তখন সাহেব হাসিয়া বলিলেন "দেখ দারোগা, আমার জেবে একখানা হাজার আর একখানা একশত টাকার নোট ছিল, আমি তোমাকে একশত টাকার নোটখানা দেওয়ার মানসে সেইখানা ভাবিয়া এই হাজার টাকার নোটখানা টানিয়া বাহির করিয়াছিলাম, তোমার কপালে হাজার টাকার নোট উঠিয়াছে, তুমি তাহা রাখ, আমি আর তাহা ফেরত লইব না। এই টাকা যদি আমার হইত তবে খোদা তাহা কখনও আমার হাতে তাহা উঠাইয়া দিতেন না। খোদা তোমাকে দিয়াছেন, অতএব তুমি তাহা লইয়া যাও।" বলিয়া সাহেব কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া কামরার ভিতর হইতে দারোগাকে চলিয়া যাইতে বারম্বার আদেশ করাতে দারোগা তাহা লইয়া থানায় আসিলেন। এখন, পাঠক বলুন দেখি যে জগতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, এই সাহেবের উপকার না করে?

আমি এই শিকারপুর কনসারণের আর একটি ঘটনার কথা পাঠকদিগকে বলিব। সকলেই জানেন, যে শীতকালে জেলার হাকিমেরা মফঃস্বল পরিভ্রমণ এবং পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেক আমলাও যাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা সকলেই পথখরচ বাবদ গবর্ণমেন্ট হইতে কিছু কিছু ভাতা পাইতেন

কিন্তু অনেক স্থানে আমলাদের এই টাকা ব্যয় না হইয়া বরং উপরন্তু বিলক্ষণ লাভ হইত। কারণ যখন যে নীলকুঠীর কিম্বা জমিদারের অধিকারে সাহেবের তাম্বু পড়িত, সেই নীলকর এবং জমিদার আমলাদিগকে কেহ শিধা কেহ খোরাকি বাবতে টাকা দিতেন। হাকিমেরাও নীলকর সাহেবদিগের কুঠীতে যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং জমিদারেরা সওগাদ ভেট দিলে, তাহা গ্রহণ করিতেন, কারণ সাধারণতঃ এই সকল খোরাকি ও ভেট ঘুস বলিয়া বিবেচিত ছিল না। দাতাদিগের সঙ্গতি এবং দানশীলতা অনুসারে শিধা ও ভেটের তারতম্য হইত। শিকারপুরের এলাকার আমলা মহাশয়েরা অনেক সুখভোগ করিতে পাইতেন। দুধ ঘৃতে আহার পরিপাটী হইত এবং তদতিরিক্ত প্রত্যেক আমলার পদ বিবেচনায় প্রতি বৎসর কুঠীর সাহেবের নিকট তাঁহারা উপহার স্বরূপে টাকাও পাইতেন। আমলারা যে শিধা এবং খোরাকি পাইত তাহা হাকিম সাহেবদিগের অগোচর ছিল না কিন্তু বোধহয় পারিতোষিকের বিষয় সকলে জানিতেন না। সে যাহা হউক, সময় সময় কিন্তু হাকিমদিগের মধ্যে কখনও এমন কড়া অপক্ষপাতী সাহেব আসিতেন, যে তিনি স্বয়ং তো কোন নীলকুঠীতে যাইতেনই না, উপরন্তু আমলারাও কাহারও নিকট শিধা কিম্বা খোরাকি না লইতে পারে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এইরূপ একজন কড়া সাহেব একবার কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পরিভ্রমণে বাহির হইয়া আমলাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তাহারা কাহারও নিকট খোরাকি কিম্বা টাকা লইলে কর্ম্মচ্যুত ও কয়েদ হইবে। অধিকন্তু তিনি প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত হইয়া ভূম্যাধিকারীর এবং নীলকুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিতেন, যে তাহারা আমলাদিগকে খোরাকি দিলে, তিনি তাহাদিগকে এবং তাহাদের মনিবকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিবেন। সুতরাং অনেক স্থানে আমলারা নিজ নিজ প্রাপ্ত ভাতার টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় স্বীয় খোরাকি নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব শিকারপুর পৌঁহুছিলেন। সে স্থানেও তিনি নীলকরের কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া এইরূপ সতর্ক করাতে, তাহারা কহিল যে, আবহমান কাল তাহারা আমলাদিগকে খোরাকি দিয়া আসিয়াছে। শিধা এবং খোরাকি দেওয়ার প্রথা বঙ্গদেশে সামাজিক ভদ্রতার একটি নিয়ম, ইহা নীলকর সাহেবেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া থাকেন, ঘুস বলিয়া দেন না। বিশেষ হাকিমের আমলারা দেশীয় ভদ্রলোক, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে কেবল একবারমাত্র শিকারপুর আসিয়া থাকেন, তদুপলক্ষে তাঁহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলে, ভদ্রতার ত্রুটি এবং নীলকর সাহেবদিগের মনে লজ্জা হয়। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সকল বিনয়বাক্যের প্রতি কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার হুকুমমতে কার্য্য করিতে পুনরায়

আদেশ করিলেন। নীলকর সাহেবও নিজে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া খোরাকি দিতে নিষেধ করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রাতঃকালে হয়। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আমলারা দোকানে এবং বাজারে আহারের দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন কিন্তু কোনও দোকানদার কিম্বা বিক্রেতা আমলাদিগের নিকট মূল্য লইয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন না। মাজিষ্ট্রেটের খানসামাও বাজারে ঐরূপ এক পয়সার জিনিষ পাইল না। সাহেবদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিলাতী আহারীয় দ্রব্য থাকে তাহা দ্বারাই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোনরূপ দিনপাত হইল, কিন্তু উপায়হীন আমলারা সমস্ত দিন উপবাস করিলেন। এই ঘটনার কথা শুনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাজারে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে দোকানদারেরা তাঁহার আমলাদের নিকট জিনিষ বিক্রয় না করিলে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্রই, সকল দোকানদার দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল এবং বাজারও লোকশূন্য হইল। ইহার কারণ বুঝিতে কাহার কোন কষ্ট হইবে না। শিকারপুর অঞ্চল সমুদয়ই ওয়াটসন কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত। মেনেজর সাহেবের অনভিপ্রায়ে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, করিলে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহার প্রতিকার করিতে শীঘ্র পারেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেনেজর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করাতে, মেনেজর ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত দোকানদারদিগকে এইরূপ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই নিষেধের ফলে আমলাদিগের সমস্ত দিনরাত্র অনাহারে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে মাজিষ্ট্রেট লজ্জিত হইয়া প্রধান আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমরা যাহা ভাল জান, তাহা কর, আমার কর্ণে যেন কোন কথা আইসে না। আসিলও না; আমলারা সেই দিবস সুখ-স্বচ্ছন্দে উদর ভরিয়া উপবাসের পারণ করিলেন এবং শিকারপুর হইতে উঠিয়া যাইবার সময় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া গেলেন।

ইংরাজের রাজ্যে প্রজারা খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম অমান্য করিয়া নীলকরের আদেশানুয়ায়ী কার্য্য করিল। এমন প্রভুত্ব কে কবে করিতে পারিয়াছিল? এবং সেই প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য নীলকরেরা যে প্রাণপণ করিবে, তাহাই বা বিচিত্র কি?

কলিকাতায় সাহেব সদাগরদিগের অনেক বড় বড় বাড়ী আছে কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে নীলকরদিগের ভবন দেখিলে চমৎকার বোধ হইত। মোল্লাহাটী, খাল বোয়ালিয়া, নিশ্চিন্দিপুর, শিকারপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কনসারণের মেনেজারদিগের ভবন এবং কৃষ্ণনগরে তাঁহাদের ক্লুব হাউস নামক বাড়ী এক এক রাজ অট্টালিকা বিশেষ ছিল।

অনেক গৃহ নানা রঙ্গের প্রস্তরমণ্ডিত এবং নানাবিধ বহুমূল্য বিলাতি সাজসরঞ্জাম সুসজ্জিত ছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুঠীতে অধিক মূল্যের তাজী ঘোড়া ও হস্তী পালে পালে থাকিত। নিজ আবাদের নিমিত্ত মহিষ ও বলদ অসংখ্য ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে সাহেবদিগের নিমিত্ত প্রত্যহ রুটী ও অন্যান্য আহারের সামগ্রী ও ডাকের পত্র লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত নীলকরদিগের নিজের স্বতন্ত্র ডাক স্থাপিত ছিল এবং শীতকালে কোনও কোনও কুঠীতে ঘোড়দৌড়ের তামাশা হইত। ফলে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিলনা। সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য নীলকরেরা টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহারা অতিথি-সেবা করিতেও বিলক্ষণ তৎপর ছিলেন। কলিকাতা হইতে কোন সাহেব কিম্বা জেলার হাকিমেরা কুঠীতে উপস্থিত হইলে, আহারের ঘটার কথা বলিবার আবশ্যক নাই,—দেশীয় কোন আমলা কিম্বা ভদ্রলোক গেলেও, কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের বাসাতেও খুব আদর অপেক্ষা পাইতেন। এখনকার ন্যায় তখন নেটিব ডাক্তার ছিল না, বৎসরে বৎসরে কেবল দুই-চারিজন সব-আসিষ্টান্ট সার্জ্জন মেডিকেল কালেজ হইতে বাহির হইতেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই গবর্ণমেন্টের কাজে নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং দেশে ডাক্তারের অনাটন ছিল। অনেক কুঠীতে কুঠীর কর্ম্মচারী এবং প্রজাদিগের জন্য নীলকরেরা ডাক্তারী ঔষধপত্র রাখিয়া লোকের উপকার করিতেন।

প্রজাদিগের প্রতি নীলকরেরা নিজে তাঁহাদের নিজের স্বার্থের জন্য যে কিছু দৌরাত্ম্য করিতেন কিন্তু অন্য কাহাকেও প্রজাদিগের উপরে তাঁহারা হস্তক্ষেপণ করিতে দিতেন না। এমন কি পুলিশ আমলারাও নীলকরের প্রজার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। তদ্ভিন্ন কুঠীর সুবিধার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং যদিও প্রজাদিগের নিকট চাঁদা তুলিয়া কিম্বা গবর্ণমেন্টের সাহায্যে তাঁহারা এই সকল রাস্তা দিয়াছিলেন তথাপি ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে কেবল নীলকর সাহেবদিগের উদ্‌যোগে এবং যত্নে তাহা হইয়াছিল। আমি জানি এক বৎসর কলিকাতা সহরে ময়লার গাড়ী টানিবার জন্য কয়েক ব্যক্তি বনগ্রাম অঞ্চলে ধর্ম্মের ষাঁড় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসে। সকলেই জানেন যে পল্লীগ্রামে এই সকল ষাঁড়ের দ্বারা গৃহস্থদিগের বিনামূল্যে গোবৎসোৎপাদন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং তজ্জন্য তাহারা ঐ সকল বৃষকে অবাধে তাহাদের শস্য খাইতে দেয়। কলিকাতার চাপরাশিরা ষাঁড় ধরিতে আসিয়াছে দেখিয়া প্রজারা প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাহারা এই নিষেধ না শুনাতে প্রজারা মোল্লাহাটী কুঠীর লারমোর নামক বড় সাহেবের নিকট নালিশ করে। লারমোর সাহেব তৎক্ষণাৎ চাপরাশিদিগের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বারণ করিলেন কিন্তু তাহারা ক্ষান্ত

না হওয়াতে, সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কৃষ্ণনগরের ও কলিকাতার উভয় স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিয়া ষাঁড় ধরা বারণ করিয়া দিলেন। এইরূপ কার্য্য করিতে আমাদের দেশীয় কোন জমিদারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির সাধ্য হইত না। কার্য্যটি অতি তুচ্ছ বটে তথাপি ইহার দ্বারা নীলকরেরা দেখাইলেন যে তুচ্ছ কিম্বা গুরু হউক, প্রজার হিতসাধনে তাঁহারা সর্ব্বদা সমভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই জন্যই হাকিম সাহেবদিগের নিকট কেবল লারমোর সাহেব নহেন, নীলকর সাহেবেরা সাধারণতঃ প্রজাবন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমি একবার মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের নিকট লারমোর সাহেবের এক কার্য্য সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন 'দারোগা'! লারমোর তো রায়তের বন্ধু বলিয়াই প্রসিদ্ধ।"

অনেকের সংস্কার আছে যে, হাকিম সাহেবেরা তাঁহাদের আপন জাতিভাই বলিয়া অনেক সময়ে নীলকর সাহেব সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতেন কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি অনেক বয়োধিক এবং নব্য মাজিষ্ট্রেটের অধীনে কর্ম্ম করিয়াছি এবং ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষ্ণনগরের সদর থানার দারোগী করাতে জেলার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত অকপটে আমার কথোপকথন হইত। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম যে আসল কথা তাহা নহে। হাকিমেরা নীলকরের যথার্থ ভিতরের আচরণ জানিতে পারিতেননা; তাঁহাদের বাহিরের কার্য্য দেখিয়া হাকিম সাহেবেরা ভুলিয়া যাইতেন এবং একবার একজনের প্রতি ভাল জ্ঞান হইলে, পরে তাহার সহস্র নিন্দা উঠিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এইরূপে গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচাবীদের নিকট নীলকরদিগের খাতির সম্মান সংস্থাপিত হয় এবং নীলবিদ্রোহিতার প্রাক্কালে তাঁহাদের এত অধিক গৌরব হইয়াছিল যে, হালিডে সাহেব বঙ্গদেশের প্রথম লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হইয়া কৃষ্ণনগর জেলার নীলকরদিগের নিমন্ত্রণমতে, তাঁহাদের কুঠী সমস্ত পরিদর্শনের অছিলায়, অনেক কুঠীতে ভোজ খাইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমাদের রাজপুরুষরা কেহ কেহ নীলকরদিগকে কত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং নীলকরের নিকট সুখ্যাতি পাওয়ার নিমিত্ত তাঁহাদের কত যত্ন ছিল, তাহা হালিডে সাহেবের এই পরিভ্রমণ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই প্রকাশ পাইবে। লাট সাহেব মোল্লাহাটীর কুঠীতে ভোজ ও পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে যাত্রা করিলেন। সাহেবেরা সকলে যাত্রা করার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া কেহ গজপৃষ্ঠে কেহ বাজীপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু সঙ্গী গরিব চাপরাশিগণ সেইরূপ সুখভোগ করিতে পারে নাই। প্রভুর

যাত্রার আয়োজনের তাহারা কিছুমাত্র আহার করিতে অবকাশ পায় নাই এবং পদব্রজে হাতী-ঘোড়ার সঙ্গে প্রাণপণে তাহাদিগকে ধাবমান হইতে হইয়াছিল। পথও ভয়ানক ছিল। মাঠের রাস্তায় রৌদ্রের উত্তাপে পদাতিকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিকটে একটা ইক্ষুক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুইখান ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতি লারমোর সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। অমনি সেই প্রজাবন্ধু নীলকর নীলবন্ধু গবর্ণরকে দেখাইয়া দিলেন যে "ঐ দেখুন আপনার চাপরাশি আমার গরিব প্রজার শস্য অপচয় করিতেছে।" আর যাবি কোথায়? গবর্ণর সাহেব তাঁহার অপক্ষপাতিত্ব এবং সুবিচার দেখাইবার নিমিত্ত চাপরাশিকে ডাকিয়া অব্যবহিত গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র দুই কুড়ি বেত্রাঘাত খাইতে হুকুম দিলেন এবং চাপরাশিকে তৎক্ষণাৎ তাহা গা পাতিয়া লইতে হইল। বর্ব্বর প্রজারা অবাক হইয়া নীলকরের এই অসাধাবণ প্রভুত্ব দেখিতে লাগিল। তাহারা জানে, যে পথিকেরা ইক্ষুক্ষেত্র হইতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক-আধগাছা ইক্ষু ভাঙ্গিয়া থাকে এবং এদেশে তাহা দোষ বলিযা কেহ বিবেচনা করে না; অতএব অমন নিরপরাধের এবং অধিক হইলেও এই তুচ্ছ অপবাধের নিমিত্ত নীলকরের খাতিরে খোদ লাট সাহেব যখন তাহার নিজের ভৃত্যকে এমন গুরুতর শাস্তি দিলেন, তখন অন্য পর কা কথা,— ইংরাজ রাজ্যে নীলকর যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে। লারমোর সাহেবের এই কৌশল-মাখা কার্য্যে প্রজাসাধারণের নিকট নীলকরের অসীম ক্ষমতা জারি হইল, এবং পক্ষান্তরে সাহেব মহলে হালিডে সাহেবের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

নীলদর্পণে দেশীয় স্ত্রীলোকের প্রতি নীলকর সাহেবের দৌরাত্ম্যের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অমূলক। আমি অনেক অনুসন্ধানেও ঐ কথার কোন ভিত্তি পাই নাই, তবে সাহেবদিগেরও রক্তমাংসের শরীর; রিপুপ্রাবল্য হইতে যে তাঁহারা এককালে বর্জ্জিত তাহা নহে কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে বুনা প্রভৃতি নীচজাতীরা নষ্টা স্ত্রীলোকদিগের এবং বারাঙ্গনার সঙ্গে ভিন্ন অপবাদ শুনি নাই এবং তাহাতেও সাহেবেরা টাকা বিতরণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মতি মতে লিপ্ত হইতেন। আমি কৃষ্ণনগরে যে বাড়ীতে বাস করিতাম সেই কোঠা একজন নীলকর তাহার বুনা উপপত্নীকে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া বানাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা ভাড়া দিয়া এই স্ত্রীলোকটি মাসে মাসে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিত। আমি কোনও স্থানে বলপ্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখিতে কিম্বা শুনিতে পাই নাই।

নীলকুঠি

২

সেকালে যেমন আদালতে ফৌজদারির এবং গবর্ণমেন্টের অন্যান্য কাছারীর কর্ত্তা সাহেবদিগের এক একজন দেওয়ান ছিলেন, নীলকর সাহেবদিগের প্রত্যেক কুঠীতে এবং কনসারণে সেইরূপ দেওয়ান ছিল। ইহারাই সাহেবদিগের দক্ষিণ হস্ত ছিল। সাহেবেরা নিজে কেবল নীল প্রস্তুতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, দেওয়ানজির হস্তে জমিদারী শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত থাকিত। তদ্ভিন্ন কুঠীর সমুদয় খরচপত্র দেওয়ানের হস্ত দিয়া হইত এবং জমিদারী এবং তালুক সমস্তের আদায় তহশীলও ইহারা করিত। ফলিতার্থে নীলকুঠীর দেওয়ানের হস্তে অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। কুঠীর যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা ইহাদিগের উপস্থিত করিতে এবং চালাইতে হইত। যখন কাহারও সহিত কোন বিবাদ কিম্বা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে আবশ্যক হইত, তাহার সমস্ত আয়োজনের ভার দেওয়ানের উপরে পড়িত এবং কুঠীর অপরাধে ইহাদেরই জেলখানায় যাইতে হইত। ইহাদের প্রকৃত খ্যাতি গোমস্তা ছিল, কিন্তু লোকে সম্মান করিয়া দেওয়ানজি বলিয়া ডাকিত। দৌরাত্ম্য, অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত নীলকর সাহেবদিগের যে দুর্নাম আছে তাহার অধিকাংশের জন্য তাঁহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা দায়ী। পারস্য ভাষায় গোলেস্তা পুস্তকে লিখিত আছে, যে যদি বাদসাহেবের একটি কুক্কুট ডিম্ব আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরা দেশের সমস্ত কুক্কুট জবাই করে। একথা বড় মিথ্যা নহে; কারণ কুঠীর দ্বারা এমন অনেক দুষ্কার্য্য হইত, যাহা সাহেবেরা কখনও জানিতে কিম্বা শুনিতে পাইতেন না। সকল সাহেব এদেশের সকল অবস্থা জানিতেন না, তাহাদের দেশীয় কর্ম্মচারীরা ঘরে ঢেঁকি কুমীর

হইয়া বিভীষণের ন্যায় ভিতরের কথা জ্ঞাত করাইয়া যেরূপে কার্য্য করিলে সাহেবের উপকার হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিত। ইহার কারণ যদি শুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি হইত, তাহা হইলে তাহাদের নিন্দার কথা না হইয়া বরং প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভের অঙ্ক ছিল। কুঠীর অধিকারের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে আমলাদিগের বেতন এবং উপরি রোজগার বাড়িয়া যাইত এবং সাহেবের প্রভূত্ব যতই বদ্ধমূল হইত, ততই তাহাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইত। নীলকর সাহেবকে তাহার গোমস্তা এক বিষয়ে দুই পয়সার লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে, সে অনায়াসে অন্যদিকে নিজে চারি পয়সা রোজগার করিতে পারিত। আমলার দৌরাত্ম্যের বিষয় সাহেবের নিকট প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে, আমলা সাহেবকে এক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত করিত, যে—প্রজা কিম্বা বাহিরের লোকের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার না করিলে কুঠীর প্রভুত্ব থাকে না এবং সাহেবকে কেহ ভয় করিবে না।

নীলকরের চাকরী করিয়া তাঁহাদের দেওয়ান গোমস্তারা অনেকে প্রচুর সম্পত্তি উপার্জন করিতে পারিয়াছিল এবং সকল জাতীয় লোক ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ব্রাহ্মণ কায়স্থের অভাব ছিলনা। খাল বোয়ালিয়া কুঠীতে ঢাকা জেলার কার্ত্তিকপুর অঞ্চল নিবাসী রামমাণিক্য সোম নামক একজন বঙ্গজ কায়স্থ দেওয়ান ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন এবং তিনি খাল বোয়ালিয়া কনসারণের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রদেশের লোক অত্যন্ত ভয়ও করিত। তাঁহার দর্পের একটি কৌতুককর কথা বলিব।

রামমাণিক্য যে ঘরে বসিয়া কাছারী করিতেন, তাহার সম্মুখে সাধারণের এক বর্ত্ম ছিল। এক দিবস তিনি কাছারী করিতেছেন, এমন সময় একজন গোস্বামী তাঁহার তুরী ভেরী ও দলবল লইয়া পালকি আরোহণে ঐ পথ বাহিয়া যাইতেছিলেন। গোস্বামীর গলায় পৈতা দেখিয়া রামমাণিক্য তাহাকে আপন স্থান হইতে হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও দেওয়ানজির ন্যায় ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পালকির মধ্য হইতে যতদূর পারিলেন হস্ত বাহির করিয়া, দেওয়ানজিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামমাণিক্য তাঁহার মজলিশের উপস্থিত ব্যক্তিদিগের নিকট এই গোস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল যে "উনি ভাজনঘাটের অমুক বৈদ্য গোসাঞী।" অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন, যে কাটোয়া অঞ্চলের শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীদিগের ন্যায় কৃষ্ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ভাজনঘাট নামক গ্রামেও কয়েক ঘর বৈদ্য গোসাঞী আছেন। ইঁহারা অনেক নবশাখ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোককে মন্ত্র দিয়া থাকেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামীরা

মুরশিদাবাদের কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধ মহারাণী স্বর্ণময়ীর ইষ্টদেবতা। এইরূপ শ্রীখণ্ডের এবং ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামীদিগের অনেক ধনাঢ্য শিষ্য-সেবক থাকাতে তাঁহারা নিজে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। ভাজনঘাটের ইহারই একজন গোস্বামী রামমাণিক্য দেওয়ানের সম্মুখস্থ পথ দিয়া শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। একে পূর্ব্বদেশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহাতে আবার হেরিস সাহেবের দেওয়ান, রামমাণিক্য যাই শুনিল যে, যাহাকে সে প্রণাম করিয়াছে সে ব্রাহ্মণ নহে, বৈদ্য—অমনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া গোসাঞীকে পালকি সমেত তাহার নিকটে উপস্থিত করিতে কয়েকজন লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিল। সেই সময় ঐ প্রদেশে এমন অল্প লোক ছিল, যাহারা রামমাণিক্যকে তাচ্ছিল্য করিতে পারিত, কিম্বা ভয় না করিত। অল্পক্ষণের মধ্যে লাঠিয়ালেরা গোস্বামীকে দেওয়ানের নিকট উপস্থিত করিলে দেওয়ানজি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ না বৈদ্য। গোস্বামী বৈদ্য বলিয়া উত্তর করিলে দেওয়ান এক ভ্রুকুটী সহকারে বলিলেন যে "তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি বৈদ্য হইয়া কায়েতের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছ, ভাল চাও ত এই দণ্ডে সকলের সম্মুখে আমার প্রণাম ফিরাইয়া দেও।" গোসাঞী এতক্ষণ ভয়ে নবমী পূজার পাঁটার ন্যায় কাঁপিতেছিলেন, মনে ভাবিতেছিলেন যে দেওয়ান না জানি তাঁহাকে কতই গুরুতর শাস্তি দিবেন। কিন্তু দেওয়ানের মুখে এই লঘু আজ্ঞা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রামমাণিক্যকে নতশিরে এক নমস্কার করিলেন এবং দেওয়ানজিও তাঁহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিতে বলিয়া বিদায় দিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার সকল কুঠীতে ইদানীন্তন প্রায়ই কৈবর্ত্তজাতীয় ব্যক্তিরা দেওয়ান গোমস্তা ছিল। ইহারা অনেকে নীলকুঠীর কার্য্যে দক্ষ হইয়াছিল, এবং দুই তিন পুরুষ নীলকরের চাকরী করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তি করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশের বিশ্বাস বা ভৌমিক কিম্বা ভূঞা পদবী ছিল এবং দেখিতে শুনিতে, আচার ব্যবহারের এবং কর্ম্ম-কার্য্যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহারা অশ্বারোহনে খুব পটু ছিল, কারণ ভালরূপে ঘোড়া চড়িতে না পারিলেন নীলকুঠীর গোমস্তাগিরি কর্ম্ম চলিয়া উঠিতনা। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় শ্রাবণে নীলকর্ত্তন সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে কুঠীর সমস্ত নীলের ভূমি পরিদর্শন করিতে না পারিলে, নীলের ব্যাঘাত হইত সুতরাং অশ্বারোহন অভ্যাস না থাকিলে এই কার্য্য বিধিমত নির্ব্বাহিত হইতে পারিত না। এইজন্য প্রত্যেক গোমস্তার ৩/৪টা অশ্ব নিযুক্ত ছিল।

নীলকুঠীর কৈবর্ত্তজাতীয় গোমস্তার মধ্যে ওয়াটসন কোম্পানীর গোমস্তা ভবানন্দ দেয়াড় নিবাসী কৃষ্ণলাল ভূঞা অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার

জীবন কাটাইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তিও রাখিয়া গিয়াছিলেন। লেখাপড়ায় পারদর্শিতা অধিক না থাকিলেও কার্য্যদক্ষতা এবং বৈষয়িক বুদ্ধি খুব চমৎকার ছিল। প্রতাপে, প্রভুভক্তিতে কৃষ্ণলাল খাল বোয়ালিয়ার দেওয়ান রামমাণিক্য অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর প্রদেশে এমন লোক ছিল না যে কৃষ্ণলাল ভূঞার নাম না জানিত। এতদূর পর্য্যন্ত জনরব আছে, যে কৃষ্ণলালের দোহাই চলিত। পক্ষান্তরে অনেকে তাহাকে অত্যাচার এবং দৌরাত্ম্যের জন্য নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রজাপীড়ন এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের প্রতি অত্যাচার করা নীলকরের গোমস্তাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য কারণ তাহা না করিলে নীলকুঠীর উপকার হয় না। প্রজারঞ্জন এবং নীলকরের হিত এই দুই কার্য্যের পরস্পর ভাব যেমন চিড়া কাঁচাকলার ভাব, উভয় কখনও বিমিশ্রিত হয় না। যাহা হউক ভূঞাজির প্রভুভক্তি অতি প্রবল ছিল। কিসে ওয়াটসন কোম্পানীর লভ্য হইবে, ক্ষতি হইবে না—ইহাই তাহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। একবার যশোহর জেলার অন্তর্গত এক কুঠীর গোমস্তার প্রতি ওয়াটসন কোম্পানীর প্রাপ্য কয়েক হাজার টাকা ঐ জেলার কলেক্টরী হইতে বাহিত করিয়া লওয়ার আদেশ হয় এবং গোমস্তাও কলেক্টরী হইতে ঐ টাকা পাওয়ার সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু টাকা আনিবার নিমিত্ত শিকারপুর হইতে লোক প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে সংবাদ আসিল, যে দৈব অগ্নি লাগিয়া সেই কুঠী জ্বলিয়া গিয়াছে এবং টাকাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মেনেজের সাহেবের তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ কিম্বা কোন চিন্তা হইল না, কারণ ওয়াটসন কোম্পানীর একদিকে কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হইলে বড় আসে যায় না, কিন্তু বাঙ্গালী কৃষ্ণলালের মনে অমনি অবিশ্বাস জন্মিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটি ঘোড়ায় চড়িয়া কৃষ্ণলাল যশোহর যাত্রা করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে এইরূপ ভ্রমণ করা নীলকুঠীর গোমস্তার পক্ষে বড় কঠিন কিম্বা কষ্টকর কাজ ছিল না। শিকারপুর হইতে যশোহরে পত্র পৌঁছিতে পারে, এমন সময়ের পূর্ব্বে ভূঞা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে সেই কুঠীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে গৃহদাহ মিথ্যা। গোমস্তাও তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইল, কারণ সে কখনও ভাবে নাই যে শিকারপুর হইতে কেহ এত শীঘ্র সেই স্থানে আসিবে। সে ভাবিয়াছিল, যে আর দুই এক দিবসের মধ্যে টাকাগুলি স্থানান্তর করিয়া কাছারীঘরে আগুন দিয়া নিজেই শিকারপুর যাইয়া একরূপ বন্দোবস্ত করিবে। কিন্তু কৃষ্ণলালের উদ্যোগে তাহার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কৃষ্ণলাল সমস্ত টাকাগুলি তাহার নিকট বুঝিয়া লইল এবং তাহা শিকারপুর প্রেরণের উচিত বন্দোবস্ত করিয়া মেনেজর সাহেবের নিকট প্রত্যাগমন করিল। কৃষ্ণলাল যশোহর গিয়াছিল শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণলাল বলিল, যে যথার্থ ঘর পুড়িয়া

গিয়াছে, কিন্তু টাকার লোকসান হয় নাই। সেই গোমস্তাটি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রভুর নিকট এইরূপ চাতুরী খেলিয়াছিল! প্রভুর স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যে ভৃত্যের এইরূপ যত্ন, তাহার যশ শ্রীবৃদ্ধি কেন না হইবে?

কৃষ্ণলাল ভূঞ্রার বিলক্ষণ দানশক্তি ছিল, এবং ব্রাহ্মণকে বিশেষ বৈষ্ণবকে তিনি গাঢ় ভক্তি করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে এবং শিকারপুরের বাসাতে অতিথি সেবা করিতেন। কৃষ্ণলালের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে কেহ রুক্ষহস্তে ফিরিয়া যাইতেন না। তজ্জন্য অনেক দূর হইতেও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিতেন।

কৃষ্ণলালের দানশীলতার কথা শুনিয়া এক দিবস একজন উলার ব্রাহ্মণ কিছু পাইবার আশায় শিকারপুরে তাঁহার নিকট প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণলাল তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল এক ঠেঙ্গা-মারা প্রণাম করা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সমাদর কিম্বা সম্ভাষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সে শুনিয়াছিল, যে ভূঞ্রাজি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার প্রতি এইরূপ বিমুখ হওয়ার কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্নানের সময় ঐ স্থানের আব একটি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে কৃষ্ণলাল অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত, সেইজন্য তিনি যে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের গলায় মালা না দেখেন, তাহাকে সমাদর করেন না। উলার বিটল ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মনে মনে কৃষ্ণলালকে বঞ্চনা করার নিমিত্ত সুন্দর একটি কৌশল সৃষ্টি করিল। স্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণলালের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণলাল শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ অতি কাতরভাবে বলিল যে "ভূঞ্রাজি তোমাকে আমার দূর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? আমি হরিনামের মালা জপ এবং ধারণ না করিয়া জলগ্রহণ করি না। অদ্য আমার কপাল পুড়িয়াছে, পথে মালাছড়াটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। আমি কি প্রকারে হরিনামের মালা না জপিয়া দিনপাত করিব, তাই ভাবিয়া রোদন করিতেছি।" ব্রাহ্মণের এই গাঢ় কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণলালের অশ্রুপতন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র তাহাকে একছড়া তুলসীর মালা দিয়া প্রচুররূপে আহার করাইয়া ব্রাহ্মণের আশার অতিরিক্ত দান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ভণ্ড ব্রাহ্মণ টাকাগুলি হস্তগত করিয়া কৃষ্ণলালের বাসাবাড়ী হইতে কিছু দুরে আসিয়া গলা হইতে মালাছড়াটা টানিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিল যে "পেটের দায়ে কি না করিতে হয়? অদ্য গলায় মালাও পরিতে হইয়াছিল।" কৃষ্ণলাল এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে "বামনটা কি পাষণ্ড!"

কৃষ্ণলাল ভূঞ্রার যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিলাম, নীলকুঠীর এই জাতীয় অন্যান্য

কর্ম্মচারীদিগের সেইরূপ গুণানুবাদ করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইতাম, কিন্তু তাহাদের দোষে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সাধারণের নিকট তাহাদের দুর্নাম ভিন্ন যশ হয় নাই এবং সেইজন্য ভদ্রমণ্ডলীতে এই জাতীয় ব্যক্তিরা "কেওট" নামে অভিহিত ছিল।

কৈবর্ত্ত মহাশয়েরা যে কেবল নীলকরের চাকর হইয়া প্রভুর স্বার্থবর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রজা এবং নিকটবর্ত্তী তালুকদারের উপরে অত্যাচার করিতেন বলিয়া জনসমাজে নিন্দিত ছিলেন এমন নহে, তাঁহাদের আরও অনেক প্রকার দোষ ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর বলে অনেক দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। এই সকল ব্যক্তিরা সাধারণতঃ যে চরিত্রের মনুষ্য এবং যে নিমিত্ত তাহারা ভদ্রমণ্ডলীতে ঘৃণিত ছিল, একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার অনেকটা বুঝা যাইবে। এই দৃষ্টান্তে আরও একটি কথা প্রকাশ পাইবে। তাহা এই যে, শেষাবস্থায় নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে রাজপুরুষেরাও তাঁহাদের আশঙ্কা না করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না।

একদিবস কৃষ্ণনগরের মাজিষ্টেট এলিয়ট সাহেব ডাকাতি নিবারণের কমিশনর ওয়ার্ড সাহেবকে লইয়া একখানি বগিগাড়ীতে কৃষ্ণনগরের কোতয়ালী থানাতে আসিয়া আমাকে ঐ গাড়ীর উপর তুলিয়া লইলেন এবং ঐ সহরের কোম্পানীর বাগান নামক এক জনশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া অবতরণ করিলেন এবং গাড়ী সহিসের নিকট রাখিয়া বাগানের প্রান্তভাগে এক নির্জ্জন স্থান দেখিয়া তথায় গমন করিলেন। সাহেবদ্বয়ের এইরূপ সাবধানের কার্য্য দেখিয়া আমার মনে মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইল এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবও আমাকে বলিলেন যে "আমরা তোমাকে এই গোপন স্থানে খুন করিতে আনিয়াছি, তুমি তোমার ঈশ্বরের নাম লও।" ওয়ার্ড সাহেব এলিয়ট সাহেবের এই কথা শুনিয়া পাছে আমি সত্য সত্যই ভয় পাই এই আশঙ্কায় আমাকে তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিয়া বলিলেন "না দারোগা, এলিয়ট কৌতুক করিতেছেন, আমি তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলিব বলিয়া এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়াছি তুমি আমার সঙ্গে আইস।" বলিয়া একটা বৃহৎ শিমূল বৃক্ষের মূলের উপরে উপবিষ্ট হইয়া আমাকেও তাঁহার পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রহরী স্বরূপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কমিসনর। দারোগা তুমি মহতপুরের বৈকুণ্ঠনাথ মজুমদারকে জান?

দারোগা। আমি তাহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও দেখি নাই।

কমিসনর। সে কেমন লোক বলিয়া তুমি জান?

দারোগা। শুনিয়াছি নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেবের দেওয়ান এবং বিলক্ষণ

সম্পত্তিশালী।

কমিসনর। তাহার কখনও চুরি ডাকাতির অপবাদ শুনিয়াছ?

দারোগা। না সাহেব! কিন্তু নীলকর সাহেবের স্বার্থের জন্য প্রজার পীড়ন করে বলিয়া শুনিয়াছি।

কমিসনর। আমি হুকুম দিলে তুমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস কর?

দারোগা। আমার এই কার্য্য, কেন পারিব না?

কমিসনর। তুমি কাঁচা লোকের ন্যায় কথা কহিতেছ। বৈকুণ্ঠ যে কত বড় দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি তাহা তুমি জান না বলিয়া এইরূপ সাহস করিতেছ। বিশেষ সে তোমার থানার এলাকায় বাস করে না, ভিন্ন এলাকায় বাস করে।

দারোগা। আমি বহু লোক সঙ্গে লইয়া গেলেও কি ধরিতে পারিব না?

কমিসনর। না পারিবে না। কারণ ঐ অঞ্চল সমুদয়ই নীলকর সাহেবের অধিকার; তাহাতে কেহই বৈকুণ্ঠের বিরুদ্ধে তোমার সহায়তা করিবেনা। বিশেষ একবার যদি বৈকুণ্ঠ জানিতে পারে যে তাহার গ্রেপ্তারির জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে এ জন্মে তাহাকে ধরা কঠিন হইবে। সেইজন্য আমি তোমাকে এই নির্জ্জন স্থানে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বৈকুণ্ঠকে ধরিবার কোন উপায় করার নিমিত্ত আমি কৃষ্ণনগর আসিয়াছি। এলিয়ট সাহেব বলেন যে তুমি অনেক কৌশল জান, মনে করিলে নির্ঝঞ্ঝাটে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে; পারিলে আমি তোমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবের কথা শুনিয়া আমার মনে একটা কথার উদয় হইল; সাহেবকে বলিলাম যে "যদি আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি না করেন তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিয়া দিব।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার জেবের মধ্য হইতে একখানা ইংরাজি পরওয়ানা বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া কহিলেন "তুমি যতকাল ইচ্ছা লও, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যেন তাহাকে শেষে পাইতে পারি। তাহাকে পাইলে আমার অনেক উপকার হইবে।"

দারোগা। বৈকুণ্ঠ এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, যে আপনি তাহাকে ধরিতে এত ব্যগ্র হইয়াছেন।

কমিসনর। বৈকুণ্ঠ একজন প্রধান ডাকাত, এই কথা বোধ হয় তুমি নূতন শুনিলে, কিন্তু আমি উপর্য্যুপরি প্রমাণ পাইয়াছি যে, সে ডাকাতের সর্দ্দার; তাহার পাল্লায় অনেক লোক আছে, তাহাদের দ্বারা সে ডাকাতি করে, এবং ডাকাতি করিয়া, সে অনেক টাকা

উপার্জ্জন করিয়াছে।

দারোগা। নীলকর সাহেব কি তাহার এই চরিত্রের কথা জানেন?

কমিসনর। জানেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে কুঠীর লোকের দ্বারাই বৈকুণ্ঠ ডাকাতি করে। কিন্তু ইহাও আমি অবগত আছি যে, কুঠীর সাহেব বৈকুণ্ঠকে খুব বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং কুঠীর ও কুঠী সংক্রান্ত সমস্ত জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার বৈকুণ্ঠর হস্তে অর্পিত আছে।

কতক্ষণ পরে সাহেবেরা আমাকে থানায় পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহার পরে আমি অনুসন্ধানে জানিলাম যে বৈকুণ্ঠ খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি, জমি-জমা গোলাবাড়ী ও নগদ টাকার কারবার আছে। কৃষ্ণনগরে হরিনাথ কুমারের বেড় নামক পল্লীতে তাহার একটি সুন্দর বাসাবাড়ীও ছিল। সাধারণের নিকট সে একজন ভদ্র ও বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিচিত। এবং অতি অল্প লোকেই তাহার দস্যুবৃত্তির কথা জানিত। কেবল ইতর লোকে অর্থাৎ যাহারা ঐ কর্ম্মের কর্ম্মী এবং তাহার অধীনে নিজে কিম্বা যাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা ঐ সকল দুষ্কার্য্যের সঙ্গী ছিল, তাহারাই, বৈকুণ্ঠের দোষের সংবাদ জানিত। আমার সংসারে একজন গোয়ালা চাকর ছিল, সে বৈকুণ্ঠের প্রতিবাসী এবং পূর্ব্বে তাহার চাকরিও করিত! এই ব্যক্তির নিকট আমি বৈকুণ্ঠের অনেক কাহিনী শুনিলাম; তন্মধ্যে একটি আমি বিবৃত করিব। বৈকুণ্ঠের বাড়ী খড়িয়া নদীর নিকট। একবার উত্তর অঞ্চলের একখানা চাউল বোঝাই নৌকার ব্যাপারীর নিকট বৈকুণ্ঠ ৭০০ টাকার চাউল কিনিয়া তাহাকে এমন সময় নগদ টাকা বুঝাইয়া দিল, যে ব্যাপারী সেই দিবস নৌকা খুলিয়া কিছুতেই কৃষ্ণনগরের কুতঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না। কাজেই পথের মধ্যে এক স্থানে নৌকা লাগাইয়াছিল। রাত্রিকালে বৈকুণ্ঠ তথায় অধীনস্থ কয়েক ব্যক্তি ডাকাতকে পাঠাইয়া ব্যাপারীর নৌকা হইতে ঐ টাকা এবং আরও যে কিছু টাকা পাইল, লুঠিয়া লইয়া গেল। আমি যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ততই বৈকুণ্ঠের দোষ জানিতে পারিলাম।

এইরূপে ৪/৫ মাস গত হইল, কিন্তু আমার প্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত হইল না। ওয়ার্ড সাহেব হুগলী হইতে আমাকে লিখিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আরও কিছুকালের নিমিত্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরের কোতওয়ালী থানার হাতার উত্তর পার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহাতে পল্লীস্থ অনেক স্ত্রীপুরুষে স্নান করিত। এক দিবস স্নানের সময় এই পুষ্করিনীর ঘাটে বামা নাম্নী একটি একটি বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইয়া, আমার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম। সেই সুযোগ এই যে, বামা বৈকুণ্ঠের উপপত্নী এবং বৈকুণ্ঠ

বামাকে লইয়া গিয়া তাহার নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছে। বৈকুণ্ঠ যখন যে স্থানে যায়, বামাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণনগর আসিলে, বামা তাহার সঙ্গে আসিয়া থানার নিকটে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখিতে আসে। অদ্য বামাকে ঘাটে দেখিয়া নিঃসন্দেহে বিবেচনা করিলাম, যে সর্পের লাঙ্গুল যেখানে, সর্পও সেই স্থানে অবশ্য আছে। আমি বৈকুণ্ঠ বামা ঘটিত সম্বন্ধ অবগত থাকাতেই, ডাকাতি নিবারণের কমিসনর সাহেবকে সাহস করিয়া বলিয়াছিলাম, যে নির্ঝঞ্ঝাটে আমি তাহাকে কিছুকাল বিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিব।

আমি কয়েকজন বরকন্দাজ সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠের বাসার নিকট গিয়া দেখিলাম, যে সে অশ্বারোহণে খড়িয়া নদী হইতে স্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতেছে। সে ঘোড়া হইতে উত্তরণ করত বাসাবাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই আমি তাহাকে ডাকাতি নিবারণের কমিসনারের পরওয়ানা দেখাইয়া গ্রেপ্তার করিলাম এবং তাহার বাসার লোকে জ্ঞাত হওয়ার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে থানায় লইয়া আসিলাম। এদিকে এলিয়ট সাহেবকে এই সংবাদ দেওয়া মাত্রই তিনি জেলখানা হইতে ২৫জন ও আমার থানা হইতে ১৫জন বরকন্দাজের ও দুইজন জমাদারের হেফাজতে বৈকুণ্ঠকে অবিলম্বে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতে লিখিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে যে স্থানে প্রেরণ করা হইল, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। বৈকুণ্ঠকে চালান করার কিৎকাল পরেই নীলকর পেট্রিক স্মিথ সাহেব থানায় আসিয়া বৈকুণ্ঠের তত্ত্ব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, যে আমি তাহাকে অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি এবং তিনি তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে জামিন দিতে প্রস্তুত আছেন। বৈকুণ্ঠ জেলখানায় আছে বলিয়া আমি সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিয়া দিলাম। সাহেব শশব্যস্তে জেলখানায় গেলেন, পুনরায় আমার নিকট আসিলেন এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে শুনিলাম, যে ১০/১৫ জন লোক দৌড়িয়া যাইয়া দিগ্‌নগর গ্রামের নিকট শান্তিপুরের রাস্তার উপরে বৈকুণ্ঠকে ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বরকন্দাজেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিছু কাল হুগলীতে ডাকাতি নিবারণের কমিশনরের গারদে থাকার পর, আলিপুরের সেসন জজের আদালতে বৈকুণ্ঠের বিচার হয়। তাহাতে বৈকুণ্ঠ একজন বারিষ্টার সাহেব আনাইয়া খালাসের চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা হয়।

নীলকরের গোমস্তাদিগের মধ্যে এমন আর কত বৈকুণ্ঠ মজুমদার ছিল, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সে যাহা হউক, সকলের উপরে নীলকরের ভয়ে আমাদের রাজপুরুষেরাও যে সশঙ্কিত থাকিতেন, ইহাই তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইতর লোকের বিশ্বাসেও নীলকর সাহেবদিগের প্রতাপ যে কেমন অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তেই প্রকাশ পাইবে। আমি ১৮৬৫ সালে ঢাকা হইতে মাণিকগঞ্জের পথে নৌকাযোগে কুষ্টিয়া যাইতেছিলাম। সাবাড়ের পশ্চিমে এক স্থানে, ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ধারে কয়েকটা বৃহৎ কুম্ভীর শুইয়া রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ ধারে এক ঘাটে বহুলোক অনায়াসে স্নান করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে পরপারে কুম্ভীর দেখিয়াও তাহারা কিরূপে নিঃশঙ্কচিত্তে স্নান করিতেছে? তাহাতে সে উত্তর করিল, "ইহা নীলকর ওয়াইজ সাহেবের মাটী, কুমীর বেটারা তাঁহাকে ভয় করে।"

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হালিডে সাহেবের আমলেই নীলকরদিগের গৌরব চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি নিশ্চিন্তপুর কনসারণের মেনেজর ফরলং সাহেবের ন্যায় দুই-তিনজন প্রধান নীলকর সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সম্মানিত করেন। আমাদের দেশীয় জমিদারের মধ্যে কেহ গবর্ণমেন্টের নিকট রাজা উপাধি পাইলে, যেমন তাঁহার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই নিজে নিজে কেহ রাজা, কেহ কুমার, কেহ রাণী ইত্যাদি উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব কিম্বা অধীনস্থ লোকে ঐরূপে তাঁহাদের সম্ভাষণ না করিলে অসন্তুষ্ট হন, সেইরূপ নীলকরের মধ্যে দুই-তিনজন নীলকর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছে দেখিয়া সকল নীলকর সাহেবই নিজে নিজে মাজিষ্ট্রেট হইয়া কুঠীতে কাছারি খুলিতে লাগিলেন। কুঠীর এক কামরায় প্রকাশ্যরূপে নীলকরের এই সকল আজখোদ কাছারি হইত। গবর্ণমেন্টের আদালত ফৌজদারী কাছারির ন্যায় ইহাতেও সাজসজ্জা থাকিত। ফরিয়াদী, আসামী, সাক্ষী, আমলা, হাকিম ও দর্শকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ কাছারি বসিত এবং ভাঙ্গিত। কুঠীর সাহেব—বিচারক; কুঠীর দেওয়ান গোমস্তা—আদালতের সেরেস্তাদার, পেস্কার প্রভৃতির ন্যায় আমলা; আর প্রত্যেক মোকদ্দমায় পৃথক্ নথী লিখিত পঠিত হইত। দোষী ব্যক্তিকে কেবল অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হত এমন নহে, শারীরিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই সকল কাছারির আনুষঙ্গিক, কুঠীতে গারদ এবং জেলখানা ছিল এবং তাহাতে নীলকরের হুকুমমতে দাণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে কয়েদে থাকিতে হইত। দরিদ্র প্রজা—যাহার নিকট আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহাদের প্রতি শারীরিক শাস্তির হুকুম হইত। গবর্ণমেন্টের আদালতে বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু নীলকরের আদালতে এই শাস্তির জন্য নূতন যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং কোনও কুঠীতে শ্যামচাঁদ ও কোনও কুঠীতে রামচাঁদ ইত্যাদি নামে এই যন্ত্রের উল্লেখ করা হইত। বিচারক হুকুম দেওয়ার

সময় এইরূপ উক্তি করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেন, "অমুক আসামী তাহার অপরাধের জন্য দশ কি বিশ ঘা শ্যামচাঁদ কি রামচাঁদ খায়।" এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠীতে এক রকম ছিল না। কুঠী বিশেষ এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজির দয়ার তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটি লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্ম্মের একখানা হাতা এবং কোন স্থানে হাতার পরিবর্ত্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েক ছড়া চর্ম্মের রজ্জু বান্ধা থাকিত। ইহার এক আঘাতে গবর্ণমেন্টের আদালতের বেতের বহু আঘাতের ফল হইত। দশ ঘা বেত খাইলে মনুষ্যের যে কষ্ট না হইত, শ্যামচাঁদ রামচাঁদের এক ঘায়ে তাহার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিগো কমিশন সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেন্টের কারাগারে কয়েদীরা যেমন করিয়া হউক, প্রত্যহ দুইবেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায়। কিন্তু কুঠীর গারদে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ ছিল। দেওয়ানজির এবং তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের দয়ার এবং তত্ত্বাবধাণের উপর কয়েদীদিগের আহার নির্ভর করিত; তাহাতে হতভাগাদিগের যত সুচারু আহার ঘটিত, তাহা সকলে বুঝিতে পারেন। কয়েদীদিগের কপালে আর এক কষ্ট ছিল। নীলকরেরা কোনও ব্যক্তিকে কয়েদ করিলে তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে মুক্ত করার জন্য পুলিশে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিত। পাছে পুলিশ আমলারা কয়েদী ব্যক্তিকে ধরিতে পায়, সেই জন্য তাহাকে এক কুঠী হইতে অন্য কুঠীতে চালান করা হইত এবং অনেক সময়, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে বিশেষ রাত্রিকালে কুঠীর প্রহরীদিগের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া তাহার আহার করা দূরে থাকুক, কিছুকাল একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করারও অবকাশ হইত না। কুঠী-কুঠী চালান করার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমি কোন এক বিশেষ কার্য্যে হার্দ্দি থানায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। হার্দ্দির এলাকার মধ্যে দিয়া পাঙ্গাসিয়া নদী বহমান এবং সেই নদী দিয়া মোরঙ্গ হইতে শালকাষ্ঠের মাড় লইয়া অনেক ব্যাপারী কলিকাতাভিমুখে যাইত। পাঙ্গাসিয়া নদীর নিকটে বামনদী কুঠী স্থাপিত ছিল এবং তাহার মেনেজর ট্রিপ সাহেবের শালকাষ্ঠের প্রয়োজন হওয়াতে একটা মাড় আটক করিয়া সুলভ মূল্যে তাহা লইতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারীর গোমস্তা তাহাতে অসম্মত হওয়াতে ট্রিপ সাহেব বলপূর্ব্বক কাষ্ঠ সমস্ত তীরে উঠাইয়া ব্যাপারীর ঐ গোমস্তাকে কয়েদ করেন। তাহার সঙ্গী লোকেরা কৃষ্ণনগর যাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কয়েদ খালাসীর দরখাস্ত করে। বামনদী হইতে কৃষ্ণনগর প্রায় ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান। সেই সময় একজন আসিষ্ট্যান্ট মাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নাম আমার এক্ষণে স্মরণ নাই, শিকারপুর

অঞ্চলে মোতায়েন ছিলেন। বড় মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত আসিষ্টান্ট সাহেবকে এবং হার্দ্দিতে আমাকে, বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে নীলকরের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানা পাইয়া আমি বাম নদী যাইয়া ট্রিপ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করাতে, সাহেব এবং তাহার দেওয়ান কুঠীর সমস্ত বাড়ী, ঘর, কামরা, গুদাম, জাতঘর প্রভৃতিতে লইয়া গিয়া দেখাইলেন যে তাহার কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তি কয়েদ নাই। ঐ ব্যক্তিকে ইত্যগ্রেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সুতরাং সাহেব এবং তাঁহার কর্ম্মচারী নিঃশঙ্ক চিত্তে কুঠীর এলাকার সমস্ত স্থান আমাকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি থানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঠিক সংবাদ পাইলাম যে ট্রিপ সাহেব ঐ হতভাগাকে বামনদী হইতে অনেক দূর পূর্ব্বদিকে কুষ্টিয়ার নিকট পল্‌তা কি সিমলা—আমার ঠিক স্মরণ নাই—নামক একটি ছোট কুঠীতে অনেক প্রহরী দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, এবং দুই চারি দিবসের মধ্যে পদ্মাপার করিয়া রাজসাহী জেলা লইয়া যাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দিন এবং সময় নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থানে যাইতে এবং আমিও সেই স্থানে ঐ সময় উপস্থিত হইব বলিয়া—আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শিকারপুরে লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার পরদিবস বৈকালে আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রধান আমলা প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থানায় পৌঁছিয়া আমাকে জানাইলেন যে সেই রাত্রেই সাহেব সেই কুঠীতে যাইবেন এবং আমাকে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। সাহেব এবং বাঙ্গালীতে কত প্রভেদ, তাহা এই স্থানেই প্রকাশ পাইবে। আমরা দুইজন পালকিতে পরিচিত লোক সমভিব্যাহারে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়াও নিরূপিত স্থানে পৌঁছিতে পারিলাম না। সেই কুঠীর দুই তিন ক্রোশ ব্যবধান সদরপুর গ্রামে আমাদের প্রভাত হইল। এমন সময় দেখিলাম যে স্বয়ং আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট অশ্বপৃষ্ঠে, পশ্চাতে পশ্চাতে একটি মলিন বস্ত্রধারী পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া সেই সদরপুর বাজারে আমাদের নিকট পৌঁছিলেন এবং আমাদের দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "দেখ, আমি সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" তাঁহার নিকট শুনিলাম যে তিনি করিমপুর হইতে একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, পল্‌তার কুঠীতে পৌঁছিয়া প্রহরীদিগের নিকট তিনি ছোট সাহেব বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাহারা ছোট সাহেব মনে করিয়া কুঠী খুলিয়া দেয় এবং কয়েদী ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করে। কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে তিনি উহাকে অন্য কুঠীতে লইয়া যাইবেন বলিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। আসিষ্টান্ট সাহেবের বিশ্বাস, যে কুঠীর লোকেরা তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট বলিয়া বুঝিতে পারিলে, তিনি এত সহজে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিতেন না। এই মোকদ্দমায়

অবশেষে ট্রীপ সাহেবের শাস্তি—কিছু অর্থদণ্ড মাত্র হইয়াছিল। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে ঐরূপ তৎপরতায় এবং কৌশলের সহিত আসিস্টান্ট মাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে না পারিলে, তাহাকে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইত এবং কে বলিতে পারে যে, সে পুনরায় প্রাণ লইয়া তাহার বাড়ী প্রত্যাগমন করিতে পারিত?

এইরূপ কত শত লোক কুঠী-কুঠী চালান হইয়া শেষে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। শেষ নিরুদ্দেশের দৃষ্টান্ত হাঁসখালির গোবিন্দপুরের গোপাল তরফদার। সেই ব্যক্তি তাহার গ্রামের প্রজাবর্গের সাহায্যে কুঠীর বিরুদ্ধাচরণ করাতে, একদিবস বাত্রে একটি হস্তী সমেত কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়া দীন দরিদ্র চাষী প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুঠপাট এবং অপচয় কবে এবং অবশেষে গোপাল তরফদারকে যৎপরোনাস্তি বে-ইজ্জত করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হন, সেই আর এস টটেনহাম সাহেব তখন কৃষ্ণনগরের মাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি আমাদিগকে লইয়া গোপালের অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে শুনিলাম, যে ধরিবার সময় গোপাল তরফদারকে আঘাত করিয়া ধরা হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নানা স্থানে চালান করাতে, সেই ক্লেশে তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার মৃতদেহ তাহার বন্ধুবান্ধবের হস্তে পড়িতে না পারে, সেই জন্য তাহা নীলের গিঠির দ্বারা জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলা হয়।

কিন্তু গোপাল তরফদারের মৃত্যুই নীলকরের কাল হইল। এ দিকেও বোধ হয় তাহাদের পাপের চারি পোয়া পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। গোপাল মরিয়া যেন কৃষ্ণনগর এবং যশোর জেলার সমুদয় প্রজাকে খেপাইয়া তুলিল। নীলকরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব দাবানলের ন্যায় হুহু করিয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "মোরা আর নীল করবো না" বলিয়া প্রজারা যে সুর ধরিল, তাহা আর কেহ নিরস্ত করিতে পারিল না। ধন্য প্রজার প্রতিজ্ঞা। নীলকর সাহেবদিগের এত দর্প, ক্ষমতা, এত ধন,—সকলই প্রজার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে জলের মধ্যে মৃন্ময় প্রতিমার ন্যায় গলিয়া গেল। যে সাহেবদিগের ইঙ্গিতে শত সহস্র লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা আসিয়া একত্রিত হইত, তাঁহারাই প্রজাদিগের ভয়ে কম্পিত হইয়া, স্বীয় স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সেনা আনিয়া স্থাপিত করিতে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টেও নীলকরের সাহায্যার্থ এই সময় এক বিশেষ আইন প্রকটন করিলেন যে—যে সকল প্রজারা নীল করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা নীল না করিলে কারারুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাতেও প্রজারা ভয় পাইল না। বলিহারী প্রজাদিগের একতা এবং সাহস। তাহারা

একস্বরে বলিল যে জেলখানায় যাওয়া তুচ্ছ কথা, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিলে তাহারা গলা বাড়াইয়া দিবে, "তবু মোরা নীল করবো না।" বাস্তবিক তাহারা দলে দলে জেলখানা যাইতে লাগিল। এই কার্য্যে কৃষীবর্গের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে আর এ জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবে না। চাপরাশি বরকন্দাজেরা দামুরহুদা প্রভৃতি স্থান হইতে যখন প্রজাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাইত, তখন পথের সকল গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা খাদ্যসামগ্রী হস্তে লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইত এবং চাপরাশিদিগকে কোনও স্থানে কাকুতি মিনতি করিয়া এবং কোনও স্থানে ঘুস দিয়া বন্দী প্রজাদিগকে খাওয়াইত এবং ধন্যবাদের সহিত উৎসাহের বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে কতক দূর তাহাদিগের সঙ্গে যাইত। একদিকে যথার্থ ধর্ম্মাবতার দেশের সেই সময়ের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সর জন পিটার গ্রান্ট সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে প্রজা এবং নীলকরের মধ্যে তিনি অপক্ষপাতরূপে বিচার করিবেন, আর একদিকে সুপণ্ডিত দেশহিতৈষী দযার সাগর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রে সপ্তাহে সপ্তাহে গরিব প্রজাদিগের দুঃখের কাহিনী প্রচার করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলের উপরে স্বয়ং প্রজাদিগের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং প্রতিজ্ঞাই প্রবলশক্তি হইয়া উঠিল। ঐ ত্রিবিধ অস্ত্রে প্রজাদিগের চিরশত্রু সংহারিত হইল। সেই পর্য্যন্ত নীলের চাষ উঠিয়া গেল এবং সাহেবেরা জাল গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ করিয়া ইটকাঠ বিক্রয় হইয়া গেল এবং কুঠীর হাউজ প্রভৃতিতে শৃগাল-কুকুরের বাসস্থান ও জঙ্গল হইয়া পড়িল। সে ঐশ্বর্য্য এবং বিক্রম এখন কোথায়? সে রাবণও নাই সেই লঙ্কাও নাই।

চোরের আবদার

বঙ্গদেশে অতি অল্প লোকের নিকট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্ববচন্দ্র ঘোষালেব নাম অপরিচিত আছে। নিজ কলিকাতায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায়, এবং কৃষ্ণনগরের শান্তিপুর অঞ্চলে—তাঁহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ঈশ্বরবাবু একজন বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা এবং কার্য্যদক্ষতার জন্য সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত। পেনসন লইয়া চাকরী হইতে অবসর হওয়ার পর গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। শান্তিপুরেতেই তাঁহার নাম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ হয়। এইস্থানে তিনি প্রথম মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত করিয়া নগরে অনেক উন্নতিসাধন, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, এবং শান্তি সংস্থাপন করেন, এবং সেই কার্য্য করিতে গিয়া তিনি অনেকের কোপদৃষ্টিতে পড়িযাছিলেন এবং অধিবাসীরা তাঁহাব শত্রুতাও করিয়াছিল। তিনি যে সর্ব্ব বিষয়ে ঐকান্তিক ঋষিপুরুষ ছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তাঁহার দোষ হইতে গুণের ভাগ অধিক ছিল। এই সময়ে শান্তিপুরে আর একজন বিখ্যাত মনুষ্য ছিলেন—শান্তিপুরের জমিদার বাবু উমেশচন্দ্র রায়; তাঁহাকে লোকে সাধারণতঃ মতিবাবু বলিয়া জানিত। বৈষয়িক বুদ্ধিতে মতিবাবুর তুল্য তখন বঙ্গদেশে অতি অল্প লোক ছিল। জগৎবিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই মতিবাবুকে তাঁহার অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কূটবুদ্ধির প্রখরতা দৃষ্টে বলিয়াছিলেন যে "এই মতির জোড়া মেলা ভার।" সকলেই অবগত আছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যান্য গুণের মধ্যে মনুষ্যের চরিত্র নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে ছিল, অতএব তিনিই যখন মতিবাবুর বুদ্ধির জটিলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মতিবাবু শান্তিপুরের কিয়দংশের জমিদার ছিলেন, কিন্তু কিয়দংশ হইলে কি হয়, তাঁহার এমনই বুদ্ধি কৌশল এবং প্রতাপ ছিল যে শান্তিপুরের

বড় ছোট সকল অধিবাসীগণের উপরে তাঁহার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার অমতে কাহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং যাহাকে যে দণ্ড করিতেন কিম্বা শাস্তি দিতেন তাহা দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের নতশির করিয়া মানিয়া লইতে হইত। মতিবাবুর দণ্ডের মধ্যে অর্থদণ্ডই অধিক পরিমাণে ছিল এবং তাহা না দিলে শান্তিপুরে তাহার বাস কবা কঠিন হইত। ফলে শান্তিপুরে মতিবাবুর একাধিপত্য ছিল।

ঈশ্বরবাবু শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হওয়ার পূর্ব্বে লো সাহেব নামক একজন গোরা শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সাহেব পরে কলিকাতার পুলিশের সুপারিন্টেডেন্ট হইয়া খুব যশ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বুঝি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতার পুলিশের মাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ইনি শান্তিপুরে আসিয়া মতিবাবুব কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীব কূটবুদ্ধির সম্মুখে তিনি এমন পরাস্ত হইয়াছিলেন, যে অবশেষে নিজের চেষ্টায় তাঁহাকে শান্তিপুর হইতে বদলী হইতে হইয়াছিল। মতিবাবুর চরম উন্নতি সময়ে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া শান্তিপুবের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না, থাকিলে তিনি তাঁহার অতুল্য মতির যোড়া দেখিতে পাইতেন। ঈশ্বরবাবু দেখিলেন যে শান্তিপুরের মতিবাবু অদম্য এবং মতিবাবুকে দমন করিতে না পারিলেও শান্তিপুরের অধিবাসীগণের শান্তি হইবে না। তিনি আরও দেখিলেন যে কেবল প্রচলিত আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুর প্রতাপের খর্ব্বতা করা দুঃসাধ্য, অতএব তিনি তৎকালের নূতন প্রকটিত মিউনিসিপাল আইন পরিচালনের দ্বারা মতিবাবুকে দমন করার কল্পনা করিলেন। কিন্তু সেই আইনও অধিবাসীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং মতিবাবুকে সম্মত করিতে না পারিলে অধিবাসীরা সম্মত হইবে না। অতএব ঈশ্বরবাবু মতিবাবুর সহিত এমন সৌহৃদ্যতা ও বন্ধুতা সংস্থাপন করিলেন এবং আইনের দ্বারা মতিবাবুর এত অধিক উপকার এবং লভ্য হওয়ার প্রলোভন দেখাইলেন, যে অল্প কালের মধ্যেই তিনি মতিবাবুকে ভুলাইয়া আইনটি শান্তিপুরে চালাইতে পারিলেন। স্বকার্য্যসাধন করার পরেই ঈশ্বরবাবু তাঁহার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং পদে পদে মতিবাবুকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মতিবাবু তখন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইয়া এই আইন শান্তিপুর হইতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন এবং ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিন্দাসূচক অনেক দরখাস্ত দেওয়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমশঃ ঈশ্বরবাবু এমন বুদ্ধিকৌশল পরিচালনা করিলেন যে শান্তিপুরে মতিবাবুর স্থলে ঈশ্বরবাবুরই প্রভুত্ব হইয়া উঠিল। ইহার পরে আমি কিছুকালের নিমিত্ত হাঁসখালির থানায়

ছিলাম, সেই স্থানে মতিবাবুর সহিত আমার একদিবস সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথার মধ্যে আমি তাঁহার শান্তিপুরের প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করাতে তিনি কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে আমাকে বলিলেন যে "দারোগাবাবু! আমাকে আর ওকথা বলিবেন না, আমি এখন শান্তিপুরের কুকুরটাকেও ছেই করি না।" মতিবাবুর নিজের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনি কতদূর অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মতিবাবু দীনদয়াল পরামাণিক নামক শান্তিপুরের একজন বিত্তশালী ব্যক্তির নামে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে এক মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে বিখ্যাত বিচারপতি সর মর্ডান্ট ওয়েলস তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য কলিকাতার বড় ফাটকে প্রেরণ করেন এবং সেইখানে দণ্ডের কাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বে মতিবাবু লোকান্তর গমন করেন। মতিবাবুর মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু ঈশ্বরবাবুর প্রতি মতিবাবুর দলের লোকের শত্রুতা গেল না। তাহারা পুনরায় কি এক কারণে ঈশ্বরবাবুর বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করাতে বঙ্গের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ঈশ্বরবাবুকে ছয় মাসের নির্ব্বাসনের ন্যায় কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমায় থাকিতে আদেশ করিলেন এবং ঈশ্বরবাবু তদনুসারে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ীর বড় সড়কের পূর্ব্বধারে রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বাবুদিগের দুইখানা দোতলা বাসাবাড়ী আছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনই তাহা খুব পুরাতন হইয়াছিল, এক্ষণে কি অবস্থায় আছে তাহা বলিতে পারি না। বাড়ী দুইখানা পাশাপাশি এবং প্রত্যেকের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত হাতা এবং হাতা ইটের প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার দক্ষিণদিকের বাড়ীতে ঈশ্বরবাবু বাসা করিলেন এবং উত্তরের বাড়ীতে সরভে বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর বাবু অভয়চরণ মল্লিক বাস করিতেন। ঈশ্বরবাবুই আমাকে নবদ্বীপ থানার দারোগা পদে নিযুক্ত করেন এবং তদবধি আমাকে যেমন অনুগ্রহ করিতেন, তেমন আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। কৃষ্ণনগর আসিলে পরে আমি তাঁহার নিকট প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে যাইয়া রাত্রি ৯/১০টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতাম এবং মধ্যে মধ্যে উক্ত অভয়বাবুও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ দুই-তিনমাসের পরে একদিবস প্রত্যূষে ঈশ্বরবাবুর খানসামা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে "গত রাত্রে চোরে বাবুর শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন চলুন।" আমি যাইয়া দেখি যে ঈশ্বরবাবু এবং অভয়বাবু একত্র বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই অভয়বাবু আরক্ত লোচনে ইংরাজীতে আমাকে বলিলেন যে "আমি মাজিষ্ট্রেট হইলে তোমাকে এইক্ষণে বরতরফ করিতাম।

তোমাকে কি জন্য এত মোটা টাকা বেতন দেওয়া যাইতেছে, যদি তুমি চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিতে না পারিবে।" কিন্তু ঈশ্বরবাবু তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন যে "দারোগা তুমি এই পাগলের কথায় ব্যাজার হইও না, ও এই সকল বিষয়ের কি জানে?" আমি অভয়বাবুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলাম। এই স্থানে ঈশ্বরবাবুর শয়ন কক্ষের দৃশ্যটা বর্ণনা না করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন না যে চোরে কি অসম সাহসীরূপে এই ঘরে চুরি করিয়া গিয়াছিল। ঘরের দুই কোণে দুইটি দুনলী বিলাতী বন্দুক; চারি প্রাচীরের গায় চারিখানা তরবার ও চারিটা ঢাল ঝুলিতেছিল। ঈশ্বরবাবু এক নেওয়ারের অর্থাৎ ফিতার খাটে শয়ন করিতেন, শিয়রে একটা সেই সময়ের নূতন আবিষ্কৃত রিবল্‌বার পিস্তল ও দুই পার্শ্বে দুইখানা ভুটিয়া ভোজালী, পদতলে একখানা বিলাতী হেঙ্গার তরবার। তদ্ভিন্ন ঘরের মধ্যে দুইটা মুদ্গার, একটা লেজাম ও কতকগুলি শূকর শিকারের বল্লমও ছিল। বন্দুক ও পিস্তল প্রত্যহ শয়ন করার পূর্ব্বে তৈয়ারও করিয়া রাখিতেন। ঘর দেখিয়া বাঙ্গালীর ঘর বলিয়া বোধ হইত না, কোন যোদ্ধার ঘর বোধ হইত। ঈশ্বরবাবু সখ করিয়া কেবল শোভার নিমিত্ত এই সকল অস্ত্র রাখিতেন এমন নহে, নিজে অস্ত্র চালাইবারও তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং শিকার করিতে বড় ভালবাসিতেন। এই সকল অস্ত্র চতুষ্পার্শ্বে করিয়া এই বীরপুরুষ শুইয়াছিলেন, চোর আসিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে চোরের যে কি অবস্থা হইত, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে এবং চোরেরও ধন্য সাহস ও চতুরতা যে এইরূপ বিপদ এড়াইয়া সে তাহার কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দেখিলাম যে বাঁশের একটা বড় মই-সিঁড়ি দোতালার জানালায় লাগাইয়া জানালার গরাদিয়া কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরবাবুর কোট, পেন্টেলুন, কামিজ প্রভৃতি অনেক পরিধেয় বস্ত্র ও পোষাক, ফুলাল তৈলের ও শেরির ৪টা বোতল ও নানাবিধ কাঁচের গ্লাশ, কাঁটা চামচ, স্ক্রুপ, সোনার ঘড়ি ও চেন, রূপার গেলাস বাটী, রেকাব, হুঁকা, গুড়গুড়ী, পানের ডিপা, সোনার নস্যদানী ও একটা পেনসিল কেস, নগদ কয়েকখানা গিনি মোহর ও প্রায ১০০ টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আমি দেখিয়া স্তম্ভিত, কি করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরবাবু আমাকে সকলের নিকট প্রচার করিতে অনুমতি করিলেন, যে যদি কেহ চোর ধরিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তিনি ১০০টাকা পুরস্কার দিবেন। এই ঘটনার চারি দিবস পূর্ব্বে গোয়াড়ীর বাজারে এক বাড়ীতে ঠিক এইরূপ দোতলার জানালা ভাঙ্গিয়া একটা চুরি হইয়াছিল। অতএব উপর্য্যুপরি অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রণালীর দুইটি চুরি হওয়াতে গোয়াড়ীর অধিবাসীগণের মনে অত্যন্ত আতঙ্ক জন্মিল এবং তাহা জন্মিবারও

কথা। সকলে আমাকে বলিল যে এই চোর ধরিতে না পারিলে গোয়াড়ীর কখন কাহার সর্ব্বনাশ হয়, তাহার ঠিকানা নাই। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এই চোর আবিষ্কার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বুদ্ধু নামে আমার অধীনে একজন বরকন্দাজ ছিল, সে পূর্ব্বে বিখ্যাত বদমাএস ও চোর ছিল—আমি তাহাকে প্রথমে চৌকীদারী ও পরে বরকন্দাজী দিয়া আমার নিকটে রাখিয়াছিল। সে ব্যাটা চোর ধবার কার্য্যে এমন পণ্ডিত ছিল যে সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারিত যে ইহা অমুক চোরের, কিম্বা ইহা দেশী বা বিদেশী চোরের কার্য্য। ফলে তাহার সন্ধান অব্যর্থ ছিল এবং তাহাকে আমি রাখিবার পরে কৃষ্ণনগরে চুরি এককালে তিরোহিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। বুদ্ধু এই দুই চুরি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। সে বলিল যে ইহা কোন নূতন ব্যক্তির কার্য্য, দেশী চোরের কর্ত্তৃক হয় নাই। তথাপি আমি কৃষ্ণনগরের সকল বদমাএসকে ধরিয়া আনিয়া কত প্রহার করিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না। ইংরাজীতে বলে যে জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণ অবলম্বন করিয়াও বাঁচিতে চেষ্টা করে। আমার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। আমার চিত্ত এমন ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে আমাকে যে যাহা পরামর্শ দিত, তাহাই আমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে শুনিলাম যে নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী ঠাকুর আসিয়াছেন তাঁহার গণনা অতি চমৎকার। গেলাম, সেই জ্যোতিষীর নিকটে। তিনি তাঁহার পাঁজি পুথি বাহির করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে "পুব, পুব, দক্ষিণ দক্ষিণ।" "খর্ব্বাকার,লম্বা চুল, খড় ঢাকা" ইত্যাদি বাতুলের ন্যায় নানা অসংলগ্ন বাক্য ব্যয় ও পুথি নাড়াচাড়া করিয়া দুই ঘন্টা সময় অপচয় করিলেন। ফল, কোনরূপ চেষ্টা করিতে আমি ত্রুটি করিলাম না।

থানার এক রীতি ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস থানার অধীনস্থ সকল গ্রামের চৌকীদারেরা ও ফাঁড়ির বরকন্দাজেরা দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মহল্লার সংবাদ ব্যক্ত করিত। এই চুরির পরে আমি সকল চৌকীদার এবং ফাঁড়িদার বরকন্দাজকে এই ঘটনার ও চোর ধরিয়া দিতে পারিলে ১০০টাকা পুরস্কারের সংবাদ জানাইয়া তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ঈশ্বরবাবুর বাসায় যাই এবং প্রত্যহই অভয়বাবুর অনুযোগ তিরস্কার শ্রবণ করি। এমন করিয়া কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। চুরির নবম দিবসে ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গৃহে যাইতেছিলাম, এমন সময় থানার নাএব দারোগা আমাকে থানার মধ্যে ডাকিয়া বেলপুকুরের ফাঁড়িদার রামহিত ওঝা বরকন্দাজের প্রেরিত একখানা পত্র দেখাইল, তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা ছিল যে "পত্রপাঠ চলিয়া আসিবেন,

এক ব্যক্তির উপরে আমার সন্দেহ হইতেছে।" আমি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরবাবুর নিকট পুনরাগমন করিয়া তাঁহার দ্রব্য সকল চিনিতে পারে এমন একজন চাকর সঙ্গে লইয়া বেলপুকুর যাত্রা করিয়া শেষ রাত্রিতে সেইখানে পৌছিলাম। ফাঁড়িদার বলিল যে সন্নিকটস্থ সুজনপুর গ্রামে ছিরা কায়েত নামে একজন প্রসিদ্ধ বদমাএস আছে, তাহাকে লোকে ছিরা চোর বলিয়াও ডাকিয়া থাকে। সে অদ্য ৪/৫দিবস অবধি বেলপুকুরের বাজারের এক বেশ্যার বাটীতে প্রত্যহ রাত্রিতে খুব সরাপ খাইতে ও ধূমধাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং লোক তাহাকে নূতন নূতন রকমেব বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দেখিয়াছে, ইহাতে ফাঁড়িদার সন্দেহ করিয়া আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে। আমি সেই বেশ্যার বাড়ী যাইয়া দেখি যে তখনও তাহারা বসিয়া সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিতেছে। ছিরাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা বাঁশের আলনার উপরে একটা কামিজ ও পেন্টুলন ঝুলিতেছে দেখিয়া ঈশ্বর বাবুর খানসামা বলিয়া উঠিল যে উহা তাহার বাবুর পোষাক। ছিরা তখন সরাপের নেশাতে বিভোর, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না। আমি তাহাকে ফাঁড়িঘরে প্রেরণ করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম যে সে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি। আমি যখন নবদ্বীপ থানাতে ছিলাম তখন এই বেশ্যাও সেই থানার নিকটে বাস করিত। সে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিল যে ছিরা অদ্য কয়েক দিবস ধরিয়া তাহার নিকট আসিয়া প্রত্যহ অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে এবং একবাক্স পোষাক ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া তাহার ঘরে রাখিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কিম্বা কোন্ স্থান হইতে আনিয়াছে তাহা সে জানে না। প্রাতে বেলপুকুরের বাজারের কয়েকজন লোক আনিয়া তাহাদের সমক্ষে বেশ্যার ঘর হইতে এই বাক্স বাহির করিয়া দেখিলাম যে তাহার মধ্যে সোনা-রূপার দ্রব্য সকল ভিন্ন আর সমুদায় অপহৃত দ্রব্য এবং বস্ত্র আছে। সুজনপুরের নীলকুঠীর মালিক মেঃ ডুরেপ ডি ডম্বাল সাহেব আমাকে বলিলেন যে ছিরা ধৃত হওয়াতে তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইল, কারণ ছিরা প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কুঠীর দ্রব্যজাত চুরি করিত। সুজনপুর গ্রামে যাইয়া ছিরার বাড়ী তল্লাস করিলাম কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে অনেক প্রহার খাইয়া ছিরা কহিল, যে সে গোয়াড়ীর খেয়াঘাটের ঈজারাদার একজন বৈরাগীর সঙ্গে একত্রে এই চুরি করিয়াছিল, এবং সোনারূপার দ্রব্য সকল সেই বৈরাগীর নিকট আছে। কিঞ্চিৎ বেলা থাকিতে আমরা কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিয়াই প্রথমে সেই বৈরাগীর খানাতল্লাসী করিলাম, কিন্তু সেই স্থানে কিছুই পাইলাম না। ইতিমধ্যে ঈশ্বরবাবুর বাড়ীর চুরির চোরামাল ও চোর ধৃত হওয়ার কথা শুনিয়া তাহা দেখিতে গোয়াড়ীর রাস্তায় এত লোকের সমাগম হইল যে ঈশ্বরবাবুর বাসাতে পৌছিয়া

দেখিলাম, যে তাঁহার বাড়ীর ভিতর লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি ধৃত দ্রব্য সকল লইয়া ঈশ্বরবাবুর বাড়ীর উত্তর ধারের রোয়াকের উপরে বসিলাম, ঈশ্বরবাবু ও তাঁহার অভয়বাবু দোতালার জানালায় গলা বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমি এক একটি দ্রব্য বাহির করিয়া এই "কামিজটি কার" বলিয়া জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরবাবু উপর হইতে বলেন "আমার।" এইরূপে সমুদায় দ্রব্যগুলি ঈশ্বরবাবু তাঁহার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পরে আমি ছিরাকে রীতিমত ধৃত দ্রব্য সমস্ত সমভিব্যাহারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলাম। সেই জ্যোতিষী ঠাকুর সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার গণনার বলেই আমি এই চোর ধরিয়াছিলাম, এবং তাঁহার শ্রোতাগণের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিমান লোক ছিলেন যে, তাহাই তাঁহারা বিলক্ষণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নচেৎ, তাহার এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন কেন যে "দৈববল ভিন্ন এমন চোর ধরা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে।" যাহা হউক, অন্য মোকদ্দমা হইলে তাহা এই স্থানেই শেষ হইয়া যাইত কিন্তু ইহা সেরূপ হইল না, ইহার রহস্যের ভাগ রহিয়া গেল, বিবৃত করিতেছি।

চোর ধরিলাম, মাল ধরিলাম, গোয়াড়ীর অধিবাসীরা নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইল কিন্তু ঈশ্বরবাবুর সন্তোষ হইল না। তিনি আমাকে সেই রাত্রিতেই আহারের সময় বলিলেন যে "দারোগা তোমার কার্য্য তুমি একরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিলে কিন্তু আমার কিছুই উপকার হইল না, আসল টাকার মাল চোরের হস্তে রহিয়া গেল, বিশেষ সোনার ঘড়িটা যাহা আমি বিলাত হইতে ফরমাইস দিয়া আনিয়াছি, তাহা না পাইলে আমার কিছুতেই সন্তোষ হইবেনা।" আমি কি করিব? চোরকে যত প্রহার করিতে হয়, তাহা আমি করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি সে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি দিল না; বিশেষ সে এক্ষণে আমার হস্তে নাই হাজতে গিয়ছে এবং মোকদ্দমাও একপ্রকার শেষ হইয়াছে। তথাপি ঈশ্বরবাবু আমাকে উত্তেজনা করিতে ছাড়িতেন না। সর্ব্বদা বলিতেন যে "তুমি চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে অবশ্য আমার ঘড়িটি আবিষ্কার করিতে পারিবে।" আমি অগত্যা জেলখানায় যাইয়া ছিরাকে ডাকিয়া অনেক মিথ্যা আশা-ভরসা দেখাইলাম কিন্তু সে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে নিশ্চয় বলিল যে তাহার নিকট ঐ সকল দ্রব্য নাই। যাইয়া এই সংবাদ ঈশ্বর বাবুকে বলিলাম কিন্তু তিনি ছাড়িবার ব্যক্তি ছিলেন না। আমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। ফলিতার্থে আমার এই বিষয়ে তাঁহার ন্যায় আর উৎসাহ ছিল না। কারণ, আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি আর পাওয়া যাইবে না।

শুখাকালে কৃষ্ণনগরের স্থানে বড় জলকষ্ট হইত, থানায় এক ছোট পুষ্করিণী ছিল,

তাহাতে কায়কষ্টে স্নান করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য চলিত না। আমীনবাজারের পুষ্করিণী বড় বটে, কিন্তু তাহাতে জল থাকিত না। কেবল জেলখানার দক্ষিণে লালদীঘির জল উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী ছিল, কিন্তু তাহাতে কেহ স্নান করিতে পাইত না, কেবল আমি জেলদারোগার অনুমতি লইয়া তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্নান করিতাম এবং স্নান করিতে যাইয়া জেলদারোগার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতাম। সেই সময়ে নৈহাটী নিবাসী বাবু রাজীবচন্দ্র মিত্র ঐ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমার বন্ধুতা থাকাতে আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতাম। উপরোক্ত ঘটনা সমস্তের প্রায় ১০/১২ দিবস পরে আমি একদিন প্রাতে জেলদারোগার নিকট বসিয়াছিলম; এমন সময় দেখিলাম যে হাজতের আসামীরা পেতনীপকুর নামক জেলখানার সম্মুখস্থিত একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া জেলখানার ভিতরে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আমার শ্রীধরও ছিলেন। ছিরা আমাকে দেখিয়া তাহার প্রহরী বরকন্দাজকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে চাহে। ছিরা আসিয়া আমাকে বলিল যে "দারোগা মহাশয়! হাজতে থাকিয়া আমার সুবুদ্ধি উদয় হইয়াছে, আমি অবশিষ্ট মাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছি, ফলে বৈরাগী আমার সঙ্গেও ছিল না এবং মালও তাহার হস্তে নাই। মাল আমার নিজ গ্রামে আমার একজন জ্ঞাতির নিকট আছে, আপনি আমাকে একবার সুজনপুর লইয়া যাইতে পারিলে, সেই মাল দেখাইয়া দিতে পারিব।"

দারোগা। তুমি এক্ষণে হাজতের আসামী; তোমাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া স্থানান্তর লইয়া যাইতে আমার ক্ষমতা নাই। আমি তাহা করিতে পারিব না, তোমার যদি যথার্থই সন্তাপ হইয়া থাকে এবং মালগুলি দেওয়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং কোন্ স্থানে সে মাল গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলেই আমি সেই স্থানে যাইয়া তাহা উদ্ধার করিতে পারিব।

চোর। না আপনি তাহা পারিবেন না, আমি সেখানে নিজে গমন না করিলে অন্যের কাহারও সাধ্য হইবে না।

দারোগা। তবে ইহাতে তোমার আরও কিছু অভিসন্ধি আছে।

চোর। থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ইহা উপলক্ষ করিয়া আপনার হস্ত হইতে পলাইবার চেষ্টা করিব, এমন যেন আপনি মনে না করেন।

দারোগা। তাহা যে তুমি করিবে না, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব।

চোর। আপনি যদি তাহা মনে করেন, তাহা হইলে আপনি পাগল। আমি যদিও

দুরদৃষ্টবশতঃ চোর হইয়াছি তথাপি আমি ভালমানুষের ছেলে, লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ জানি, অতএব আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই, যেখানে যাইয়া ইংরাজের হস্ত হইতে লুকাইয়া থাকিতে পারিব। অতএব আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন, আমি পলাইব না। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যেমন করিয়া হউক, আপনি আমাকে সুজনপুর না লইয়া গেলে, আপনি সেই অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি পাইবেন না।

ছিরার এইসকল কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ করিয়া বলিলাম যে, আমি কল্য প্রাতে যাহা হয় তাহাকে জানাইব। ঈশ্বরবাবুকে জানাইলাম। তাঁহার ইচ্ছা যে যেন তেন প্রকারেণ মালগুলি পাইলেই হয়; অতএব তিনি ছিরার কথায় কোন দোষ দেখিলেন না এবং আমাকে ছিরার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমের আবশ্যক কিন্তু সেই সময়ে মাজিস্ট্রেট মেঃ এফ, আর, ককরেল্ সাহেব তখন মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন, কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার সমুদায় কার্য্যের ভার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মৌলবী ইএতজাদ হোসেনের হস্তে অর্পিত ছিল। মৌলবি সাহেবের ন্যায় ধর্ম্মভীত এবং নিরীহ ভালমানুষ আমি চক্ষে দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন যে "বাবু আমি আর কিছু জানি না, তুমি যদি আসামীর জেম্বা হইয়া বাহির করিয়া লইতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি হুকুম দিতে পারি।' আমি অগত্যা তাহা স্বীকার করাতে তিনি জেলদারোগাকে সেই হুকুম প্রদান করিলেন।

পরদিবস প্রাতে আমি ছিরাকে জেলখানা হইতে বাহির করিয়া থানায় লইয়া যাইতে চাহিলাম কিন্তু সে থানায় যাইতে অস্বীকার করিল। বলিল যে "আমি এখন থানায় যাইব না, আমাকে আপনার বাসায় লইয়া চলুন, আমি অনেক দিন ভাল দ্রব্য খাইতে পাই নাই, একটা রুই মুড়া ও দধি দুগ্ধ সন্দেশ খাইতে বড় সাধ হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ান।" আমি তাহাই করিলাম। বাসায় লইয়া যাইয়া সেইরূপ আহারের উদ্যোগ করিলাম ও চৌকীদার দ্বারা তাহার স্নানের জল আনাইয়া দিলাম। অন্য ভদ্রলোকের ন্যায় সে আমার বিছানায় বসিল, আমার হুঁকায় তামাকু খাইল, আমার গামছা ব্যবহার করিয়া স্নান করিল এবং অবশেষে একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মত বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিল এবং ভোজন করিয়া খুব তৃপ্তি প্রকাশ করিল। ভোজনান্তে থানায় যাইয়া শয়ন করিল। এবং নিদ্রাভঙ্গের পরে আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল যে "দারোগা* মহাশয়, আপনি জানেন যে আমার শরাব খাওয়ার অভ্যাস আছে, —আমাকে ঈশ্বরবাবুর নিকট হইতে সেইরূপ এক বোতল শরাব আনাইয়া দিলে বড়

ভাল হয়, কিন্তু তাহা থানায় বসিয়া খাইব না, আমীনবাজারে রমণী নাম্নী আমার এক প্রণয়িনী আছে, আমি তাহার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়া অদ্য সমস্ত রাত্রি আমোদ করিতে চাহি। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে আমার নিস্তার নাই, ৫/৭ বৎসরের জন্য আমাকে কয়েদ থাকিতে হইবে এবং তাহা হইতে বাঁচিয়া পুনর্ব্বার বাড়ী যাইব কি না সন্দেহ, অতএব মনের সাধ মিটাইয়া আজকার একটা রাত্রি যদি আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কাটাইতে দেন, তাহা হইলে চিরকাল আপনার এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখিব। আমি পালাইবার চেষ্টা করিব বলিয়া আপনি যেন কিছুমাত্র আশঙ্কা করেন না, আর এক কথা এই যে আমি যখন রমণীর ঘরে থাকিব তখন সেখানে যেন কোন চৌকীদার কিম্বা বরকন্দাজ আমাদের উপরে প্রহরী স্বরূপে বসিয়া আমাদের আমোদের বিঘ্ন না করে।" ছিরার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। হাসিব কি রাগ করিব, স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে "ইহাও একটি কম মজার তামাশা নহে" বলিয়া আমার মনে উদয় হওয়াতে আমি ছিরার সমুদায় অনুরোধ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলাম। অভয়বাবু শুনিয়া "ছি ছি" করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ঈশ্বরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন যে "যাও ব্যাটার আবদার প্রতিপালন করা উচিত, পুলিশ আমলার এই সকল কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তাঁহার নিকট হইতে দুই বোতল শেরী লইয়া আমীনবাজারে রমণী বেশ্যার বাড়ীতে গমন করিলাম। আমীনবাজার নিজ কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ির মধ্যস্থল এবং এইস্থানে একটি ভাল বাজার ও নীচ বেশ্যাদিগের উপনিবেশ আছে। রমণীকে সকল কথা অবগত করিয়া ছিরা তাহার ঘর হইতে পলয়ান করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম এবং অধিক শরাবের আবশ্যক হইলে আবগারীর দোকান হইতে যত ইচ্ছা শরাব আনিয়া লইতে বলিলাম এবং আরও কহিলাম, যে ছিরা যাহাতে শীঘ্র হইয়া অজ্ঞান হয়, তাহা যেন রমণী চেষ্টা করে। তদুত্তরে রমণী মাথা নাড়িয়া কহিল যে "দুই কলসী মদ খাইলেও ছিরার কিছু হইবে না।" পরে রমণীর বাড়ীর পার্শ্বস্থ বেশ্যাদিগকে সতর্ক করিয়া কৃষ্ণনগরের অনেক পাড়া খালি করিয়া চৌকীদার আনিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে এক-একজন প্রহরী বসাইয়া দিলাম। থানার সমস্ত বরকন্দাজগুলিকেও স্থানে স্থানে রাখিলাম এবং তাহাদের উপরে

---

* ভগিনী সুরুচি এই স্থানে আপনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা না করিলে, আমি মারা যাই। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন বঙ্গদেশে আপনার আবির্ভাব হয় নাই সুতরাং তখন আপনার নিয়মের বিরুদ্ধে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছি, যাহার জন্য আমরা এইক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত আছি। কিন্তু যে স্থলে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই আমার সঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেও পারিতেছি না—ক্ষমা প্রার্থনা করি।

থানার ও বালাগস্তির জমাদারদ্বয়কে মোতায়েন করিলাম এবং সকলের উপরে স্বয়ং রমণীর বাড়ীর নিকটে—এক দোকানদারের দোতালা ঘরে শয়নের উদ্যোগ করিলাম। সেই ঘর হইতে রমণীর বাড়ী দেখা যায়। এইরূপ সাবধান হইয়া ছিরার আবদার পালনে ব্রতী হইলাম। সন্ধ্যার পরে ছিরা পুনরায় আমার বাসাতে আহার করিয়া আমীনবাজার যাইবার পূর্ব্বে আমার চাকরের নিকট হইতে আমার একখানা পরিধেয় কোঁচান ধুতি ও চাদর চাহিয়া লইয়া পরিধান করিল, এবং কিঞ্চিৎ আতরও চাহিয়া লইয়া আমার জুতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার জুতা তাহার পায়ে ছোট হইল। পরে আমার বাসা হইতে নির্গত কিম্বা বরকন্দাজের সহিত যাইতে অসম্মত হইল। আমরা যাইতে আরম্ভ করিলাম, কোন বরকন্দাজ কিম্বা চৌকদার না দেখিয়া সে বড় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু আমাদের পশ্চাতে এক ব্যাটা দাড়ীওয়ালা মুস্কিল-আসান একটা মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছিল। সেই মুস্কিল-আসান আমার বুদ্ধু বরকন্দাজ। ছিরাকে রমণীর বাড়ীতে পৌঁহুছাইয়া আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম এবং সেই দ্বিতল কক্ষ হইতে সমস্ত রাত্রি রমণীর ঘরে হাসি তামাশার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমাদের কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, অবশেষে ভোর হওয়ার পূর্ব্বে ছিরা টলিতে টলিতে থানায় প্রত্যাগমন করিল এবং আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই দিবস ছিরা সুজনপুর যাইতে পারিল না। পরদিবস নায়েব দারোগার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। নায়েব দারোগা প্রত্যাগতে মোহর ও টাকা ব্যতীত অপহৃত সমুদয় সোনা-রূপার দ্রব্য ও চেন সমেত ঘড়িটা আনিয়া উপস্থিত করিয়া ব্যক্ত করিল যে, ছিরার জ্ঞাতির কথা মিথ্যা, সে নিজেই এক গোপনীয় স্থান হইতে ঐ দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া দিল। দায়রার বিচারে ছিরার ছয় বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল এবং ঈশ্বরবাবু তাঁহার ঘড়িটি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহিত সেক-হ্যাণ্ড করিলেন। চোরের আবদারের কথাও আমার এইস্থানে সমাপ্ত হইল।

চোর বড়, না দারোগা বড়?

চোরের অনুসন্ধানশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ এবং অব্যর্থ, তাহা যাঁহারা সে কর্ম্মের কর্ম্মী নহেন, তাহারা সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারেন না।

আমাকে একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বাসস্থানের নিকট এক গ্রামে ইদাজোলা নামক একজন অতি বৃদ্ধ মনুষ্য ছিল; তাহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে এমন চোর ও ডাকাইত ছিল, যে জীবনের অধিকাংশ কাল জেলখানায় অতিবাহিত হইয়াছিল; ইদা যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইত, তখন অন্যান্য কয়েদীদিগকে বলিয়া আসিত যে "ভাই দেখিস্ তোরা যেন আমার ভাতের হাঁড়িটা নষ্ট করিস্ না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" বাস্তবিকও সে জেলখানা হইতে নির্গত হইয়া, কখন ১০/১৫ দিবস এবং অধিক হইলেও দুই-তিনমাস বাহিরে থাকিয়া, পুনরায় দুষ্কর্ম করিয়া কারাবদ্ধ হইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন হইয়া সে চুরি ডাকাইতি হইতে ক্ষান্ত হয়। এই সময় তাহার হাঁপানী কাশির পীড়া হওয়াতে এবং কবিরাজে ভাল পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়াতে, ইদা ঐ পুরাতন ঘৃতের জন্য সেই ভদ্রলোকটির নিকট আসিল; তিনি জানিতেন যে তাঁহার নিকট ঐ দ্রব্য নাই, তাহাতে ইদা বলিল যে "কি ঠাকুর? আপনি আমাকে কি জন্য প্রবঞ্চনা করিতেছেন? আমি নিশ্চয় জানি যে আপনার ঘরে যেমন পুরাতন ঘৃত আছে, এমন অন্য কোন স্থানে নাই।" তাহাতেও তিনি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করাতে, ইদা জোলা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল যে "আপনি যদি সত্য সত্যই পুরাতন ঘৃতের বিষয়ে অবগত থাকেন, তাহা হইলে আপনি যাইয়া আপনার অমুক ঘরে অমুক দিকের কোণের নিকট মাটি খুঁড়িয়া দেখুন, এক ভাঁড়া বহুকালের ঘৃত পাইবেন।" গৃহস্বামী সেইস্থানে অনুসন্ধান করাতে যথার্থ ঘৃত আবিষ্কৃত হইল। ইদা কহিল, যে সে অবগত ছিল, যে সেই ভদ্রলোকের পিতামহ তাঁহার

নিজের পীড়ার জন্য সেইস্থানে ঘৃত পুরাতন করিবার জন্য একটা ভাঁড়ে মাটির মধ্যে এক সের ভাল গাওয়া ঘৃত পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। দেখুন গৃহস্বামী নিজে যাহা জানিতেন না, তাহা ভিন্ন গ্রামের একজন চোর জানিত। ইহাত গেল আমার শুনা কথা, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও বড় সামান্য নহে। বিবৃত করিতেছি; কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এক বেটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত যুগী ছিল, দেখিতে দরিদ্র, দুইখানা পুরাতন জীর্ণ চালাঘর মাত্র তাহার বিত্ত, এবং পরিবারের মধ্যে কেবল এক বিধবা ভগিনী। লোক দেখান দুই-একজোড়া নূতন কাপড় বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিত। প্রতিবাসীরাও সকলে তাহাকে বিত্তহীন এবং ধনহীন বলিয়া জানিত, কিন্তু একজন চোর জানিতে পারিয়াছিল, যে "ইহার ধুকড়ির ভিতর খাশা চাউল আছে।" একরাত্রে ১০/১৫ জন অস্ত্রধারী মনুষ্য তাহার গৃহ আক্রমণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাতে আমার নিকট সংবাদ আসিলে আমি ঘটনার স্থানে যাইয়া যুগীর ঘরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না যে নিকটে অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বাড়ী থাকিলেও ডাকাইতেরা কি জন্য সেই সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এমন দরিদ্রের বাড়ী ডাকাইতি করিতে আসিল। যুগীও প্রথমে আমার নিকটে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না; কিন্তু তাহার ভগিনীর পরামর্শে সে অবশেষে প্রকাশ করিল, যে অন্যান্য স্থানে তাহার কাপড়ের ব্যবসা আছে এবং তদ্দ্বারা সে অনেক নগদ সম্পত্তি আহরণ করিয়া তাহার দুই ভাঙ্গা গৃহে মাটির ভিতর গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ডাকাইতেরা তাহা জানিতে পারিয়া প্রায় সহস্রাধিক টাকার মূল্যের বস্ত্র ও সোনা-রূপার গহনা ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না। ডাকাইতেরা মুখে কালী চূণ মাখিয়া আসিয়াছিল সুতরাং সে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

যদিও এই ডাকাতি কৃষ্ণনগরের একপ্রান্তে হইয়াছিল তথাপি নগরের সীমানার মধ্যে হওয়াতে আমার ও অধিবাসীগণের অত্যন্ত আতঙ্ক হইলো; ভাবিলাম যে এই কার্য্যের কর্ত্তাদিগকে ধৃত করিতে এবং শাস্তি দিতে না পারিলে, তাহারা যে পুনরায় অন্যদিকে এবং অন্যের বাড়ীতে হস্ত প্রসারণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আমার চর অনুচরদিগকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলাম। আমি প্রত্যহ দুই বেলা যুগীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিতাম কিন্তু দুইতিনদিবস নিষ্ফলরূপে কাটিয়া গেল, কিছুই করিতে পারিলাম না। একদিন প্রাতে আমি যুগীর বাড়ী ঐরূপ যাইতেছিলাম, দেখিলাম যে নেঙটিয়া সেখ নামক একজন প্রতিবেশী পথের মধ্যে আমাকে দেখিয়া বিলক্ষণ সঙ্কুচিতচিত্তে অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা

করিল। যদিও আমি বেশ জানিতাম যে দারোগা দেখিলে ইতর লোক স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হইয়া অন্যপথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে, তথাপি সেই সময় নেঙটিয়ার ঐরূপ ভীরুভাব দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ একপ্রকার সন্দেহ হইল। তাহাকে ডাকিয়া সে কি জন্য আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে সে ভালরূপে আমার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইল এবং আমার বোধ হইল, যেন তাহার কথাগুলি তাহার গলায় বাধিয়া থাকিতেছে, মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতেছে না। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ রাগান্ধভাবে "কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল "যে মহারাজ আমি চুরি করি নাই।" আমার সঙ্গে আমার প্রধান গোয়েন্দা বুদ্ধু বরকন্দাজ ছিল; সে নেঙটিয়ার কথা শুনিয়া "ঠাকুরঘরে কে? না আমি কলা খাইনে; তুই চুরি করিস্ নাই, তবে কে করিয়াছে রে ব্যাটা? চল্ আমার সঙ্গে থানাতে চল্, এখনি দেখাইয়া দিব, কেমন তুই চুরি করিস্ নাই" বলিয়া সে নেঙটিয়ার হাত ধরাতে নেঙটিয়া আমার পা ধরিয়া বলিল যে "দোহাই দারোগা মহাশয়! আমাকে মারিবেন না, আমি যাহা জানি বলিতেছি।" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং তাহার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যের সে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া দিতে সম্মত হইল। আমরা যুগীকে সঙ্গে লইয়া নেঙটিয়ার গৃহে যাওয়াতে, তাহার ঘরের মধ্যে হইতে একটা বড় হাঁড়ীতে চাউল দ্বারা আচ্ছাদিত কয়েক জোড়া নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল এবং যুগীও তাহার দ্রব্য চিহ্নিত করিল। নেঙটিয়া যে সকল ব্যক্তির নাম করে, তাহাদের সকলের নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া গেল এবং সকলেই বলিল যে চিত্রশালী নিবাসী মুন্সী সেখ নামক এক ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার ছিল এবং অপহৃত সোনারূপার অধিকাংশ দ্রব্য তাহারই নিকট আছে।

মুন্সী সেখ থানায় ধৃত হইয়া আসিবামাত্রই তাহার অপরাধ স্বীকার করিল এবং বলিল যে তাহার নিকট কোন দ্রব্য নাই, তবে তাহার সঙ্গীগণ তাহাদের নিজ নিজ অপরাধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহার নাম করিয়াছে। ফলে মুন্সীর ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইল, যে সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই যথার্থ, প্রবঞ্চনা নহে। আমি তাহার কথাগুলি যথাবিধ লিপিবদ্ধ করিয়া সেই লিপিসহ তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

তখন বি পামর নামে একজন যুবা সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া এইবার প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও তিনি জানিতেন না, কিন্তু হিন্দিতে তাঁহার বিলক্ষণ দখল ছিল। চরিত্রও খুব তেজস্বী ছিল। প্রজাদিগের যাহাতে শান্তি হয় এবং বদমায়েস এবং কুচরিত্রের লোকেরা যাহাতে

দমন থাকে; তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি একদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অশ্বপৃষ্ঠে সমস্ত কৃষ্ণনগর ভ্রমণ করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন এবং নগরের কোন স্থানে কোন গোলমাল দেখিতে না পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এক অশ্বের উপরে বসিয়া তিনি একঘন্টাকাল আমাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন তাহার মধ্যে একটি উপদেশ তিনি বারম্বার উল্লেখ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাহা এই যে 'Daroga naver shew your teeth before you bite.' অর্থাৎ "দারোগা কামড়াইবার পূর্ব্বে কখনও দাঁত দেখাইও না।"

এই মাজিস্ট্রেটের নিকট আমি মুন্সীকে তাহার একরার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলাম। আইনের নিয়ম ছিল এবং তাহা অন্যান্য সকল মাজিস্ট্রেটকে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম, যে থানা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকৃত কিম্বা অস্বীকৃত জবাবের সহিত একবার মাজিস্ট্রেটের নিকট থানা হইতে প্রেরিত হইলে, সে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া সেই জবাবের পোষকতা করুক, কিম্বা না করুক, সে আর থানায় পুনঃপ্রেবিত না হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইত কিম্বা জামিন দিয়া শেষ বিচার পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পাইত। কিন্তু পামর সাহেবকে তাহার বিপরীতে করিতে দেখিলাম। মুন্সী সেখকে কাছারি পাঠাইবার কিছুকাল পরেই দেখিলাম, যে বরকন্দাজ তাহাকে লইয়া পুনরায় থানায় আনিল এবং প্রকাশ করিল যে সাহেবের নিকট মুন্সী উপস্থিত হইয়া তাহার অপরাধ অস্বীকার করাতে, তিনি বিরক্ত হইয়া আমলাদিগকে বলিলেন, যে "দারোগা আমার নিকট কি আসামি পাঠাইয়াছে? এ দেখিতেছি, একরার করে না; তবে ইহাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যক কি ছিল? ইহাকে পুনরায় থানায় পাঠাইয়া দেও।" তখন আমি বুঝিলাম, সে মুন্সী সেখকে আমি যেরূপ সরল ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম, সে সেরূপ নহে; অতএব তাহাকে খুব করিয়া প্রহার করিতে বরকন্দাজদিগকে শিখাইয়া দিলাম। পরদিবস প্রাতে মুন্সী পুনরায় কাছারিতে যাইয়া যথার্থ কথা বলিতে চাহিবায়, আমি তাহাকে পুনরায় সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলাম কিন্তু পুনরায় মুন্সী তঞ্চকতা ব্যবহার করাতে সাহেব তাহাকে আবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুন্সীকে এইরূপ উপর্য্যুপুরি দুইবার তঞ্চকতা ব্যবহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্ত করিল যে "আমি জানিতাম, যে পুলিশ-আমলারা আসামিকে একরার করাইবার নিমিত্ত থানায় যন্ত্রণা দিয়া থাকে, কিন্তু একরার করুক কিম্বা না করুক মাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে হাজতে প্রেরণ করেন এবং হাজতে গেলে আসামির কারারুদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট কিম্বা জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না। আরও আমি জানিতাম যে শুদ্ধ একরার করাইবার এবং চোরামাল পাওয়ার নিমিত্ত পুলিশ আমলারা অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া থাকেন, আসামী একরার করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া দিলে, তাহাকে থানায় কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আমি থানায় আসিবামাত্র এই একরার করিয়াছিলাম এবং আপনিও তজ্জন্য প্রথমে আমাকে কষ্ট না দিয়া কাছারিতে চালান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মনে জানিতাম, সেইখানে যাইয়া অস্বীকার করিলে আমার থানায় একরার বৃথা হইয়া যাইবে এবং আমি হাজতে প্রেরিত হইব; কিন্তু আমার কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, সাহেব দুইবার আমাকে থানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন। নূতন রকমের আইন হইয়াছে না কি? নচেৎ কেন এইরূপ হইল! যাহা হউক, সাহেব আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনারা যাহা করিতে হয় করিয়া দেখুন।" আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে একদিন একরাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এক্ষণে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা পরমেশ্বর! সেই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত আমি বুঝি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ কবিতেছি। "বরমেব ভিক্ষা তরুতলে বাস" তথাপি যেন ভদ্রসন্তানেরা পুলিশের চাকরি না করেন।

এইরূপ দুই-তিনদিবস ধরিয়া ব্যবহার করিলাম, কিন্তু মুন্সী সেখ অটল হইয়া রহিল। খাইতে না পাইলে, খাইতে চাহে না এবং প্রহার করিলে নিষেধ করে না। অবশেষে আমি বিরক্ত হইয়া এক নির্জ্জন সময়ে মুন্সীকে হিতবাক্য প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলাম এবং বলিলাম যে "দেখ মুন্সী আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবহার করিতেছি, কি করিব, যখন মাজিস্ট্রেট সাহেব ছাড়েন না, তখন তোর একরার করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" তাহাতে মুন্সী সেখ যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া পাঠকগণ অবশ্যই আশ্চর্য্য হইবেন এবং সে কত বড়দরের চোর তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এত দীর্ঘকাল পরে, আমার তাহার বাক্যগুলি ঠিক স্মরণ নাই, মর্ম্ম প্রকটন করিতেছি শ্রবণ করুন। "আমি নূতন কিম্বা কাঁচা চোর নহি, আমার এক্ষণে প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইল কিন্তু ইহার মধ্যে আমি চুরি ডাকাইতি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করি নাই, অতএব ভালরূপে আমি জানি, যে আমি নিজে অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা মাল বাহির করিয়া না দিলে, আমার সহস্র সঙ্গী তাহাদের স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিলে, জজ কিম্বা মাজিস্ট্রেট সাহেব আমার কিছু করিতে পারিবেন না, আমি সেইজন্য কখনও একরার করি নাই এবং তন্নিমিত্ত কখনও দণ্ডনীয় হই নাই। আমি অনেক জেলায় বড় বড় গুরুতর মোকদ্দমায় ধৃত হইয়া অনেক দারোগার হস্তে মার খাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দারোগা আমাকে একরার করাইতে পারেন নাই।" এই স্থানে সে তাহার

জানুর কাপড় উঠাইয়া কয়েকটা কাল দাগ দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন যশোর জেলার এক ব্যাটা পাপিষ্ঠ মুসলমান দারোগা তামাকের গুল পোড়াইয়া আমার জানুতে চাপিয়া ধরিয়াছিল। আমার জানুর মাংস চড়্ চড়্ করিয়া পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল, আমি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু একরার করি নাই। পাবনার বিখ্যাত মৌলবী ওয়াসফদ্দীন দারোগা এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন; তিনি আমার হস্তের নখের ভিতর কাঁটা ফুটাইয়া দেখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; আর অন্যান্য কত দারোগার কাছে কত প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, তাহা আমি কত বলিব। কিন্তু কেহ আমাকে দিয়া একরার করাইয়া লইতে পারেন নাই। এক্ষণে আপনার হস্তে পড়িয়াছি, দেখি আপনিই বা কি করিতে পারেন? আপনারও বড় নাম শুনিয়াছি, দেখিব যে চোর বড়, কি দারোগা বড়? কিন্তু আপনি ধ্রুব জানিবেন যে মারপিট করিয়া আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না, প্রহার আমার শরীরে বিলক্ষণ সহ্য হয়, তবে অন্য কোন মন্ত্র দ্বারা যদি আপনি চোর অপেক্ষা বড় হইতে পারেন, তাহা অনায়াসে চেষ্টা করিতে পারেন।" এই কথোপথনের পরে মুন্সীকে যন্ত্রণা দেওয়া অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি বরকন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়া দিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্র আমার মনে ঐ চিন্তা জাগরুক রহিল। ভাবিলাম যে এই দস্যু ব্যাটা যদি আমাদের হস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় লজ্জা ও বিপদের বিষয়। লজ্জা আমার, বিপদ সমাজের।

পরদিবস বুধবার থানায় গ্রাম্য চৌকীদারেরা হাজিরা দিতে আসিয়াছিল; তাহার মধ্যে মুন্সীর নিজ গ্রামের চৌকীদারকে দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি এক ভাব উদয় হওয়াতে, আমি তাহাকে মুন্সীর পরিবারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে সে কহিল যে মুন্সীর বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল হইল স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং মুন্সী তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি স্ত্রীলোককে নিকা করিয়া চিত্রশালী গ্রামের প্রান্তে এক ঘর উঠাইয়া তাহাকে লইয়া বাস করে। মুন্সীর বাড়ীতে কেবল তাহার মাতা থাকে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই চৌকীদারের সঙ্গে একজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া মুন্সীর নিকার স্ত্রীকে থানায় আনিতে আদেশ করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই স্ত্রীলোকটি থানায় উপস্থিত হওয়াতে দেখিলাম, যে সে ভদ্রলোকের মেয়ের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সও ২০/২২ বৎসরের অধিক নহে; ক্রোড়ে একটি ৬ মাসের শিশুকন্যা। মুন্সীর স্ত্রী আমাকে দেখিয়া আমার পায়ের উপরে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে মুন্সী বদমায়েস, নিকার আগে জানিতে পারিলে আমি তখন তাহাকে বিবাহ করিতাম না, মুন্সীর মাতাই সকল অনর্থের মূল এবং

সেই জন্য আমার শাশুড়ির সহিত আমার বনিবনাও না হওয়াতে মুন্সী আমাকে গ্রামের বাহিরে স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিয়াছে। আমি মুন্সীকে চুরি ডাকাইতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকি বলিয়া সে আমার নিকট সকল কথা গোপন কবে। আমার কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি যে আমি কিছুই জানি না, আমার শাশুড়িকে আপনি ধরিয়া আনিয়া খুব শাস্তি দিলেই সকল কথা তাহার নিকট জানিতে পারিবেন।" এই স্ত্রীলোকের কথার উপর আস্থা করিযা তাহাকে ভাল স্থানে বাখাইয়া মুন্সীর মাতাকে আনিতে পাঠাইলাম। পরদিবস সকালবেলায় মুন্সীর মাতা আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিলাম, যে তাহার ক্লিষ্টা শরীর, চক্ষু কোটরস্থ; সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাহার নিকট মুন্সীর স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে উভয়ে ভারি বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শাশুড়িকে বৌ চোরনী এবং বৌকে শাশুড়ি বেশ্যা বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশেযে মুন্সীর স্ত্রীকে স্থানান্তর কবিয়া তাহার শাশুড়িকে ধমকাইতে লাগিলাম এবং থানায় তুড়ুমের নিকট টানিয়া লইলাম। তুড়ুম জিনিসটা কি, তাহা বোধ হয় আমার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে জানেন না। তুড়ুম শব্দ ফরাসীস ভাষা, ইংবাজিতে ইহাকে Stocks বলে। দুইখানা লম্বা ভারি কাষ্ঠ একদিকে শক্ত লোহার কব্‌জা দ্বারা আবদ্ধ, অন্যদিকে খোলা; কিন্তু ইচ্ছা করিলে শিকলের দ্বারা বন্ধ করা যায়। এই খোলাদিকের মাথা ধরিয়া উপরের কাষ্ঠকে উঠান নামান যাইতে পারে। প্রত্যেক কাষ্ঠেই কয়েকটি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় এমন ভাবে ছিদ্র করা আছে যে একখানা কাষ্ঠের উপরে দ্বিতীয়খানা পাতিলে দুই ছিদ্রে একটা গোলাকার ছিদ্র হয়। আসামিকে বসাইয়া কিম্বা শুয়াইয়া তাহার দুই পা একখানি কাষ্ঠের, দুই ছিদ্রের ভিতরে বাখিয়া উপরের কাষ্ঠ দ্বারা তাহা চাপা দিলে পা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং আসামি আর নড়িতে পারে না। বিশেষ কষ্ট দেওয়ার মানস থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দুই ছিদ্রে পা না দিয়া, এক ছিদ্রমধ্যে রাখিয়া অন্তরের দুই ছিদ্রে পা আটকাইলে মানুষের অত্যন্ত ক্লেশ হয। রাত্রিকালে দুরন্ত আসামিদিগকে নিশ্চিন্তরূপে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত সকল থানাতে ইহার এক একটা তুড়ুম ছিল। মুন্সীর মাতাকে এই তুড়ুমের নিকট আনিয়া তাহার উপরিভাগের কাষ্ঠটা টানিয়া উঠাইয়া নিম্ন কাষ্ঠের উপরে ছাড়িয়া দিলাম; তাহাকে ঝন্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে, মুন্সীর মাতা কাঁপিয়া উঠিল এবং আমি তাহাকে রাগান্ধভাবে বলিলাম যে "দেখ্ বেটী, তুই যদি এই যুগীর দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া না দিস্ তাহা হইলে, এই তুড়ুমের মধ্যে এক ফুকর অন্তরে তোর পা আটকাইয়া ফেলিয়া রাখিব এবং সমস্ত দিন তোকে প্রহার করিব।" মুন্সীর মাতা আমার রাগান্ধভাব দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল যে "বাবা তাহা হইলে ত আমার মুন্সী মারা যাইবে।" সন্তানের প্রতি মাতার যে কি

গাঢ় স্নেহ, তাহার ইহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্মুখে যন্ত্রণার এক ভয়ানক যন্ত্র, পশ্চাতে যমদূতের ন্যায় দারোগা এবং বরকন্দাজেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতে এবং যন্ত্রণা দিতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি মাতার মনে মুন্সীর যাহাতে অমঙ্গল না হয়, তাহাই প্রবল চিন্তা। মুন্সীর মাতার মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে অনেক আশাভরসা দিলাম। স্ত্রীলোকের এবং সাধারণ লোকের মনে ধারণা আছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ক্ষতিকারককে শাস্তি দিতে না চাহে, তবে আদালত তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য। আমি ইহা জানিয়া মুন্সীর মাতাকে বলিলাম যে "যুগী আমাকে বলিয়াছে যে সে তাহার সমুদয় দ্রব্যগুলি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে কোন আসামিকে সে শাস্তি দেওয়াইতে চাহে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমি যুগীকে ডাকাইয়া আনিয়া মোকাবিলা করিয়া দিব।" ভাগ্যক্রমে যুগীও সেই সময়ে থানায় উপস্থিত ছিল। সে আমার ইঙ্গিতে মুন্সীর মাতাকে ঐরূপ আশ্বাস দিল; কিন্তু চোরের মা শুদ্ধ বাক্যের উপরে নির্ভর না করিয়া বলিল যে "তবে যুগী সেতাম্বর কাগজে একখানা দরখাস্ত দাখিল করুক।" অনভিজ্ঞ লোকে ষ্ট্যাম্প কাগজকে সেতাম্বর কাগজ বলে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বাক্স হইতে এক তক্তা ফুলস্কেপ্ কাগজ বাহির করিয়া মুন্সীর মাতাকে তাহার মধ্যে জলের মার্কা দেখাইয়া প্রতীত করিলাম, যে যথার্থ উহা ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং তাহা আমার নায়েব দারোগার হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার দ্বারা মুন্সীর মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী দরখাস্ত লিখাইয়া, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া যুগীর দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলাম এবং আমরাও কয়েকজন তাহাতে সাক্ষীস্বরূপে স্বাক্ষর করিলাম। স্ত্রীলোকটির মনে তখন বিশ্বাস হইল, যে অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিলে মুন্সীর কোন ক্ষতি হইবে না এবং তখন সে মাল দিতে সম্মত হইয়া নায়েব দারোগার সঙ্গে চিত্রশালী যাত্রা করিল।

এ পর্য্যন্ত মুন্সী সেখ এই সকল ঘটনা বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই। মুন্সীর মাতা থানা হইতে বাহির হওয়ার পরক্ষণেই আমি বরকন্দাজি গারদে যাইয়া মুন্সীকে বলিলাম যে "কেমন মুন্সী এখন ত মাল পাইলাম, তুই দিলি না কিন্তু তোর মা দিতে চাহিয়াছে, এখন তোরা মায়ে পোয়ে ফাটক খাটিবি।" এই কথা শুনিয়া মুন্সী অবাক হইয়া তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিল, আমি তাহাকে দ্বারে আনিলাম। কোতওয়ালীর সম্মুখস্থিত রাজবর্ত্মটি অতি সরল, থানার দ্বারে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ উভয়দিকে অনেক দূর দৃষ্টি হয়। মুন্সীকে যখন দ্বারে আনিলাম, তখন তাহার মাতা প্রায় ৫০০ হাত (যাঁহারা সেই স্থান দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে পুরাতন কলেজের হাতার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের নিকট) গিয়াছে। মুন্সী তাহার মাতাকে চিনিয়া বলিল যে "এখন কি হইবে

মহাশয়! আমার মাতাকে কি প্রকারে বাঁচাইব।" আমি বলিলাম "এক উপায় আছে, তুই যদি এখন নিজে মাল বাহির করিয়া দিয়া সাহেবের নিকট যাইয়া একরার করিস, যাহা হইলে তোর মা বাঁচিতে পারে, কেমন মুন্সী তোর মাকে ফিরাইব নাকি?" মুন্সী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল যে "না ফিরাইবার দরকার নাই। ও ত চোরের মা, সে যে সহজে মাল বাহির করিয়া দিবে, এমন কথা আমার মনে লয় না, তাহা হউক আর কিছুকাল বিলম্বেই টের পাইব। এখন গাঙের মাঝে ঢেউ দেখিয়া কিনারায় নৌকা ডুবাইলে, কি পুরুষত্ব হইবে? বিশেষ আপনি সত্য কি মিথ্যা বলিতেছেন তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব, চলুন এখন থানায় ফিরিয়া যাই।" মুন্সী এমন শক্ত চোর, যে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তাহার মাতা এমন কাঁচা কর্ম্ম করিবে। বেলা ৪টার সময় নায়েব দারোগা মুন্সীর মাতাকে ও একটা বড় পুরাতন কালা হাঁড়ির মধ্যে অপহৃত যাবতীয় সোনা-রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকাগুলি সম্মুখে আনিয়া, ব্যক্ত করিল, যে, যে কৌশলে সকল দ্রব্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহাতে উহারা দুইজন ভিন্ন আর কাহারও তাহা আবিষ্কার করার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামের বাহিরে একটা মাঠের মধ্যে এক শিমুল ও খর্জ্জুর গাছের তলে, মাটির একটা অদৃশ্য গহ্বর আছে তাহার মধ্যে হাঁড়িটা উপুড় করিয়া রাখিয়া সকলের উপরে পাতা ও ঘাসের চাপড়া আচ্ছাদন করিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। মুন্সীকে ডাকিয়া দেখাইলাম, সে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আমার পা দুইখানা ধরিয়া তাহার মাতাকে রক্ষা করিতে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে "এখন আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি সমুদয় করিব।" আমি তাহার মাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত হইয়া বিস্তাররূপে তাহার দ্বারা একরার লিখাইয়া লইলাম এবং মুন্সী দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়ার কথাও তাহাতে স্বীকার করিয়া লইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আণ্ডাঘরে আণ্ডা খেলিতেছিলেন; মুন্সী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মুন্সীর প্রার্থনামতে সেইরাত্রিটা তাহাকে ফাটকে প্রেরণ না করিয়া, থানায় রাখিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি মুন্সী তাহার মাতা ও স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অতিবাহিত করিল এবং পরদিবস প্রাতে কান্দিতে কান্দিতে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া জেলখানায় গেল। যাইবার সময় তাহাতে আমাতে এইরূপ কথোপকথন হয় :

মুন্সী। দারোগা মহাশয়! আপনি আমার নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আমার পায়ে কখনও বেড়ী উঠে নাই, এইবার উঠিবে। আমি এখন দেখিতেছি, যে আপনি দারোগাই বড়।

দারোগা। দারোগা বড় নহে, ধর্ম্মই বড় মুন্সী সেখ।

মুন্সী। ঠিক বলিয়াছেন, এবার যদি খোদার মেহেরবানীতে ফাটক খাটিয়া প্রাণ লইয়া বাড়ীতে আসিতে পারি, তাহা হইলে আর চুরি ডাকাইতি করিব না।

দারোগা। সবসে ওহি ভালা।

মুন্সীর সাত বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের সহিত কারাবাসের দণ্ড হয়।

খড়ে পারের রাবণ রাজা

কৃষ্ণনগর জেলায় নাকাশীপাড়া একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে অধিক লোকের বসতি নাই এবং গ্রামও বড় নয়; কেবল একঘর জমিদারের বাস, কিন্তু তাঁহাদের জন্যই গ্রামখানি অনেকে চিনে। এই জমিদারবাবুরা রাজপুত বংশীয় একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। কিম্বদন্তী আছে যে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধীনে চাকরী করিয়া অনেক সম্পত্তি উপার্জ্জন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এই নাকাশীপাড়াতে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানেরা সেই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে কৃষ্ণনগর জেলার জমিদারগণের মধ্যে গণ্যমাণ্য জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাকাশীপাড়ার জমিদারবাবু-দিগের আদিপুরুষ পশ্চিমদেশস্থ ব্যক্তি ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সন্তানেরা ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষ যাবৎ বাঙ্গালায় বাস করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে রাজপুতের রক্তের গুণ এখনও সম্যক্‌রূপে লোপ পায় নাই। এখনকার ছোকরা বাবুদের কথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু আমার সহিত নাকাশীপাড়ার যে সকল বাবুদিগের আলাপ পরিচয় ছিল, তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ বলবীর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকের তিন-চারটি করিয়া ভাল জাতীয় অশ্ব থাকিত এবং কেহ পারতপক্ষে পালকি কিম্বা হস্তী চড়িয়া স্থানান্তর গতিবিধি করিতেন না; ঘোড়াই তাঁহাদের প্রিয় বাহন ছিল; এবং কৃষ্ণনগর জেলায় বাঙ্গালীর মধ্যে কেহই নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের ন্যায় অশ্বারোহণে মজবুৎ ছিল না। নাকাশীপাড়ার গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র এবং চতুর্দ্দিকে মাঠের মধ্যে স্থিত। ইহা পূর্ব্বে কাটোয়া মহকুমার অধীন অগ্রদ্বীপ থানার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু পরে নিজ নাকাশীপাড়াতেই থানা সংস্থাপিত হইল। যে কারণে নাকাশীপাড়ায় থানা স্থাপিত হয়, তাহা বিবৃত করাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

এই গ্রামে কেবল বাবুদিগের এবং বাবুদিগের স্থাপিত কয়েক ঘর প্রজার ও

নবশাখের বাস। বাবুদিগের বাড়ী বৃহৎ আট্টালিকা। সেকালের দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত যে কৌশলে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের গৃহ দেখিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এই গ্রামে বাবুরা সুন্দর জলাশয় খনন এবং বিলাসভোগের নিমিত্ত কয়েকটি বাগিচা প্রস্তুত করিয়া গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নাকাশী-পাড়ার কিয়দ্দূর পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে গোটপাড়া নামক একটি গ্রাম আছে। নাকাশীপাড়ার এবং সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের গঙ্গাস্নান, শবদাহ এবং অন্যান্য পবিত্র কার্য্য সম্পাদনের জন্য গোটপাড়ায় আসিতে হয় এবং গোটপাড়াও এই বাবুদিগের অধিকারভুক্ত। আমি যখন নাকাশীপাড়া দেখিয়াছি তখনও রায়বাবুদিগের জমিজমা, গোয়ালবাড়ী ইত্যাদি বিপুল বিত্তবিভব ছিল। কৃষ্ণনগর সহরের নীচে খড়িয়া নদীর উত্তর পারে, মায়াকোল ধুবুলিয়া গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত অনেক স্থানেই ইহাদিগের অধিকার ছিল এবং কলিকাতা হইতে বহরমপুর যাইবার যে সৈনিক রাজবর্ত্ম আছে, তাহার দুই পার্শ্বে এই পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে অন্য দুই-একজন ভূম্যাধিকারী থাকিলেও ঐ সকল স্থানে নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের একাধিপত্য ছিল। ইঁহাদিগের যেমন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি তেমনি নগদ টাকাও অধিক ছিল। প্রবাদ আছে যে ইঁহাদের গৃহের মধ্যে এক ধনাগারে বহু মুদ্রা ও অধিক মূল্যের প্রস্তারাদি স্তূপীকৃত ছিল। এই ধনাগার বেষ্টন করিয়া শরিকেরা তাঁহাদের অন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই ধনাগারে যাইতে হইলে বাবুদিগের বাহির ও অন্দর বাড়ী সকল অতিক্রম না করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে কেহ সমর্থ হইতো ন। ধনাগারের এক শক্ত কবাট ছিল এবং তাহাতে সকল কর্ত্তার পৃথক পৃথক এক তালা দেওয়া ছিল, যে, ধনাগার খুলিতে হইলে সকল শরিক একত্র এবং সম্মত না হইলে, তাহা খুলিবার উপায় ছিল না। ধনাগারে কত টাকা ছিল, তাহা তখনকার কর্ত্তারাও সকলে জানিতেন না। বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীর ধনাগারে যে পরিমাণ মুদ্রা ছিল, নাকাশীপাড়ার ধনাগারে অবশ্যই সেই পরিমাণে টাকা থাকা অসম্ভব, তথাপি ইহাতে যে বহু ধন ছিল, তাহা একসময়ে সকলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিশেষ, পরের ধন ও নিজের আয়ু—কেহই কম দেখে না ; তাহাতে ধনাগারের নাম শুনিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে এই ধনাগার না জানি কতই বা ধন লুক্কায়িত আছে। অংশীদিগের মধ্যেও অনেকের সেইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং যতদিন ধনাগারে পরীক্ষিত না হইয়াছিল ততদিন রায়বাবুদিগের সম্মান ও গৌরবের সীমা ছিল না। সহসা কেহ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিত না; কারণ, সকলে বিবেচনা করিত, যে আবশ্যক হইলে, ইঁহারা ধনাগার খুলিয়া যত ইচ্ছা ধন ব্যয়

করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু চরমে পরীক্ষায় এই ধনাগারের প্রতিষ্ঠা টিঁকিল না।

একপক্ষে চন্দ্রমোহন রায়, কেশবচন্দ্র রায় ও বিহারীলাল রায় ও অন্যপক্ষে সর্ব্বচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র রায়দিগের পরস্পর মহা মনোবাদ এবং সেই সুত্রে মহাকলহের সৃষ্টি হইল এবং ধনাগার সম্বন্ধে ঈশানবাবুর দলের সন্দেহ হওয়াতে, তাহা খুলিয়া তন্মধ্যস্থিত ধন বন্টন অথবা বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজদ্বারে ক্রোক রাখার জন্য আবেদন করা হইল। এই বিবাদই চরমে এই ধনাঢ্য বংশের ধ্বংসের মূল হইয়া উঠিল। উপরিউক্ত প্রার্থনামতে কৃষ্ণনগর হইতে কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা নাকাশীপাড়ায় গমন করিয়া সকল অংশীগণের সমক্ষে ধনাগার খুলিলেন এবং দেখিলেন যে তাহাতে কয়েক শত পুরাতন টাকা ও সিকি, আধুলী ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলে অবাক; বিশেষ, ঈশানবাবুরা ধন পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এককালে ভগ্নহৃদয় ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ দর্শকবৃন্দও নিরুৎসাহ হইল। কেশবাবুর পক্ষে বলিল, যে ধনাগারের অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ এবং তাহাতে যে কিছু ধন ছিল, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ধনাগারে পাওয়া গেল। কিন্তু ঈশানবাবুর দলের বিশ্বাস সেইরূপ নহে, তাঁহারা বলেন যে ধনাগারে বাস্তবিক বহুসংখ্যক মুদ্রা ছিল, কিন্তু কেঁশব ও বিহারীবাবু গোপনে তাহা বাহির করিয়া লইয়া ধনাগার শূন্য এবং অন্যান্য শরিকগণকে বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু সন্দেহ ভিন্ন এই অপবাদের দ্রষ্টব্য কোন প্রমাণ না থাকাতে কেশববাবুর বিরুদ্ধে তাঁহারা কিছু করিতে পারিলেন না। কেবল দুই পক্ষের মনে পরস্পর মর্ম্মান্তিক রোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল এবং ইহকালে সেই বিচ্ছেদ আর জোড়া লাগিল না এবং এ জন্মে তাঁহারা কেহ কাহারও সহিত পুনরায় আর বাক্যালাপ করিলেন না। এই বিবাদ-অগ্নি দুই পক্ষের কাহারও প্রাণ থাকিতে নির্ব্বাণ হইল না।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের লাঠির ভয়ে সকল জমিদার ও নীলকুঠীর সাহেবরা পর্য্যন্তও তটস্থ ছিলেন; কিন্তু এই ঘটনার পরে তাঁহারা আপনা আপনি পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। যদি শুষ্ক দেওয়ানী কিম্বা কালেক্টরিতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নাকাশীপাড়ার বাবুরা ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তত ক্ষতি ছিল না কিন্তু কেবল মোকদ্দমায় রাজপুতের রক্তে শান্তি বোধ হইত না। যুদ্ধ করার নিমিত্ত ইঁহাদের শরীর কামড়াইত। অন্যান্য বাঙ্গালী জমিদারেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবল টাকা দিয়া খালাস। লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা সংগ্রহ করিয়া, অধিক বেতন দিয়া, একজন নাক-কান-কাটা কারাগার-বাসে-অভ্যস্ত দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকে সেই দলের

কাপ্তেন অর্থাৎ নেতা নিযুক্ত করত, তাহার অধীনে লাঠিয়ালদিগকে দাঙ্গা করিতে পাঠাইতেন। আপনারা নিজে তাহার ত্রিসীমানায় যাইতেন না বরং রাজদ্বারে দণ্ড হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য, দাঙ্গার দিবসে কিম্বা তাহার অগ্রে কোন সহর কিম্বা জেলার সদর স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাফাই অর্থাৎ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। যে কিছু আপদ বিপদ কিম্বা শাস্তি হইত, তাহা তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের এবং অধিক পরিমাণে সেই কাপ্তেনের উপর ন্যস্ত হইত। কিন্তু নাকাশীপাড়ার রাজপুত জমিদার বাবুরা সেইরূপ ভীরু স্বভাবের মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহাদের কার্য্যে পেশাদার কাপ্তেন কিম্বা সর্দ্দারের আবশ্যক হইত না। বেতনভোগী কাপ্তেনের কার্য্যে তাঁহারা সন্তুষ্টও হইতেন না। আপনারা লাঠিয়াল লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে যাইতেন এবং সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। নাকাশীপাড়ার একটি যুবা জমিদার আমার নিকট কথায় কথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তিনি কয়েকবার এইরূপ যুদ্ধের নেতা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে শতাবধি অস্ত্রধারী লোক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন এবং যোদ্ধাদিগের হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘোড়া যখন নাচিতে নাচিতে শত্রুদলের দিকে ধাবমান হইত, তখন তাঁহার মনের মধ্যে এমন উল্লাস জন্মিত, যে তদ্রুপ উল্লাস তিনি আর কিছুতেই উপভোগ করেন নাই। বীর বংশের বীরপুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে।

এই বীরপুরুষদিগের আত্মকলহ সাধারণের প্রতি যে কত অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে গ্রামে গ্রামে স্থানে স্থানে দুইটি করিয়া দল সংস্থাপিত হইল। প্রজা ও কর্ম্মচারীরা কেহ কেশববাবুর এবং কেহ বা ঈশানবাবুর পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়িল। নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে উভয় পক্ষের নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য মোকদ্দমা ও দাঙ্গা উপস্থিত হইতে লাগিল। এবং বহু লোক খুন জখম ইহয়া গেল। ইহাতে বাবুদিগের যে কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এবং নিয়ত তাঁহাদিগকে কেবল অশান্তিভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেওয়া অসাধ্য। অধিক টাকা, অস্ত্রধারী লোকের বেতনেই ব্যয় হইত। আমি শুনিয়াছি যে এক এক পশ্চিম সর্দ্দারকে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং এই সকল অস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগকে কেবল একটি কার্য্যের জন্য অল্প সময় ধরিয়া রাখা হইয়াছিল এমন নহে, বিবাদের সূত্র হইতে আমাদিগকে (পোলিশকে) আক্রমণ করা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ ইহারা বাবুদিগের স্কন্ধে বিরাজ করিয়াছিল। এই সকল দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে

সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অনেক দিন যাবৎ অনেক অশান্তিভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহারা একস্থানে সমবেত থাকিলে অনেক অনিষ্টের কারণ হইত না কিন্তু ইহাদিগকে দলে দলে বাবুদের ভিন্ন মফঃস্বলে কাছারীতে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখাতে নানা স্থানে তাহাদের দৌরাত্ম্য ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। পথিকদিগের নিরাপদে কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর যাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

এই দুই দলের প্রত্যেক দলে যদিও কয়েকজন করিয়া বাবুরা ভুক্ত ছিলেন তথাপি একপক্ষে কেশববাবু এবং পক্ষান্তরে ঈশানবাবুর নামই বিখ্যাত ছিল। এই দুই ব্যক্তি দুই পক্ষের নেতা এবং কর্ত্তা ছিলেন এবং এই দুইজনের মধ্যে কেশববাবুই সর্ব্বসাধারণের নিকট আদরিত ছিলেন। ইনি যেমন বলবীর্য্যশালী তেমনই মুক্তহস্ত ছিলেন। হাপ-দাপ, রব-রবায় কেশবের তুল্য তাঁহার বংশের মধ্যে কেহই ছিলেন না। ইঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং শ্রমসহিষ্ণুতা সমতুল্য ছিল। কেশববাবু অপরিমিত সাহসী ছিলেন, ভয় কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেই নিমিত্ত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যোদ্ধারা যোদ্ধাকেই ভালবাসে। কেশববাবুর অধীনে চাকরী করা লাঠিয়ালদের বিবেচনায় অতি গৌরবের কথা ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে তাহারা এই বাবুর দলভুক্ত হইতে অগ্রসর হইত। কেশববাবু যে লড়াইয়ে নিজে যাইতে সংকল্প করিতেন তাহাতে তাঁহার যোদ্ধাগণ নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইত। কেশববাবু খুব দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বলিষ্ঠকায় ছিলেন। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং মুখখানা গোল ছিল। গম্ভীর স্বরে কথা কহিতেন; দেখিলে লোকে তাঁহাকে সম্মান এবং ভয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন এবং যে যেমন ব্যক্তি, তাহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতে জানিতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার দোষও অনেক ছিল কিন্তু মৃত ব্যক্তির দোষ লইয়া আলোচনা করা হিন্দুর বিধেয় নহে। কেশববাবু শ্রমে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন এবং অতি অল্পকাল নিদ্রা যাইতেন। শুনিয়াছি যে দুইজন বলবান ভৃত্য তাঁহার শরীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং চপেটাঘাত না করিলে, তাঁহার তৃপ্তিজনক নিদ্রা হইত না। ঈশানবাবুও বিলক্ষণ বলবান পুরুষ ছিলেন কিন্তু স্থূলতাবশত অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ফলে কেশব ও ঈশানে অনেক বিষয়ে অনেক প্রভেদ ছিল। কেশববাবুই সাধারণের নিকট অধিক পরিচিত ছিলেন কিন্তু ঈশানবাবুকে লোকে কেবল কেশববাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জানিত। তাঁহার নিজের কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

কেশব ও ঈশানের বিবাদে কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে এমন অশান্তির ঘটনা

হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজ কেশববাবু ঈশানবাবুর এক খানা গ্রাম জ্বালাইয়া দিলেন, কাল ঈশানবাবু কেশববাবুর গ্রাম লুঠ করিলেন। একদিন এক দাঙ্গাতে কেশবের দশজন লোক জখম হইল, তাহার পরদিবস আর এক যুদ্ধে ঈশানের দুইজন লাঠিয়াল খুন হইল। অদ্য ঈশানবাবুর এক প্রজাকে নির্য্যাতন করার উদ্দেশ্যে কেশব তাহার ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া লইয়া আসিলেন, কল্য কেশববাবুর এক গোলাবাড়ীর গোলা লুঠিয়া ঈশান তাহার প্রতিশোধ লইল। এক স্থানে একজন প্রজা নিরুদ্দেশ হইল আর এক স্থানের কয়েকজন অধিবাসীকে প্রতিপক্ষ ধরিয়া আনিয়া খুব প্রহার করিল এবং কয়েদ করিয়া রাখিল। এইরূপ ফৌজদারী আদালত উভয় পক্ষের রাশি রাশি দরখাস্তে এবং মোকদ্দমায় ভরিয়া গেল। তখন সি.টি.মন্ট্রেসর সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ও হিউএট নামক একজন সাহেব কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হিউএট সাহেবকে আমি কেবল একবার মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়াছিলাম, বিশেষ তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয়ও আমি অধিক অবগত নহি সুতরাং এই হাকিমের সম্বন্ধে আমি এই স্থানে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু মন্ট্রেসর সাহেবের কথা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি খুব তেজস্বী এবং প্রখর বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে পারিতেন। কৃষ্ণনগরে যত সাহেব মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মন্ট্রেসর সাহেব একজন অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। চোর ডাকাইতদিগকে একরার অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করাইতে মন্ট্রেসর সাহেব অনেক কৌশল জানিতেন এবং বিবাদপ্রিয় জমিদারদিগকেও তিনি দমন করার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁহার কার্য্যদোষে, তাঁহার সদভিপ্রায়গুলি অত্যাচারে পরিণত হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন তেজস্বী এবং দক্ষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবও নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের বিবাদের জটিলতায় দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলেন। নানা স্থানে পুলিশ আমলা মোতায়েন করিলেন এবং জমিদারদিগকে কঠিন দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইলেন, কিন্তু বিবাদের শান্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি সকল বাবুদিগকে কৃষ্ণনগর তলব দিয়া, তাঁহার কাছারীতে উপস্থিত করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে তাঁহার অনুমতি না লইয়া কেহ কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তর গমন করিলে তিনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন। তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রাতে বেলা ৬টা হইতে ৯/১০টা পর্য্যন্ত নিজের কুঠীতে অর্থাৎ গৃহে খাস কাছারী করিতেন। সেই স্থানে কয়েকজন প্রধান আমলা উপস্থিত হইয়া জেলার থানা সমস্ত হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট সকল তাঁহাকে শুনাইয়া হুকুম লিখিয়া লইত এবং অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয়

কার্য্যও সেই সময় সম্পাদিত হইত। পরে দুই প্রহরের সময় কাছারীতে আসিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই শেষ কাছারী কোনওদিন শেষ বেলা এবং কোনওদিন সন্ধ্যার পরে বাতি জ্বালাইয়াও হইত। মন্ট্রেসর সাহেব নাকাশীপাড়ার বাবুদিগকে কৃষ্ণনগরে আনিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহারা প্রত্যুষে খাস কাছারীতে হাজির হইয়া আমলাদিগের সহিত বাসায় যাইবেন এবং আহার কারিয়া পুনরায় আম কাছারীতে উপস্থিত থাকিয়া কাছারী ভাঙ্গিবার কালে তাঁহাকে সেলাম করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিবেন। বাবুদিগকে এইরূপ নজরবন্দী কয়েদ রাখিবার কারণ এই যে মন্ট্রেসর সাহেব জানিতেন যে রায়বাবুরা নিজেই দাঙ্গা করিয়া থাকেন, কাপ্তেন নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে দাঙ্গার স্থলে লাঠিয়াল পাঠাইবার অভ্যাসে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব তিনি মনে করিলেন যে তাঁহাদিগকে সমস্ত দিনরাত্র কৃষ্ণনগরে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য করিলে দাঙ্গা হইতে পারিবে না। বিশেষ কৃষ্ণনগর হইতে নাকাশীপাড়া প্রায় দশক্রোশ ব্যবধান, সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাছারীতে থাকিয়া রাত্রিকালে বাবুরা দশক্রোশ অতিক্রম করিয়া নাকাশীপাড়ায় যাইতে পারিবে না এবং পারিলেও তাহারা পুনরায় পরদিবস প্রাতে যথাসময় কৃষ্ণনগর আসিযা তাঁহার কুঠীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেনা। তদতিরিক্ত তিনি গোয়াড়ির খেয়াঘাটের ঈজারাদারকে বাবুদিগের কাহাকেও তাঁহার বিনা হুকুমে খড়িয়া নদী পার করিয়া দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং কোতওয়ালীর দারোগাকেও বাবুদিগের প্রতি গোপনে দৃষ্টি রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে আটঘাট বন্ধ করিয়া মাজিস্ট্রেট মন্ট্রেসর সাহেব মনে করিলেন, যে তিনি এক্ষণে শান্তিভোগ করিতে পারিবেন। বাবুরা কেহ কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু ও হরি। তাঁহার সাহেবী মন্ত্রণা ও কৌশলই সকল কেশববাবুর কাছে বৃথা হইয়া পড়িল।

বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে মিড়া নামক এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামের সন্নিকটেই ক্লাইব সাহেবের সহিত নবাব সেরাজুদ্দৌল্লার সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহার অনতিদূরে লক্ষাবাগ নামক আম্রবাগিচা ছিল; তাহার মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তোপখানা স্থাপিত ছিল। সেই লক্ষাবাগ এখন আর নাই, নদীর ভাঙ্গনে সেই স্থানটা ভাগীরথীর গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। যেখানে এমন পাপের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল বসুন্ধরা বোধ হয়, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে লজ্জাবোধ করিয়া, কিম্বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে তাহা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছেন। সেই বাগানে নাকি বাঙ্গালার নবাবদিগের অর্জ্জিত নানাপ্রকার সুখাদ্য একলক্ষ আম্রবৃক্ষ ছিল এবং সেই জন্যই তাহার নাম হয় লক্ষাবাগ। একলক্ষ গাছের মধ্যে এখন একটি গাছও নাই। আমি যখন মিড়ায় গিয়াছিলাম, তখন

মিড়ার কয়েকজন অধিবাসীর নিকট শুনিলাম যে লক্ষাবাগের শেষ বৃক্ষটি তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে নাকি তাহারা গোলার দাগ দেখিয়াছিল; কিন্তু এই কথা বড় সত্য বলিয়া বোধ হইল না। মিড়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল মাঠ আছে, তাহাতে কৃষকেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে লাঙ্গলের মুখে কামানের গোলা পাইত এবং আমি তখনও দুই-একজনের ঘরে ঐরূপ গোলা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার একটা গোলা হস্তগত করিয়া আনিতে আমার বুদ্ধি হয় নাই। বোধকরি যাঁহাদিগের পুরাতন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করার সখ আছে, তাঁহারা এখনও যত্ন করিলে ঐ গ্রামের কোনও না কোন অধিবাসীর নিকট পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত দুই এক লৌহ বর্ত্তুল সংগ্রহ করিতে পাবেন।

মিড়া গ্রাম বহরমপুরের সৈনিক রাজবর্ত্মের পশ্চিম ধারে কৃষ্ণনগরের প্রায় বিশ ক্রোশ উত্তবে স্থিত। তাহাতে কয়েক ঘর সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান কৃষকেব বাস এবং তাহা নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত। মিড়াতে ঈশানবাবুর এক কাছারী ও গোলাবাড়ী ছিল এবং প্রজারা প্রায় সকলেই ঈশানবাবুর পক্ষ। এই গ্রামে কেশববাবু তাঁহার নিজের প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য প্রথম হইতে চেষ্টিত ছিলেন কিন্তু ঈশানবাবুর সতর্কতায় এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদের সকলকে নজরবন্দী করাতে ঈশানবাবুর মনে বিশ্বাস হইয়াছিল, যে তাঁহাদের এই অবস্থায় কেহ কাহারও প্রতি কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং বোধ হয় সেই বিশ্বাসে ঈশানবাবু মিড়াতে পূর্ব্বে যে সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক রাখিয়াছিলেন তত লোক এখন রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায়, তাহাদের অনেককে মিড়া হইতে স্থানান্তর করিয়াছিলেন। কেশববাবু এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেই অবকাশে মিড়ার বিপক্ষ প্রজাদিগকে দমন ও গ্রাম্যখানা আপনার করতলে আনিবার বিলক্ষণ সুযোগ বিবেচনা করিলেন এবং সেই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া তলে তলে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের ওপারে মায়াকোল হইতে মিড়ার দক্ষিণে দেবগ্রাম নামক এক গ্রাম পর্য্যন্ত সমদূর তিন চারি স্থানে দুই দুইটা করিয়া বলবান অশ্ব রাখিতে এবং বিক্রমপুর ও ঐ দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে তিন-চারিশত লাঠিয়াল ও অস্ত্রধারী লোক প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে কেশববাবু নিয়মমত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারী ভাঙ্গিলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অন্য দিন অপেক্ষা সেই দিবস অধিক বিনীতভাবে সেলাম ঠুকিয়া বিদায় হইলেন। পথে পালকি আরোহন না করিয়া প্রধান প্রধান কয়েকজন আমলার সঙ্গে পদব্রজে বাসায় গেলেন। অবশেষে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাত্রে একটা ম্রেজাই দিয়া স্কন্ধের উপরে একখানা চাদর

ফেলিয়া ধীরে ধীরে গোয়াড়ির খেয়াঘাটের দিকে বায়ু সেবন করিতে গমন করিলেন এবং খেয়াঘাট হইতে নদীর ধার দিয়া ঘূর্ণী নামক কৃষ্ণনগরের এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, ঠিক প্রদোষকালে সেই স্থানে এক ধীবরের নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়া ভদ্রলোকের দুর্গম প্রায় দুই ক্রোশ মাঠের রাস্তা হাঁটিয়া যে স্থানে তাঁহার নিমিত্ত অশ্ব প্রস্তুত ছিল, সেইখানে পৌঁছিলেন। লম্ফ দিয়া একবার অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে পারিলে, কেশবকে আর কে পায়? তোমার আমার পক্ষে যেমন এক পোয়া আধ পোয়া রাস্তা বিচরণ করা অক্লেশের কার্য্য, অশ্বপৃষ্ঠে দশ বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করাও কেশবের পক্ষে তদ্রূপ। সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রাজপুত মর্দ্দ একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বায়ুবেগে ১৫ ক্রোশ পথ পার হইয়া বিক্রমপুর এবং দেবগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে যে সকল অস্ত্রধারী লোক তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কেশববাবুকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিল এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে মিড়াতে যাইয়া পৌঁছিল। ঈশানবাবুর কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে না পারিয়া, আক্রমণের জন্য সম্যক্‌রূপে অপ্রস্তুত ছিল এবং সেকারণে কেশব তাহাদিগকে যদৃচ্ছা জয় করিতে পারিলেন। ঈশানবাবুর কাছারী ও কয়েকজন প্রধান প্রজার বাড়ী প্রথমে লুঠ করিয়া পরে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিলেন এবং নিজের কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক ও একজন কর্ম্মচারীকে মিডা গ্রামে বসাইয়া গ্রাম দখল করিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধান্তে কেশব কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বেলপুকুরে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং কৃষ্ণনগর আসিয়া যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন তখনও আমলারা সেখানে আসে নাই। সেইদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বে রাত্রির ঘটনার কিছুমাত্র সংবাদ পাইলেন না; কারণ মিড়া হইতে ডাক ভিন্ন একজন পদাতিক একদিনে কৃষ্ণনগর আসিতে পারে না। পরদিবস পুলিশের রিপোর্ট ও ঈশানবাবুর দরখাস্ত পাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কেশবকে ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ থাকিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেশব জজসাহেবের নিকট এই বলিয়া আপীল করিল যে "মন্ট্রেসর সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া পরদিবস প্রত্যূষে তাঁহার আমলাদের অগ্রে তাঁহার কুঠীতে হাজির হইয়াছিলাম; তবে কি প্রকারে আমি একরাত্রির মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ যাইয়া কথিত অপরাধ করিয়া পুনরায় সেই রাত্রির মধ্যে বিশ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম? এমন কার্য্য মনুষ্যের অসাধ্য অতএব অভিযোগ মিথ্যা। আমাকে খালাস দিতে আজ্ঞা হউক।" জজসাহেব তাঁহার রায়ে লিখিলেন যে

"কেশববাবু যে হেতুবাদ দেখাইয়াছেন, তাহা অন্য ব্যক্তির পক্ষে বলবৎ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা কেশবের অসাধ্য কার্য্য নহে কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে কেশব একদিন কিম্বা একরাত্রির মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অনায়াসে ৪০ ক্রোশ কেন, তাহার অধিক পথও অতিক্রম করিতে পারে; অতএব তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম বহাল রাখিলেন।" কিন্তু কেশব সদর নিজামত আদালতে আপীল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেশবের অত্যন্ত হাপদাপ রবরবা ছিল। সামান্য লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিত। এমনকি তাঁহার শব্দ শুনিলে তাঁহার ভৃত্য এবং প্রজারা ভয়ে কম্পবান হইত। কেবল তাঁহার চাকর এবং প্রজা নহে, তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকেও তাঁহাকে বড় ভয় কিরত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমি এই স্থানে ব্যক্ত করিব।

কেশবের বিরুদ্ধে ঈশানবাবু কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক অভিযোগ করায়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কেশববাবুকে তাঁহার আদালতে উপস্থিত হওয়াব নিমিত্ত আদেশ করেন। কেশববাবুও সেই আদেশমতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইয়াছিলেন। ইহা বলা অনাবশ্যক, যে ভারতবর্ষে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে এখানকার ন্যায় তখন সাক্ষীর জবানবন্দী বিচারকের স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল না। সাক্ষী উপস্থিত হইলে, একজন আমলা বিচারকের দৃষ্টি চলিতে পারে, কাছারীঘরের এমন এক স্থানে বসিয়া সাক্ষীর মূল জবানবন্দী লিখিয়া লইত এবং তাহা লেখা শেষ হইলে, বিচারকের সমক্ষে তাহা পঠিত হইলে, তাহার উপরে বিচারক এবং দুই পক্ষের উকীল মোক্তারের কূট প্রশ্ন হইত। কেশব আদালতগৃহে প্রবেশ করার পূর্ব্বে ঈশানের দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী একজন আমলা কাছারীঘরের মধ্যে বিচারকের সম্মুখে একস্থানে লিখিয়া লইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল, যে তাহারা স্বয়ং কেশববাবুকে ঘোড়া চড়িয়া দাঙ্গা করিতে দেখিয়াছে। এমন সময় কেশববাবু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে সাক্ষীদ্বয় এইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। শুনিবামাত্র কেশব বলিয়া উঠিল যে "কি রে ব্যাটারা কি বলিতেছিস্।" সাক্ষীরা এতক্ষণ কেশববাবুকে দেখিতে পায় নাই কিন্তু তাঁহার শব্দ শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া কেশববাবুকে দেখিতে পাইয়া "ওমা কেশববাবু" বাক্য উচ্চারণ করিয়া এক লম্ফে আদলতের গৃহ ইহতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। বলিলেন যে "দেখ দেখ, ইহারা আমার সম্মুখ হইতে কেশবের ভয়ে পলায়ন করিল।"

কেশববাবুর যেমন অন্যদিকে দৌরাত্ম্য ছিল, তেমন এ দিকে বিলক্ষণ দানশীলতাও ছিল। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে তাঁহার বেশ প্রবৃত্তি ছিল এবং

সাধারণের উপকারজনক কার্য্যের নিমিত্ত তিনি মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর জেলায় অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। সাঁওতাল যুদ্ধের সময় এখনকার ন্যায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই। এই যুদ্ধে এক সময় গবর্ণমেন্টের এমনও আশঙ্কা হইয়াছিল, যে সাঁওতালেরা বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ সহর আক্রমণ করিবে এবং সেই আশঙ্কায় ঐ স্থান হইতে কলিকাতায় শীঘ্র সংবাদ পৌছিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত শীঘ্র একহারা টেলিগ্রাফের তার ঝুলান আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তখন গবর্ণমেন্টের ভাণ্ডারে টেলিগ্রাফ তাঁর ঝুলাইবার উপযুক্ত মালমসালা ছিল না এবং ধাতুময় স্তম্ভ প্রভৃতি উপকরণ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষ রেলপথের অভাবে আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্ত বাঞ্ছিত সময়ের মধ্যে স্থানে স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ারও উপায় ছিল না। তদ্ভিন্ন এই টেলিগ্রাফ স্থায়ীরূপে সংস্থাপন করার আবশ্যক ছিল না। সাঁওতালদিগকে দমন করার কার্য্য সমাপ্ত হইলে এই টেলিগ্রাফ উঠিয়া যাইবে। সুতরাং যেন তেন প্রকারে ইহা খাড়া করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাখিতে পারিলেই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই নিমিত্ত অন্য কোনপ্রকার স্থায়ী স্তম্ভ ব্যবহার না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চ বংশখণ্ড সকল পুঁতিয়া সেইগুলার মাথার উপর তার ঝুলাইবার প্রস্তাব হইল। অন্যান্য অনেক স্থানে মূল্য দিয়া গবর্ণমেন্টকে বংশ ক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সেই কার্য্যর ভার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন। এক দিবস কেশববাবুর সহিত এই সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হওয়াতে তিনি ব্যক্ত করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুমতি করিলে, তিনি নিজ ব্যয়ে খড়িয়া নদীর ওপার হইতে কৃষ্ণনগর জেলার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বাঁশ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে, তাঁহার একজন কর্ম্মচারী সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল, সে তাঁহাকে এই ঝঞ্ঝাটে হস্তক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিল। তাহাতে কেশববাবু তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন, যে তাঁহার নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলে, যেমন তিনি তাঁহার প্রজাদিগের নিকট সাহায্যের প্রত্যাশা করেন, সেইরূপ তাঁহার রাজাকেও তাঁহার সাহায্য করা উচিত, না করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। মহতের মহৎ উক্তি! ইহা বলা অনাবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি আহ্লাদের সহিত কেশববাবুর সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে কেশববাবুর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্রেরা খুব সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিকে যেমন ধূমধাম, পক্ষান্তরে সেই শ্রাদ্ধে তেমন বিভ্রাটও ঘটিয়াছিল। কেশবাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে বিবেচনা

করিয়াছিল যে এখন বাবুদিগের আত্মকলহ মিটিয়া যাইবে এবং এমনও জনরব উঠিয়াছিল, যে কেশবের মরণে ঈশানবাবু বিস্তর শোক ও খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবুর অভাবে তিনি আর কাহার সহিত বিবাদ করিবেন? তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর কে আছে? কিন্তু রায়বাবুদিগের মনে মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছিল, যে তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইল না। কেশববাবুর শ্রাদ্ধের দিবস কি এক কথা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় যে বিবাদ-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর লাঠিযুদ্ধে মিটিল না। অবশেষে দুইপক্ষে বন্দুক বাহির করিয়া পরস্পরের উপরে গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাহাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তথাপি অনেকে গুরুতর আঘাতিত হইয়াছিল। ইহাকেই বলে শ্রাদ্ধ গড়ান। যুদ্ধের পরে উভয় পক্ষের জ্ঞান জন্মিল এবং সকলে মনে মনে ভীত হইলেন। বুঝিলেন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া রাজার কানে এই বিষয় উঠাইলে, উভয় পক্ষের নিস্তার নাই; গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে। অতএব দুই পক্ষই পরামর্শ করিয়া একবাক্যে নালিশ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। কিন্তু বাবুরা ক্ষান্ত থাকিলে কি হয়, ধর্ম্মের ঢোল বাজিতে ক্ষান্ত থাকে না। ক্রমশঃ এই যুদ্ধের আভাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবশেষে মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে উঠিল। তখন এ, জে, এলিয়ট নামক একজন যুবা সিবিলিয়ান কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট। তিনি কমিসনার সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলেন এবং কমিসনার সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবেকে এই বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিয়া অপরাধী ব্যক্তিদিগকে দৃঢ়রূপে দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষাণৎ কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নাকাশীপাড়ায় যাইয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একপক্ষকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে এলিয়েটে সাহেব আমাকে সেই কার্য্যে ব্রতী করিয়া নাকাশীপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সেই তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে চরমে আমার যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা আর এক প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

এই কেশববাবুকেই কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোকে "খড়ে পারের রাবণ রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত।

আমরা মার খাই

পূর্ব্বে প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি, যে নাকাশীপাড়াব কেশবচন্দ্র বায়ের আদ্যশ্রাদ্ধের দিবসে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষে বন্দুকের যুদ্ধ হইযাছিল। কৃষ্ণনগবের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে সেই বিষয়ের তদন্তের জন্য ঘটনাক্ষেত্রে প্রেরণ করেন; কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রায় ১৫দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, কোনও কথা আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হওয়াতে, বিশেষ মহকুমা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল তিনি স্থানান্তর থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কাটোয়ায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

এই স্থানে আমার বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দারোগাদিগের ন্যায় আমি কোনও মোকদ্দমার তদন্তের জন্য প্রেরিত হইলে, ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইয়া অধিবাসীদিগের উপর "ধর মার পাকড়" করিতাম না। পূর্ব্ব দারোগারা অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিতেন, এমন নহে। অধিক সময়ে তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুমের ভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কোনও পুলিশ আমলার উপরে কোনও কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আদেশ করিতেন যে "দারোগা তিন (কিম্বা মোকদ্দমার গুরুত্ব বুঝিয়া সাত) দিবসের মধ্যে আসামি হাজির কিম্বা মোকদ্দমার কেনার করে, যদি সে এই সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য করিতে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আপনাকে সাস্‌পেণ্ড (কিংবা কোনও স্থলে পদচ্যুত) বিবেচনা করিয়া, নায়েব দারোগার হস্তে শীলমোহর অর্পণ করিয়া, জবাবদিহির নিমিত্ত হুজুরে হাজির হয়।" সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কড়া হুকুম দেখিয়া পুলিশ আমলারা আপনাদের চাকরী রক্ষার জন্য গ্রামে পৌছিয়া চৌকিদার, মণ্ডল মাতব্বর এবং জমিদার প্রভৃতির উপরে

যারপরনাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিত। মুসলমান দারোগা হিন্দুর গ্রামে যাইয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুর অখাদ্য জীব সকল জবাই এবং হিন্দুর অস্পর্শীয় দ্রব্য সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিত, যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইত, তাহাকে ধরিয়া নানারূপ কষ্ট দিত এবং চৌকিদার ও মণ্ডলকে মনের সাধ মিটাইয়া প্রহার করিত। এদেশে এমনও সময় ছিল, যখন পুলিশের আগমনে গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িত। গ্রামবাসীরা পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত এবং কখনও কখনও হাট-বাজার বন্ধ হইয়া যাইত। পুলিশের এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিদার কিম্বা অদিবাসীরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিবাদ করিলে তিনি তাহাকে প্রায়ই কর্ণপাত করিতেন না, অধিক হইলে দারোগার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এবং দারোগা সাহেবকে এই বলিয়া প্রবোধ দিত, যে এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে, মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হওয়া, তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু পুলিশ আমলার অত্যাচারে প্রায়ই তাহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল উৎপত্তি হইত কারণ ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে, যে গ্রামস্থ লোকের আন্তরিক সাহায্য ভিন্ন পুলিশ আমলা কোন কথাই জানিতে পারে না। সে স্থলে তাহাদিগকে যতদূর মিত্রভাবে রাখা যাইতে পারে ততই পুলিশ আমলার মঙ্গলকর কার্য্য হইত; কিন্তু দারোগারা তাহার বিরুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক সময় বিঘ্ন উপস্থিত করিত। আমিও দারোগা হইয়া অনভিজ্ঞতাবশত, প্রথমাবস্থায় অধীন কর্ম্মচারীদিগের কুপরামর্শে উপরিউক্তরূপে কার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল না দেখিয়া, আমার চক্ষু ফুটিল এবং উপায়ন্তর অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলাম। যত অল্প সংখ্যায় অধীন কর্ম্মচারীগণকে সঙ্গে লইয়া গেলে কার্য্য চলিতে পারে, তাহাই লইয়া নিস্তব্ধে গ্রামে উপস্থিত হইতাম এবং একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাসা করিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইতাম। প্রথম কয়েক দিবস কোন ব্যক্তির নিকট মোকদ্দমার কিছুমাত্র উল্লেখ করিতাম না। যে দুই-একজন বরকন্দাজ সঙ্গে থাকিত তাহাদিগকে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে পুলিশের চাপরাশ এবং উষ্ণীষ পরিধান করিতে এবং অধিবাসীদিগের প্রতি কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিতাম। ফলে, গ্রামে যাইয়া পুলিশ আমলার ন্যায় কিছুমাত্র ব্যবহার করিতাম না। গ্রামের কোনও অধিবাসীর একজন আগত কুটুম্বের ভাবে কার্য্য করিতাম। এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার উদ্দেশ্যসাধনের কোনও ব্যাঘাত হইত না। ফলে আমার মনে পড়ে না যে কেবল একটি মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আমায় কখনও অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার এই মোকদ্দমা তদন্ত করার নিমিত্ত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিয়া, নাকাশীপাড়াতে জমিদারেরা উপস্থিত থাকিলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার আশঙ্কায়, তাঁহাদিগের সকলকে নাকাশীপাড়া হইতে স্থানান্তর করার অভিপ্রায় কৃষ্ণনগরে নিজের কাছারীতে হাজির রাখিয়াছিলেন এবং আমাকে নাকাশীপাড়ায় পাঠাইবার সময়ও, সেই হুকুম বলবৎ বাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ জমিদার বাবুদিগের সহিত আমার উত্তম আলাপ পরিচয় ছিল, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদিগের সহিত আমার বন্ধুত্বই ছিল। এইরূপ সম্প্রীতি হওয়ার কারণ এই যে, কোতওয়ালী থানার দক্ষিণ অতি নিকটে কৃষ্ণনগর সহরে নাকাশীপাড়ার জমিদার বাবুদিগের বাসাবাড়ী ছিল, সুতরাং সর্ব্বদা বাবুদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হওযার গতিকে, আমার সহিত তাঁহাদের অনেকের সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আমার উপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকাশীপাড়ার মোকদ্দমার তদন্তের ভার অর্পণ করিয়াছেন শুনিয়া, বাবুদিগের মধ্যে আমার বন্ধুরা অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন এবং আমি নাকাশীপাড়ায় যাইয়া তথায় যতদিন অবস্থিতি করিব, আমার আহারাদিগর কোন ক্লেশ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের নাকাশীপাড়ার কর্ম্মচারীগণের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদের এইরূপ অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের ফলে, আমার বিস্তর উপকার হইয়াছিল, নচেৎ কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় আমাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইত।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি দুই-একদিবসের মধ্যে কৃষ্ণনগর হইতে মধ্যাহ্নের পরে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮/৯ ঘন্টার সময় নাকাশীপাড়ায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, যে এক মাঠের মধ্যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের তাম্বু স্থাপিত রহিয়াছে। অন্ধকার, লোকজনের কোন শব্দ নাই; কেবল একটি ভাঙ্গা দেশী লাণ্ঠানের মধ্যে একটি মাটির প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহার সম্মুখে একখানা কেদারা চৌকীর উপরে, একজন আধবুড়া সাহেব উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার পরিচয় দিয়া তাঁহার হস্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পত্র দিলাম। বহু কষ্টে সেই প্রদীপের আলোকে তিনি পত্রখানা পাঠ করিয়া চৌকী হইতে উঠিয়া, আমার মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন যে "বাবু পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাকে যে বিপদ্দ হতে উদ্ধার করিলে, তাহা তোমাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। দেখ আমার অবস্থা কি শোচনীয়, এই স্থানের জমিদার রাস্কেলেরা একযোট হইয়া আমাকে প্রাণে মারিবার রকম করিয়া তুলিয়াছে। অদ্য ৮ দিবস ধরিয়া আমার আহারের যথোচিত দ্রব্যাদি যুটাইতে পারি না। মুর্গী কিম্বা অন্যপ্রকার মাংস পাওয়া কথা

দুরে থাকুক, চা খাইবার জন্য এক ছটাক দুগ্ধ কিম্বা প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটু তৈল পাইবার উপায় নাই। দোকানদারেরা আমার লোকজনকে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না। বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে সাহস করে না, কারণ তাহা হইলে তাহারা জানে যে আমি তাহাদিগকে দণ্ড করিব কিন্তু দ্রব্য চাহিলে তাহা তাহাদের দোকানে নাই বলিয়া, আমার লোককে প্রতারণা করে। কল্য সন্ধ্যার পরে তৈল অভাবে বাতি জ্বালাইতে না পারিয়া, সমস্ত রাত্রি অন্ধকার কাটাইয়া ছিলাম, অদ্য আমার চাপরাশি একজনের নিকট ভিক্ষা করিয়া একটু তৈল আনিয়াছে, তাহাতেই এই প্রদীপটি এতক্ষণ জ্বলিতেছে। যে মোকদ্দমা তদন্ত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করার জন্য জমিদারদিগের দুই পক্ষেরই সমান চেষ্টা এবং এখানকার লোকে কেহ তাহাদের ভয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহে না। একে ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদিও দুই-একজন ইতর লোকের সহিত দেখা হয় তাহা হইলে তাহারা বলে যে, তাহারা কিছুই অবগত নহে। এক্ষণে এলিয়ট সাহেব তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি যাহা জান তাহা কর, আমি চলিলাম; আমি আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত এখানে বিলম্ব করিব না।" বলিয়া তিনি বহু কষ্টে কাহার সংগ্রহ করিয়া কাটোয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হিউএট সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। ভাবিলাম যে স্থলে, একজন সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এইরূপ পরাস্ত হইতে হইল, তখন আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী দারোগা আর অধিক কি করিতে পারিব? যাহা হউক, সেই রাত্রে আমি চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি করিলাম এবং চিন্তা করিয়া দেখিলাম, যে নিজ নাকাশীপাড়া গ্রামে থাকিয়া তদন্তের সুবিধা করিতে পারিব না। হিউএট সাহেবের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিতে হইবে। নিকটে যে গ্রামে নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকার নাই, এমন স্থানে থাকিতে পারিলে সুবিধা হওয়া সম্ভবনা; কিন্তু তেমন স্থান কোথায়? অনুসন্ধানে জানিলাম, যে নাকাশীপাড়ার অনতিদূরে বিল্বগ্রাম নামক একটি গ্রাম আছে, তাহাতে বাবুদিগের অধিকার নাই কিন্তু অধিবাসীদিগের উপরে কিছু প্রভুত্ব না আছে, এমন নয়। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাড়ী এবং ইহাতে অনেক ভদ্র ব্রাহ্মণের বাস। অতএব এই স্থানটি মন্দের ভাল বিবেচনা করিয়া, তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে স্থির করিলাম এবং পরদিবস প্রাতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির বর্হিবাড়ীতে যাইয়া বাসা সংস্থাপন করিলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর পুত্রদিগের কল্যাণে হিউএট্‌ সাহেবের ন্যায় আহারাদি সম্বন্ধে আমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হইল না; আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই আমরা ইচ্ছামত পাইতাম।

এইরূপে বিল্বগ্রামে থাকিয়া আহারের সময় আহার করি এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাই এবং দুইবেলা নাকাশীপাড়া যাইয়া বাবুদিগের কর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ করি এবং মধ্যে মধ্যে বন্দুক হস্তে করিয়া এগ্রামে ওগ্রামে ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষী মারিয়া বেড়াই। পক্ষী শিকাব করা কেবল উপলক্ষ মাত্র; নির্জ্জনে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার মুখে মোকদ্দমার কোন কথা আবিষ্কার করিতে পারি কি না, তাহাবই চেষ্টা করি! কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। দেখিলাম যে আমরা কে কি কবি, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাবুদিগের গুপ্তচর নিয়ত আমাদের অদৃশ্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। আমি বিল্বগ্রাম হইতে বাহিব হইলেই একজন লোক ছদ্মবেশে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইত। কোন কর্ম্মই আমি ঐ সকল চরকে গোপন করিয়া কবিতে পারিতাম না এবং যদিও অকস্মাৎ দুই এক ব্যক্তিব সহিত নির্জ্জনে দেখা হইত, তথাপি তাহাতেও কিছু ফল হইত না; কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে তাহারা সকলে একভাবে উত্তর করিত যে তাহারা কিছু দেখে নাই, শুনে নাই এবং জানে না। অধিক ব্যক্ত করিলেও, তাহারা এইমাত্র বলিত, "যে আমাকে মাপ করুন, ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কারণ কোন্ কথা বলিতে কোন্ কথা বলিয়া অবশেষে বাবুদিগের কোপে পড়িব, সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমার এদেশে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিবে।" আমাব সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বেহাবারা ছিল কিন্তু কখনও আবশ্যক হইলে, সেই স্থানের কাহাব আনিয়াও কর্ম্ম চালাইতাম। এক দিবস এক স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একজন বেহারাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে "আপনি যদি আমাদিগকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমরা আর আপনার ডাকে আসিব না এবং আপনার পালকিও স্কন্দে করিবনা।" নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের একদলের দর্পে রক্ষা নাই, তাহাতে তাহারা দুইদল একত্র হইয়া যোটবদ্ধ হইলে যে কি প্রমাদ এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা যে পুলিশের পক্ষে কত দুরূহ কার্য্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। আমিই সকল বিষয় এলিয়ট সাহেবকে লিখিয়া অবগত করাতে তাঁহার আরও জেদ বাড়িল। আমাকে নিরুৎসাহী হইতে নিষেধ করিয়া যতকালে এবং যে প্রকারে হয় এই ঘটনার যথার্থ আবিষ্কার করিতে লিখিলেন এবং সেই সময় অগ্রদ্বীপ থানার দারোগা-পদ খালি হওয়াতে, তিনি আমার অনুরোধমতে কোতওয়ালী থানার নায়েব দারোগা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমার নিকট থাকিয়া তাহার নিজ থানার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে এবং তদতিরিক্ত আমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই স্থানে বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আমার আবশ্যক কারণ ইনিই এই

মোকদ্দমার চরম অবস্থা পর্য্যন্ত আমার সহিত ব্রতী ছিলেন, এবং তাহাতে আমাদের যে কষ্ট পাইতে হয়, তাহার অধিক ভাগ বৈদ্যনাথেরই ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ উলা গ্রামের দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের বংশোদ্ভব; কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু ইঁহার পুলিশ আমলার উপযুক্ত প্রখর বুদ্ধি ছিল। বৈদ্যনাথ গৌরবর্ণ, দেখিতে সুন্দর এবং তাঁহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় বলবান পুরুষ ছিলেন। বয়সে আমার অপেক্ষা বৈদ্যনাথ অল্পবয়স্ক ছিল। সেই জন্য আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। বৈদ্যনাথ চরমে নূতন পুলিসের ডিটেকটিব বিভাগের আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-পদ প্রপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ আর এইক্ষণে নাই, পরলোকগমন করিয়াছে।

বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার সহিত যোগ দেওয়াতে আমার উৎসাহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল কিন্তু আমরা দুইজন প্রায় দুইমাস নাড়াচাড়া করিয়া ধরিয়া কিছুমাত্র করিতে পারিলাম না। তথাপি এলিয়ট সাহেবের উৎসাহভঙ্গ হইল না। তিনি প্রত্যেক পত্রে আমাকে সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে আদেশ করিতেন এবং একপত্রে লিখিলেন যে "আমি তোমাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ায় রাখিয়া দেখিব, তথাপি কি কিছু করিতে পারিবে না?" লোকে বলিয়া থাকে যে "লেগে থাকিলে মেগে খায় না"। এই কথা নিতান্ত সত্য বটে, কারণ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে গোটপাড়ার নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে পাটুলী নামক একখানি গ্রাম আছে তাহাতে কয়েক ঘর কীর্ত্তনকারী ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা ধনাঢ্য লোকের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং তাহাদের কয়েকজন কীর্ত্তনীয়া কেশববাবুর শ্রাদ্ধে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিল এবং আদ্যোপান্ত সকল অবস্থা অবগত আছে। আমরা এমনও শুনিলাম যে ঐ সকল কীর্ত্তনীয়াদের দুই-এক-জনের শরীরে বন্দুকের গুলি লাগিয়া আঘাতিত হইয়াছিল। পাটুলী গ্রাম নাকাশীপাড়ার জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত নহে এবং পাটুলীর একজন স্বতন্ত্র ধনাঢ্য জমিদার আছে, কিন্তু ঐ গ্রাম আমাদের কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত নহে, বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। অতএব ভিন্ন জেলার পুলিশের সহায়তা না লইয়া তাহাতে কার্য্য করিতে গেলে, নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ কীর্ত্তনীয়ারা যদি একবার জানিতে পারে, যে আমরা তাহাদিগকে ধরিবার উদ্যোগে আছি, তাহা হইলে তাহাদিগের দেখা পাওয়া কঠিন হইবে, এবং নাকাশীপাড়ার বাবুরাও তাহাদিগের বশীভূত এবং স্থানান্তর করিয়া ফেলিবে। এই আশঙ্কায় আমরা পাটুলী যাইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই সংবাদ জানাইলাম। কয়েক দিবস পরে তিনি আমাকে

লিখিলেন, যে তিনি আমার পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লেখাতে তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব এলিয়ট সাহেব একটি দিন অবধারণ করিয়া আমাকে লিখিলেন যে সেই দিবস তিনি ও বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট পাটুলীর অনতিদূর দক্ষিণে সাবী সাহেবের এক নীলকুঠীতে উপস্থিত থাকিবেন এবং আমাদিগকে সেই তারিখে পাটুলী যাইয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে সংগ্রহ করিতে এবং তাহাদিগকে সেই কুঠীতে সংবাদ দিতে আদেশ করিলেন।

অবধারিত দিবসের রাত্রি থাকিতে গোটপাড়ায় গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার উপলক্ষে সঙ্গে চারিজন বরকন্দাজ লইয়া আমি এবং বৈদ্যনাথ বিল্বগ্রাম হইতে নিস্তব্ধে বাহির হইয়া বেলা ৮/৯ ঘন্টার সময় পাটুলী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাটুলীর বাজার খোলায় পালকি বেহারা ও বরকন্দাজদিগকে রাখিয়া আমরা দুইজন দারোগা কীর্ত্তনীয়ারা যেস্থানে বাস করে সেই স্থানে ছদ্মবেশে গমন করিলাম। ভাগীরথী নদী পার হওয়ার পরেই আমরা বরকন্দাজদিগের চাপরাশ ও উষ্ণীষ গোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলাম যেন পাটুলীর বাজারে উপস্থিত হইলে কেহ আমাদিগকে পুলিশ আমলা বলিয়া বুঝিতে না পারে। কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদের আলয়ে যাইয়া বলিলাম, "দেওয়ান মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ী হইতে আসিতেছি, সেখানে এবার সমারোহ পূর্ব্বক দোল-যাত্রা হইবে। অতএব পাটুলীর কীর্ত্তনীয়া ঠাকুরদিগের প্রশংসা শুনিয়া আমরা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে ও বায়না দিতে আসিয়াছি।" দোলের বায়নার কথা শুনিয়া সকল কীর্ত্তনীয়ারাই স্ব স্ব গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যৎপরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের দুইজনকে তাহাদের বাহির বাড়ীতে বসাইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। আমি জানিতাম, যে কেশববাবুর শ্রাদ্ধে অনেক গরদের ধুতি বিতরিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে একজনের পরিধানে একখানা গরদের ধুতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এত দেখি কেশববাবুর শ্রাদ্ধের গরদের ধুতি, আপনারা সেই কাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন নাকি?" কীর্ত্তনীয়ারা সকলে একত্র উত্তর করিল যে "হা সরকার মহাশয় গরদ পাইয়াছি বটে, কিন্তু প্রাণ লইয়া আমরা যে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম, সে কেবল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবল ও কৃষ্ণের ইচ্ছা।" তাহার পর তাহাদের মধ্যে একজনের বুকে নামাবলী তুলিয়া একটা চিহ্ন দেখাইয়া বলিল যে "এই দেখুন সেদিনের দুর্গতি।" আমি যেন কিছুই জানি না,—এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে "শ্রাদ্ধে আবার দুর্গতি কি?" উত্তর "দুর্গতির কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে আছে, সরকার মহাশয় তুমি কি কিছুই শুন নাই যে, সেই শ্রাদ্ধে বন্দুক দিয়া গুলি মারামারি হইয়াছিল।" প্রশ্ন "সত্য নাকি,

যথার্থ কি এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আপনারা কি তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন?" উত্তর "হাঁ আমরা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং গুলি মারামারি চক্ষে দেখিয়াছি।" প্রশ্ন "আপনারা সেই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া কি করিলেন?" উত্তর "কি আর করিব? ইহার গায়ে গুলি লাগিবামাত্র, আমরা যে যেমতে পারিলাম পলাইয়া বাড়ী আসিলাম এবং তাহার দুই-তিন দিবস পরে, নাকাশীপাড়ায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।" প্রশ্ন "এত দেখি অতি আশ্চর্য্য কারখানা! আর কখনও এমন শুনি নাই, আপনাদের যে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল তাহাই যথেষ্ট ভাগ্য বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, রাজপুতের কাণ্ড লইয়া আমাদের মাথা-ব্যথা করিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে আমাদের সঙ্গে চলুন, বাজারখোলায় আমাদের বাসাতে আর একজন কর্ত্তা আছেন, তাঁহার সহিত আপনাদের কথাবার্ত্তা হইলে আপনারা বায়না পাইতে পারিবেন।" এইরূপ কৌশল করিয়া আমরা তাহাদের ৮/১০ জনকে কথা কহিতে কহিতে, বাজারখোলায় আনিয়া আমাদের বাসাঘরের মধ্যে বসাইয়া ব্যক্ত করিলাম যে, "দোলের বায়না দেওয়ার কথা মিথ্যা, আমরা কৃষ্ণনগর জেলার পুলিশ-দারোগা, আপনাদের জবানবন্দী লওয়ার জন্য আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছি; অতএব যে পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আগমন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে।" আমার এই কথা শুনিয়া কীর্ত্তনীযা ঠাকুরদের প্লীহা চম্‌কিয়া গেল, সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম যে, আপনাদের কিছুই চিন্তা নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি নিকটেই আছেন তিনি আসিয়া আপনাদের জবানবন্দী লিখিয়া লইলেই, আপনারা স্ব স্ব গৃহে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন।" উত্তর "আর মশাই পরমানন্দ, আপনি যে পরমানন্দ দেখাইলেন, তাহা আর মরিলেও ভুলিব না, আমাদের কোন পুরুষে যাহা কখনও না হইয়াছিল, তাহা আজ আপনাকে দিয়া হইল।" অর্থাৎ সাক্ষী দেওয়া! এদিকে আমি কীর্ত্তনীয়াদিগকে লইয়া বাজারখোলায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথ হইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত গোপনে একজন বরকন্দাজকে সেই নীলকুঠীতে পাঠাইয়াছিলাম। সাক্ষীরা বাজারে আসিবার প্রায় ৪ ঘন্টার পরে অর্থাৎ বেলা দুই পহরে দুই ঘন্টা সময় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই শিল ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া এলিয়ট সাহেব এক অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের একখানা পালকির ছাদে মেজ করিয়া তাহার উপরে কাগজ রাখিয়া উপস্থিত কীর্ত্তনীয়াদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিলেন। পরে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণনগরে তলবমতে হাজির হওয়ার নিমিত্ত, পাঁচ পাঁচ শত টাকার মুচলেকা লইয়া বিদায় হইলেন। আমরাও মহাআনন্দে বিল্বগ্রাম

প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যদি এইস্থানে মোকদ্দমার তদন্ত সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে সকল কুল রক্ষা হইত। অভাবনীয় প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবও সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাদেরও কোন বিঘ্ন হইত না। কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া ভব করিলেন। আমরা এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া নাচিয়া উঠিলাম, মনে করিলাম যে আমাদের অসাধ্য কাজ নাই, চেষ্টা করিলে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব এবং বাবুদের খালাসের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। সত্যকথা বলিতে কি, পরিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৈদ্যনাথেরই বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল। সে নূতন দারোগা হইয়া এই মোকদ্দমার তদন্ত ভালরূপে সমাপ্ত করিতে পারিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যদিও আমার মনে মনে শীঘ্র কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিবার সম্পূর্ণ বাসনা হইয়াছিল, তথাপি বৈদ্যনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমি লজ্জায় আর তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৈদ্যনাথ এক দিবস কোথা হইতে সংবাদ আনিল, যে নাকাশীপাড়ার নিকট পলাশডাঙ্গা নামক গ্রামে বাবুদিগের সংসারের দুইজন পুরাতন কায়স্থ কর্ম্মচারী আছে; যাহারা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং প্রাণান্তে মিথ্যা কথা কহে না। তাহাদের নাম আমি এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছি, বোধ হয় তাহাদিগের "সরকার" পদবী ছিল, সে যাহা হউক এই প্রবন্ধে আমি তাহাদিগকে সরকার বলিয়াই উল্লেখ করিব। বৈদ্যনাথের বিশ্বাস যে এই সরকার দুইজনকে কোনপ্রকারে উপস্থিত করিতে পারিলে, মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত যথার্থ বিবরণ আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু আমাদিগের নাকাশীপাড়ায় আগমনের পর পর্য্যন্ত এই দুই ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় গৃহমধ্যে গোপনভাবে রহিয়াছিল। পূর্ব্বকার ন্যায় তাহারা এক্ষণ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যায় না এবং বহির্বাড়ীতে ক্বচিৎ আসে। এমন অবস্থায় খানাতল্লাসী ভিন্ন তাহাদিগকে ধরিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া বৈদ্যনাথ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমি একত্র হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিলাম। দেখিলাম, যে এলিয়ট সাহেবও বৈদ্যনাথ হইতে বড় কম উদ্যমশীল নহেন। কীর্ত্তনীয়াদিগের প্রদত্ত প্রমাণে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, আরও প্রমাণ পাওয়ার অভিলাষী ছিলেন। আমাদের উপরিউক্ত রিপোর্টের উত্তরে তিনি উল্লেখিত মর্ম্ম অনুকরণ করিয়া, খানাতল্লাসীর দ্বারা সরকারদিগকে হাজির করার হুকুমযুক্ত এক পরওয়ানা আমাদিগের প্রতি প্রচার করিলেন। এই হুকুমটি অতি অন্যায় হুকুম এবং আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা বোধ হয় এলিয়েট সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিলে কখনই ঐরূপ হুকুম দিতেন না। আমরা পুলিশ আমলা, আপন নিষ্কৃতি এবং

অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত খানাতল্লাসীর দ্বারা সাক্ষী ধরিবার প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাহাতে কেহ আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষে তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য বলিতে হইবে। কিন্তু সেকালে আইনে অধিকার প্রায় সকলেই সমান ছিল এবং মাজিষ্ট্রেট এলিয়ট সাহেবের এই হুকুমটি অন্যায় বলিয়া কাহারও অনুধাবন হয় নাই। সে যাহা হউক, এতদিন আমরা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বসিয়াছিলাম দেখিয়া নাকাশীপাড়ার বাবুরা হর্ষযুক্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু যে দিবস আমরা পাটুলীর কীর্ত্তনীয়াদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলাম সেই দিবস হইতে তাঁহাদের মনে আশঙ্কার উদয় হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে ইহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলে, আরও না জানি, কোন্ সর্ব্বনাশ এবং কোন স্থান হইতে আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিবে। এইজন্য তাঁহারা, বিশেষতঃ সর্ব্ব ও ঈশানবাবুদ্বয় আমাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া যাহাতে আমরা নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টা বৃথা হওয়াতে, সর্ব্বাবাবু নাকি তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে "যদি অন্যরূপে ফল না হয়, তাহা হইলে দারোগাদিগকে উত্তম মধ্যম ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিবে।" এই হুকুম পাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত বাবুদিগের কর্ম্মচারীরা অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল. কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা পাইয়া উঠে নাই। খানাতল্লাসীর পরওয়ানা পাওয়ার পরে আমরাই আমাদের কার্য্য দ্বারা সেই সুযোগ ঘটাইয়া দিলাম। ঐ পরওয়ানা লইয়া একদিবস অনেক রাত্রি থাকিতে আমি এবং বৈদ্যনাথ পালকি করিয়া আমাদের সকল বরকন্দাজগুলিকে সঙ্গে লইয়া লাশডাঙ্গা যাইয়া সরকারদিগের বাড়ী ঘের দিলাম। সূর্য্যোদয় পরে যথারীতি মতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সাক্ষীদিগের দেখা পাইলাম না। এই কার্য্যে আমাদিগের প্রায় দুইঘন্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। খানাতল্লাসীর পরে আমরা অন্দরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাহির বাড়ীর দুর্গামণ্ডপের সম্মুখস্থিত দাঁড়ঘরাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম এবং নাকাশীপাড়া হইতে বাবুদিগের একজন কর্ম্মচারী আনাইয়া তাহার সম্মুখে আমরা খানাতল্লাসী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্থিত কোন দ্রব্য অপচয় কিম্বা অপহরণ করি নাই, তদ্বিষয়ে একখানা রসিদ সে গৃহের একটি লোকের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া, বিল্বগ্রাম প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। আমাদের দুইজনের দুইখানা পালকি পাশাপাশি এবং তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে বরকন্দাজেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতেছিল। আমার একটি দু-নলী বন্দুক তুলসীসিংহ নামক একজন বৃদ্ধ বরকন্দাজের হস্তে এবং পালকিমধ্যে একটা একনলী

পিস্তল ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, সে সময় রিবল্বর পিস্তল আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন আমার হস্তে একটা রিবল্‌বর থাকিলে বোধ হয় ঘটনার মূর্ত্তি অন্যরূপ হইত। পালকিতে বিছানা ও একটা রূপা বাঁধানো হুঁকা ও একটা পিতলের নদীয়ার গাড়ু ও একটা বাক্সে থানার কাগজপত্র ও শীলমোহর এবং নগদ অল্প কয়েক টাকা ছিল। আমার পরিধানে একখানা অর্দ্ধ-মলিন সামান্য মোটা আটপ্রহরী ধুতি এবং গাত্রে একখানা পুরাতন ভাগলপুরী খেস ছিল, মের্জাই কিম্বা অন্যপ্রকার পোষাক ছিল না। বৈদ্যনাথের পালকিতেও একটা বাক্স তাহার কাগজপত্র ও শীলমোহর ছিল, অন্য কি কি দ্রব্য ছিল, তাহা আমার স্মরণ নাই। কেবল ইহা খুব মনে আছে যে তাহার পরিধানে রজক-গৃহ হইতে নবাগত ধপ্‌ধপে শান্তিপুরের মিতি ধুতি ও অঙ্গে মের্জাই এবং চিকন চাদর দ্বারা মাথায় উষ্ণীষ বান্ধা ছিল। দাঁড়েঘরা হইতে আমাদের পালকি ৫০ হাতের অধিক দূর যাইতে, না যাইতে যে বরকন্দাজের হস্তে আমরা বন্দুকটা ছিল, সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কহিল যে "বাবুদের লোক আসিতেছে পালকি হইতে নামুন।" "লোক আসিতেছে" বাক্য শুনিয়া আমার প্রথমে বোধ হইল যে বুঝি বাবুদের কোন কর্ম্মচারী কোনও কথার নিমিত্ত আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। তাই ভাবিয়া আমি আমার পালকির বাম দ্বার দিয়া এবং বৈদ্যনাথ তাহার পালকির দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইলাম। বাহির হইয়া দেখি যে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী অনুমান ৬০/৭০ জন পশ্চিমদেশীয় পালোয়ান মল্লবেশে কেহ ঢাল তরবার, কেহ বর্শা এবং কেহ লোহাঙ্গী হস্তে করিয়া মহা আস্ফালন করিতে করিতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া, পালকির মধ্য হইতে পিস্তলটা উঠাইয়া, হস্তে লইয়া বৈদ্যনাথের সহিত একত্র পালকির দণ্ডের নিকট অগ্রসর হইলাম বেং আমাদের বরকন্দাজগুলিও সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ এবং আমাদের সঙ্গে যে তিনজন পশ্চিমা বরকন্দাজ ছিল, তাহারা হস্ত প্রসারণ করিয়ো দস্যুদিগকে বলিতে লাগিল যে "ভাগো ভাগো এয়্ সা কাম মত্ নেহি তো ফাঁসি যাওগে।" কিন্তু চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী; তাহারা উত্তর করিল যে "তোম্ লোক হট্ যাও তোম লোককো কুচ্ নেই বোলেঙ্গে, সেরেফ ঐ কালা দারোগা শারোয়াকা শীর লেঙ্গে, ওসকো ছোড়েঙ্গে নেহি।" বরকন্দাজেরা তদুত্তরে বলিল যে "আগে হাম লোক মরেঙ্গে, পিছে যো জানো সো করিও।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় আমাদের পশ্চাদ্ভাগে পালকির ছাদের উপরে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি যে, সেই দাঁড়ঘরা দেশী শড়কিওয়ালায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোঁচড়ে ঢেলা এবং হস্তে একখানা করিয়া ফরিদ ঢাল

ও তাহারা কয়েকগাছা বাঁশের শড়কি লইয়া ঢেলা নিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। তাহাদেরই কয়েকটা ঢেলা পালকির ছাদের ওপরে পতিত হইয়া শব্দ হইয়াছিল। অতএব দেখা গেল যে আমরা কোনও দিকদিয়া পলায়ন করিতে না পারি সেইজন্য দুই পথ বন্ধ করিয়া সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দিয়া দুইদল অস্ত্রধারী লোক আগমন করিতেছিল। প্রথমে সম্মুখের লোক দেখিয়া আমার যথার্থই আশঙ্কা হয় নাই কিন্তু শেষে পশ্চাদ্ভাগে শড়কিওয়ালা দেখিয়া ঘোর বিপদ বিবেচনা করিলাম। শড়কিওয়ালারা আসিবামাত্র দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথ যে আমার দক্ষিণ পালকির দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে, বাবুদের সেই কর্ম্মচারী, যে আমাদিগকে রসিদ লিখিয়া দিয়াছিল সে, রক্ষা করার অভিপ্রায়ে হস্তে ধরিয়া টানিয়া দাঁড়ঘরের নিকট এক ঘরের দিকে লইয়া গেল। সেই কর্ম্মচারী আমাকে কিছু না বলিয়া বৈদ্যনাথেব প্রতি ঐরূপ কৃপাবান হওয়াতে, আমার বিবেচনায় তাহার অভিপ্রায় এইরূপ বোধ হইল যে দারোগাদ্বয়ের মধ্যে কেবল আমাকে লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া লোক প্রেরিত হয় নাই। কারণ বৈদ্যনাথ নূতন দারোগা এবং বাবুদিগের উকীল রামগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, অতএব তাঁহাকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু কর্ম্মচারীটির বুদ্ধির গতিকে শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পশ্চাদ্ভাগে শড়কিওয়ালাদিগের আগমন দেখিয়া আমার পার্শ্বস্থ বুদ্ধু বরকন্দাজ ও আমার কৃষ্ণনগরের বেহারারা আমাকে তাহাদের মধ্যখানে করিয়া ঠেলিয়া বামদিকে স্থিত এক গোহালঘরে পিছনে লইয়া গমন করিল। তখন পশ্চিমা ব্যাটারা আমার পালকির নিকট আসিয়া "দারোগা শ্বশুর কাঁহা" বলিয়া আমাকে তল্লাস করিতেছে, আমরা তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিলাম, তথাপি তাহারা আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে, একেই আমি কৃষ্ণবর্ণ এবং দেখিতে কদাকার তাহাতে আমার পরিধানে অতি সামান্য পরিচ্ছদ ছিল, শরীরে মের্জাই কিম্বা অন্য কোন আচ্ছাদন ছিল না, সুতরাং তাহারা আমাদের সেই পলায়ন উদ্যত বেহারাদিগের মধ্যে একজন বেহারা বিবেচনা করিয়া লক্ষ্য করিল না এবং আমিও বেহারাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। শৈশবকালে আমার জনক-জননী আমার শ্রীহীন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিতেন কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে দেখিলাম, যে আমার শ্রীহীনতাই এক সময়ে আমার জীবনরক্ষার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। বেহারারা আমাকে লইয়া সেই গোহালঘরের পিছাড়া দিয়া সরকারদিগের বাড়ীর খিড়কী খণ্ডে উপস্থিত হইল; দেখিলাম যে সে স্থানে জন-মনুষ্য নাই, কারণ সকলেই আমাদিগকে আক্রমণ করার তামাশা দেখিতে বাহির বাড়ীর দিকে গিয়াছে সুতরাং আমরা কোন্ দিক দিয়া কোন্ দিকে

পলাইলাম, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। তৎপর আমরা কয়েকটা গড়, খন্দ ও আম্রবাগিচা অতিক্রম করিয়া, একটা মাঠের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম। পথে দেখিলাম দুই ধারে গ্রাম্য লোকেরা দলে দলে তামাশা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে একদলের একজন লোক আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল যে "ওগো তোমার পলাও কেন? তোমাদের কোনও ভয় নাই, বাবুদের লাঠিয়াল দারোগা ঠেঙ্গাইতে গিয়াছে।" বাবুদের গৌবরেই তাহাদের গৌরব এবং বাবুদের সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না এই বিশ্বাসে তাহাদের মনে যৎপরোনাস্তি অহঙ্কার ছিল। গ্রামবাসী লোকেরা কেহ আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই, চিনিতে পারিলে বোধ হয় আমাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিতনা। যাহা হউক, এইরূপে আমরা নাকাশীপাড়া ও পলাশডাঙ্গার মধ্যস্থিত মাঠের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাহার পরে কোন্ স্থানে গমন করিলে আমরা নিরাপদে থাকিতে পাইব, তাহাই চিন্তা এবং পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে সেই অঞ্চলে বাবুরা ভিন্ন কেহই আমাদের পরিচিত ব্যক্তি নাই। বিশেষ গ্রাম্য লোকেদের মুখে যেরূপ কথা শুনিতে পাইলাম, তাহাতে কোনও ব্যক্তির গৃহে রক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রবেশ করিলে, আমরা যে তাহার নিকট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইব তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই বরং বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। বিল্বগ্রামে আমাদের বাসায় যাইবার পথও আমরা ভালরূপে জানিতাম না। একে আশঙ্কায় এবং দুশ্চিন্তায় রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে চৈত্রমাসের রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ, তৃষ্ণায় মুখের মধ্যে ছাতু উড়িতেছে, এমত অবস্থায় "কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ং" ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া, নাকাশীপাড়ার সেই আক্রমণকারী বাবুদিগের শরণ লওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় মনে উদয় হইল না। ভাবিলাম যে "রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব", অতএব চন্দ্রমোহনবাবুর-বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর শরণাগত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। তিনি ভদ্র হিন্দু পরিবার, অবশ্যই আমার প্রতি কিছু না কিছু দয়া করিবেন। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া নাকাশীপাড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে এই গ্রামও জনশূন্য, কারণ সকল লোক লাঠিয়ালদিগের সঙ্গে সঙ্গে পলাশডাঙ্গার দিকে গিয়াছে। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার দেহড়ীতে কেবলমাত্র তাঁহার একটি বৃদ্ধ জমাদারকে দেখিতে পাইলাম। সে আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ তটস্থ হইল। বোধ হয়, আমাকে জীবিত দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্যবোধ হইয়া ছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে বলিলাম যে "জমাদার, তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট যাইয়া বল, যে আমি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া শরণাগত হইলাম। তাঁহার পুত্র যদু ও হিড়বাবুরা আমার পরম বন্ধু, অতএব তাঁহাদের

মাতা, আমারও মাতা, তিনি এক্ষণে মাতার ন্যায় কার্য্য করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" জমাদার সত্বর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বসিবার আসন দিয়া বলিল, যে "আপনি এইখানে বসুন, মাঠাকুরাণী বলিয়াছেন, যে আপনার কোনও চিন্তা নাই, তাঁহার এই বাড়ীতে আপনার প্রতি কেহ কোনরকম বদিয়ত করিতে পারিবে না।" ইত্যাকার বাক্যে আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া, অন্দর হইতে জল ও কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য আনিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিল।

আমি তো একরূপে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয়ের স্থান পাইলাম কিন্তু বৈদ্যনাথের কি অবস্থা হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর জমাদারকে বৈদ্যনাথের অনুসন্ধান করিতে বলিলাম কিন্তু সে বলিল যে এমন সময় আমাকে একাকী এই শূন্য বাড়ীতে রাখিয়া সে স্থানান্তর গমন করিলে, আমার পক্ষে বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে, বিশেষ তাহার কর্ত্রী তাহাকে দেহুড়ী ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার বুদ্ধু বরকন্দাজও বলিল যে সে আমাকে একলা ফেলিয়া এক পাও নড়িবে না। অন্তে অনেক বলিয়া কহিয়া আমার একজন কৃষ্ণনগরের বেহারাকে বৈদ্যনাথের অন্বেষণে পাঠাইলাম। চন্দ্রমোহনবাবুর দেহুড়ীতে বসিয়া শুনিতে পাইলাম যে পলাশডাঙ্গার দিক হইতে হৈ হৈ রৈ রৈ কার শব্দে লাঠিয়ালদিগের হাঁকার উঠিতেছে, কিন্তু সে স্থানে কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা হাঁকার উঠে, আর শুনিয়া আমার বুকের একপোয়া রক্ত শুখায়; ভাবি, যে আমি চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে আছি শুনিয়া ব্যাটারা বুঝি উল্লাসধ্বনি করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; কিন্তু জমাদার আমার মনের ভাব বুঝিয়া বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমার কোন চিন্তা নাই, সেখানে কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই এবং কেহ আসিবেও না। এইরূপে প্রায় একঘন্টাকাল অতীত হওয়ার পরে দেখিলাম, যে দুইটি লোকের স্কন্ধে ভর দিয়া বহুকষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বৈদ্যনাথ আমাদের দেহুড়ী অভিমুখে আগমন করিতেছে। তাহার সমস্ত শরীর জলে ও রক্তে আর্দ্র। মাথা, হস্তের বাহু, এবং জানু দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে এবং লাঠির আঘাতে শরীরে অনেক স্থান নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথ আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং আমরা উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। বৈদ্যনাথ বলিল যে "দাদা আমার যা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার ভাবনা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি মনে করিয়াছিলাম, যে এতক্ষণ তোমাকে ধড় ও আর একস্থানে তোমার মাথা দেখিতে পাইব। ব্যাটারা তোমাকে ধরিবার জন্য পলাশডাঙ্গার প্রত্যেক বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছে, তোমাকে একবার

হাতে পাইলেই, আমি শুনিয়াছি যে, তোমাকে বলি দিয়া ফেলিবে। এইক্ষণ তোমার প্রাণ-রক্ষা কিসে হয় তাহার উপায় কর। তোমার উপরেই তাহারা জাতক্রোধ, তোমাকে মারিবার জন্যই ব্যাটারা এই সাজ-সজ্জা করিয়া গিয়াছে, তোমাকে নিশ্চয় তাহারা বধ করিবে, আমি কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী বলিয়া মার খাইয়াছি।" বৈদ্যনাথের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম যে, "আমার আর কোন ভয় নাই, চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী আমাকে অভয়দান করিয়াছেন; নচেৎ এতক্ষণে লাঠিয়ালেরা এইখানে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।" বৈদ্যনাথের মুখে শুনিলাম যে, যখন সেই কর্ম্মচারী তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতেছিল, তখন দাঁড়ঘরার শড়কিওয়ালারা বৈদ্যনাথকে দেখিয়া "আরে ও এক শালা দারোগা" বলিয়া তাহাকে শড়কির খোঁচা মারিতে আরম্ভ করিল এবং তাহা দেখিয়া একজন পশ্চিমা আসিয়া একটা লাঠির দ্বারা বৈদ্যনাথকে আঘাত করিল। কর্ম্মচারীরা বারম্বার নিষেধ করাতেও তাহারা শুনিল না দেখিয়া সে নিজে উপুর হইয়া পড়িয়া তাহার আপন শরীর দ্বারা বৈদ্যনাথকে আচ্ছাদন করিল এবং লাঠিয়ালদিগকে বলিল যে "আহাম্মকেরা তোরা একি কার্য্য করিতেছিস্? তোরা যাহাকে মারিতে আসিয়াছিস্ সে কোথা গেল তাহার খোঁজ কর; ইহাকে অনর্থক মারিয়া কি হইবে? ইনি আমাদের লোক।" কর্ম্মচারীর এই সকল কথা শুনিয়া দস্যুরা বৈদ্যনাথকে মারিতে ক্ষান্ত হইয়া আমার অন্বেষণে গমন করিল। পরে বৈদ্যনাথকে কয়েকজন ভদ্রলোকে ধরিয়া একটি পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া নাকাশীপাড়ায় আনিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিল। তদনন্তর তদন্ত করিয়া দেখিলাম, যে বৈদ্যনাথের দুই বাহুতে চারিটা ও দক্ষিণ পদের ডিমের মধ্যে একটা শড়কির গভীর আঘাত, মাথায় লাঠির আঘাতে এক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং পৃষ্ঠে ও পঞ্জরে লাঠির আঘাতে অনেক স্থান বিবর্ণ এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই সকল আঘাত দিয়া এত রক্তস্রাব হইয়াছিল, যে বৈদ্যনাথ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং এমন গ্রীষ্মের সময়েও শীতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী কিছু টার্পিন ও একখানা পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়া দেওয়াতে তদ্দারা আমরা বৈদ্যনাথের আঘাত বেষ্টন করিয়া রক্ত পড়া বন্ধ করিলাম এবং স্ফীত স্থান সমস্তে টার্পিন ও অগ্নির সেক দিতে আরম্ভ করিলাম। এমন সময় বাড়ীর মধ্যে একটা শোরগোল শুনিতে পাইয়া আমাদের অত্যন্ত ভয় হইল। শুনিলাম, যে আমি চন্দ্রমোহন বাবুর দেহড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি শুনিয়া সর্ব্ববাবুর যে একজন কুটুম্ব লাঠিয়ালদিগের নেতা হইয়া পলাশডাঙ্গায় আমাদের আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, সে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লইয়া অন্দরমহলের মধ্য দিয়া পুনরায় আমাকে

মারিবার জন্য আসিতেছিল কিন্তু চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী তাহাদিগকে তাঁহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে "তোরা যে কর্ম্ম করিয়াছিস্ তাহাই আগে সামলা, পরে আবার মারিতে যাইস্।"

চন্দ্রমোহনবাবুর স্ত্রী এই দুরাত্মাদিগকে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন বটে কিন্তু বোধ হয় তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল না, কারণ দেখিলাম যে তিনি ক্ষণেক পরেই আমাদিগকে আমাদের বিল্বগ্রামের বাসায় পৌছিয়া দিতে উদ্যোগ পাইলেন এবং তাঁহার জমাদার এবং আর কয়েকজন লোক আমাদের সমভিব্যাহারে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ইহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে আমাদের কোনও আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। আমরাও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদানও তাঁহার পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিল্বগ্রাম যাত্রা করিলাম। পালকি অভাবে বুদ্ধ বরকন্দাজ বৈদ্যনাথকে স্কন্ধে করিয়া লইল, এবং আমি পরিধানে কেবল একখানা ধুতি ও হস্তে সেই পিস্তলটা লইয়া নতমস্তকে নাকাশীপাড়া হইতে প্রস্থান করিলাম। নাকাশীপাড়া পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই একটা জনরব শুনিয়াছিলাম যে বিল্বগ্রাম হইতে আমরা বাহির হইলে, দুরাত্মারা পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া আঘাতিত বৈদ্যনাথকে হস্তগত করিবে। আমি ইহা শুনিয়া একজন দ্রুতগামী বরকন্দাজকে মুড়াগাছার দেবীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক চাহিয়া পাঠাইলাম, যে তাহারা আসিয়া অদ্য রাত্রিতেই আমাদিগকে মুড়াগাছা লইয়া যায়। এই বন্দোবস্ত করিয়া আমরা নাকাশীপাড়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখি যে পথমধ্যে আমাদের বেহারারা আমাদের পালকি দুইখানা পলাশডাঙ্গা হইতে লইয়া আসিতেছে। দেখিলাম যে লাঠিয়ালেরা লাঠি মারিয়া দুইখানা পালকিরই ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থিত তৃণটি পর্য্যন্ত দ্রব্য সকল লুটিয়া লইয়াছে। বন্দুকটি প্রথমেই একজন দস্যু সেই বৃদ্ধ বরকন্দাজের গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। বৈদ্যনাথকে পালকিতে বসাইয়া বিল্বগ্রাম পৌছিলাম এবং কিছুকাল পরে মুড়াগাছার বাবুদিগের প্রেরিত প্রায় ৪০ জন অস্ত্রধারী লোক আসিয়া পৌছিলে, আমরা তাহাদের সঙ্গে মুড়াগাছায় গমন করিলাম এবং সেইস্থানে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তাহার পরদিবস প্রাতে আসিয়া কৃষ্ণনগর পৌছিলাম।

গোয়াড়ীর খেয়াঘাটের নিকটে বৈদ্যনাথের পিতার বাসাবাড়ী ছিল। সেইখানে আসিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং আমাদের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বৈদ্যনাথের আঘাতের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিলে পর, এলিয়ট সাহেব আমাকে সঙ্গে

করিয়া তাঁহার কুঠীতে লইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া বিদায় দিলেন। বৈদ্যনাথ সুন্দররূপে আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় একমাস কালের অধিক লাগিল। নাকাশীপাড়া হইতে আমাদের কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করার পরে, সাধারণের বিশেষ বাবুদের, মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে মাজিস্ট্রেট সাহেব না জানি তাঁহাদের প্রতি কত অত্যাচার করিবেন, কিন্তু ঘটনার পরে একমাসের অধিককাল অতিবাহিত হওয়াতে বাবুদের সেই আশঙ্কা দূর হইল এবং তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, মাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে কিছুই করিবেন না, অধিক হইলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। বাবুদিগের সহিত কথোপকথন হইলে আমিও এলিয়ট সাহেবেব ইঙ্গিতে সেই ভাবের আভাস প্রকাশ করিতাম সুতরাং বাবুরা অনেকে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ দিকে এলিয়ট সাহেব গোপনে কমিশনর ও গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। বৈদ্যনাথ ভালরূপে আরাম হইলে পর, একদিন রাত্রি অনুমান ১১ ঘন্টার সময় আমার থানাতে ৮ টা হস্তী ও দুইশত বরকন্দাজ এবং আরও দুইজন আমার অপরিচিত সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র আমার থানার সকল বরকন্দাজ ও দুইজন জমাদার ও কৃষ্ণনগর সহরের সমুদয় চৌকিদার সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। আমি পূর্ব্বেই ইহা অবগত থাকিয়া উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে সাহেবদের আদেশ পালন করিয়া আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার বাবুদিগের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাবুরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাজিস্ট্রেট সাহেব যাইয়া, বাবুরা তখন যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় দুইজনকে এক হস্তীর উপরে বসাইয়া প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠের আলানের দুইধারে অর্থাৎ দুইজন বাবুকে মধ্যে করিয়া দুইজন সাহেব উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেক সাহেবের হস্তে এক একটা দোনালা পিস্তল বাহির করিয়া বাবুদিগকে দেখাইয়া তাহার মধ্যে গুলি ও বারুদ ভরিয়া লইলেন এবং বাবুদের বলিলেন যে তাহারা কেহ কোন উচ্চবাচ্য কিম্বা কোনরূপ অবাধ্যতা দেখাইলে, তৎক্ষণাৎ পিস্তলের দ্বারা তাঁহার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। গোয়াড়ীর ঘাটে আসিয়া দেখিলাম যে সেইখানে বৈদ্যনাথ একশতজন লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। আমি ও বৈদ্যনাথ চন্দ্রমোহনবাবুর দুই পুত্রকে লইয়া এক হস্তীতে উপবেশ করিলাম এবং তাঁহাদের দুইজনের কোন চিন্তা নাই বলিয়া আশ্বাস দিলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা সকলে নাকাশীপাড়ার সম্মুখে পৌঁছিয়া দুইদলে বিভক্ত হইলাম; একদল পলাশডাঙ্গার দিকে গমন করিল এবং দ্বিতীয় দল নাকাশীপাড়া প্রবেশ করিল। নাকাশীপাড়ায় আসিয়া এলিয়ট সাহেব ব্যক্ত করিলেন, যে তাঁহার দারোগাদিগকে যে সকল লোকে আক্রমণ

করিয়াছিল তাহাদের ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আসিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, আসামী ধৃত করা কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, বাবুদের অপমান করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার ও বৈদ্যনাথের অনুরোধে কেবল চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ীতে সকলকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া, নাকাশীপাড়ার ও পলাশডাঙ্গার অন্য সকলের বাড়ীতে যাইয়া আসামীদের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং আমাদের কার্য্য সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত বাবুদের সকলকে এক প্রকাশ্য স্থানে বসাইয়া, তাঁহাদের উপরে বরকন্দাজ ও জমাদার প্রহরী সংস্থাপিত হইল। চন্দ্রমোহনবাবুর বাড়ী ভিন্ন অন্যান্য বাবুদের বাড়ী ও নাকাশীপাড়া ও পলাশডাঙ্গা গ্রামের সেইদিন আমাদের সঙ্গের লোকের হস্তে, যে কি দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা এস্থানে বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যক রাখে না। পাঠক অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারেন। এই খানাতল্লাসীতে আমাদের আক্রমণকারী লোকের মধ্যে কেবল ১০ জন লোক ধৃত হইয়াছিল। খানাতল্লাসী সমাপ্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেন্টের হুকুমমতে সেই তারিখে নাকাশীপাড়াতে নাকাশীপাড়ার থানা নামক থানা সংস্থাপন এবং তাহার আবশ্যকীয় দারোগা প্রভৃতি পুলিশ আমলা নিযুক্ত করিয়া, কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন করিলেন। সেই পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার বাবুরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের কি অবস্থা তাহা আমি জানি না।

আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নাকাশীপাড়ার নাম আমার চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত থাকিবে এবং নাকাশীপাড়ার লোকেরাও আমার নাম শীঘ্র ভুলিবে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিয়া আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কয়েক বৎসর পরে এফ, আর, কক্‌রেল সাহেব মাজিষ্ট্রেট এক খুনী মোকদ্দমার তদন্তের জন্য আমাকে নিযুক্ত করাতে, পুনরায় নাকাশীপাড়ায় যাইতে হইয়াছিল। নাকাশীপাড়ার লোকেরা আমাকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "ভাই সাবধান! আবার সেই মুষল নাকাশীপাড়ায় আসিয়াছে।"

হাকিম ও আমলাদের কথা

সকলেই জানেন যে ইংরাজের আমলের প্রথমাবধি দেশের শাসন, বিচার প্রভৃতি সমুদয় রাজকার্য্যের ভার সাহেবদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দেশীয় লোকে উচ্চপদে প্রবেশ করিতে পাবিত না, তবে যে দেওয়ানী মুচ্ছুদ্দীগিরি চাকরি করিয়া পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী সম্যক্ মর্য্যাদা এবং বহু ধনসংগ্রহ রিকায় গিয়াছিলেন, তাহাও কেবল অধীন আমলার কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘকাল পবে সাহেবেবা আমাদের হস্তে বিচারকার্য্যের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এখন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ, সবজজ প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি আমাদের যুবা বয়সেই প্রথম আরম্ভ হয়। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুলের সহিত ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে পরে, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী ৺কৃষ্ণনাথ কুমার যে খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার তদন্তের ভার এই চন্দ্রমোহনবাবুর হস্তে অর্পিত হয়। প্রবাদ আছে যে দ্বারকনাথ ঠাকুর নিজে কুমার কৃষ্ণনাথের অনুকূলে চন্দ্রমোহন বাবুকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ লক্ষাধিক টাকারও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু দৃঢ়চিত্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করাতে অভিযুক্ত কুমার নিস্তারের উপায়ান্তর না দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার জোড়াসাঁকো ভবনে বন্দুকের দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তখন আমরা কলেজে পড়ি। "কৃষ্ণনাথ কুমার গুলি খাইয়া মরিয়াছে" এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সেই দিবস কলিকাতায় এমন একটা হুলু-স্থূল পড়িয়া গেল, যে তেমন আর কখনও দেখি নাই। আন্দামান উপদ্বীপে লর্ড মেয়োর বধের সংবাদ যে দিবস কলিকাতায় প্রচারিত হয়, সেই দিবসেও আমি কলিকাতায় ছিলাম,

কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের চিত্ত তত আকর্ষণ করে নাই বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, কুমারজীর মৃত্যুর সময় কলিকাতায় সংবাদপত্রের ব্যবহার ছিল না; যে দুই একখানা ছাপা হইত, তাহাও লোকের দ্বারা বড় গৃহীত কিম্বা পঠিত হইত না। সংবাদের জন্য সকলেই জনরবের উপর নির্ভর করিত। হাটে বাজারে, রাস্তায় ঘাটে, ধনী লোকের বৈঠকখানায়, দরিদ্রের কুটীরে, গাঁজার আড্ডায় ও শরাবের দোকানে এবং স্কুল কলেজে—সকল স্থানেই কয়েক দিবস ধরিয়া ঐ কথার ঘোর আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিয়াছিল। স্কুল ও কলেজ সমস্তে ইহার বিশেষ উল্লেখ হওয়ার কারণ এই যে, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালকের বন্ধু হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জন্য কোন চিরস্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের উপায়ের নিমিত্ত মেডিকাল কলেজের দরবার ঘরে এক মহতী সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে কৃষ্ণনাথ কুমার বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন এবং নিজে তিন হাজার টাকা দান করিয়া, আবশ্যক হইলে আরও অধিক টাকা দিবেন বলিয়া, অঙ্গীকার করিযাছিলেন। হেয়ার সাহেবের যে শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি এইক্ষণে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় হেয়ার স্কুলের সম্মুখে বিরাজমান, তাহা সেই টাকায় নির্ম্মিত হয় এবং সেই নিমিত্ত কুমার বাহাদুর ছাত্রবর্গের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন।

মুন্সেফীপদও ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের জন্য খোলা ছিল কিন্তু বেতন ছিল কেবল ২৫ টাকা মাত্র সুতরাং মুন্সেফদের যে অতি নিকৃষ্ট অবস্থা ছিল তাহা আর বলিয়া কষ্ট হইবে না। কিন্তু যদিও সাহেবেরা দেখিতে দেশের বিচারপতি ছিলেন তথাপি প্রকৃতপক্ষে সকল বিচারালয়ে বিচার করার কার্য্য সেই আদালতের দেওয়ান ও তদধীন আমলার হস্তে অনেকটা নির্ভর করিত। আমি এমন কথা বলি না, যে সাহেবদের মধ্যে কেহই বিচারকার্য্যে পটু ছিলেন না। সিবিলিয়ান বিচারপতিগণের মধ্যে হারিংটন, ডি,সি, স্মিথ প্রভৃতি অনেকে সুবিচারের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রশংসিত ছিলেন। সুবিচার করার নিমিত্ত অনেক সাহেবরই মনে সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল কিন্তু শুদ্ধ বিচারকের চেষ্টায় এবং ইচ্ছায় তো বিচারকার্য্য সর্ব্বাঙ্গ- সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হয় না। একে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাতে আইন-কানুনের অল্পতা ও অনিশ্চিয়তা, বিশেষ কোন্ স্থানে কোন্ আইন খাটিবে কি খাটিবে না, তাহা দেখাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত এখনকার মত তখন শিক্ষিত উকীল সম্প্রদায় ছিল না, সুতরাং হাতুড়িয়া কবিরাজের হস্তে রোগের যেরূপ চিকিৎসা হইয়া থাকে, সেকালের বিচারকদিগের হস্তেও বিচারকার্য্য সেইরূপ নিষ্পাদিত হইত। কিন্তু অনেক স্থানে এবং সময়ে সাহেব হাকিমেরা কেবল সাক্ষীগোপালের ন্যায় এজলাসে বসিয়া থাকিতেন, আসল কার্য্য দেওয়ানজীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। দেওয়ানজীরা অতি

উচ্চদরের লোক ছিলেন এবং ফারসী ভাষায় তাঁহাদের দক্ষতা থাকা আবশ্যক ছিল। মোকদ্দমার রায় ফয়সালা সমুদয় আবশ্যকীয় কাগজ দেওয়ানজীকেই লিখিয়া প্রস্তুত কবিতে হইত। যে আদালতেব সাহেব কার্য্যক্ষম হইতেন তিনি অধিক করিলে নিজে কেবল ডিক্রী কি ডিসমিস বাক্য উচ্চারণ করিয়া অবসর লইতেন। হেতুবাদ সমস্ত ব্যক্ত এবং লিপিবদ্ধ করা দেওয়ানজীর কার্য্য ছিল। অনেক আদালতে দেওয়ানের ইঙ্গিতমতে সাহেবেরা নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইতেন সুতরাং সাহেবেরা খুব ভাল লোক দেখিয়া দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন।

তবে টাকা লওয়াটা সাধারণ প্রথা ছিল এবং পূর্ব্বে সাহেবেরা অনেকেই এই দোযে মুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে ঘুস লওয়াকে আমরা যেমন দুষ্কর্ম মনে করি তখন লোকেব সে জ্ঞান ছিল না। ঘুস না দিলে কোনও কার্য্য হইত না। কিন্তু এক্ষণে সেই দোযের হ্রাস হইয়াছে বলিযা অর্থী প্রত্যর্থীগণের বড় বিশেষ সুবিধা হয় নাই। সকল কালেই তাহাদের ভাগ্যে সমান কষ্ট, তখনও দেওয়ানর্জীকে কিম্বা অন্যান্য আমলাকে টাকা না দিলে মোকদ্দমাব সুবিধা ছিল না এখনও ষ্টাম্প রুসুম, আদালতের নানা প্রকার ফাঁস্ ও উকীল কৌন্সলীর মেহেন্নতানা দিতে লোকের সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখনও দেওয়ানজীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইত, এখনও সেইরূপ উকীল বাবুদিগকে টাকা দিতে ও উপাসনা করিতে হয়। তবে তখন দেওয়ানজীকে পরিতোয করিতে পারিলেই জয়লাভের সন্দেহ থাকিত না কিন্তু এইক্ষণে উকীল বাবুদিগকে মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে পারিলেও সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না।

কাছারীর আমলাদিগের মধ্যে উৎকোচ লওয়ার প্রথা এক্ষণে অসাধারণ হইয়া উঠিযাছে বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। আমলারা ঘুস লয়েন না বলিয়া লোকের বিশেষ সুবিধা কিম্বা উপকার বর্দ্ধিত হয় নাই বরং অসুবিধা এবং অনুপকারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যখন আমলারা ঘুস লইত, তখন কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই আপনার স্বেচ্ছাধীন সময়ের মধ্যে আমলা দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লওয়া যাইত, ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইত না। পূর্ব্বে আমলাকে যে টাকা উৎকোচ স্বরূপ দেওয়া যাইত বরং তাহার অধিক টাকা সেই কার্য্যের জন্য এখন আদালতের ফীস্ স্বরূপে দিতে হয়, কিন্তু নিয়মের অধীন হইয়া আমলাদিগের ইচ্ছা এবং সাবকাশের প্রতীক্ষা করিতে হয়। আগে চারি গণ্ডা পয়সা দিলে আমলার দ্বারা অর্দ্ধঘন্টার মধ্যে যে কার্য্য সম্পাদিত করিয়া লওয়া যাইত, এক্ষণে আদালতে সেই কার্য্যের জন্য একটাকা ফীস্ দিয়া তিন দিবস আদালতে হাঁটিয়া

হাঁটিয়া প্রাণান্ত হইতে হয়। বিশেষ আর যে এক উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনেক স্থানে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে সকল আমলারা বেরোঁয়া হইয়াছেন, অহঙ্কারে তাঁহাদের মাটিতে পা পড়েনা। তাঁহারা ঘুস গ্রহণ করেন না বলিয়া প্রার্থীদিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন এবং কটুকাটব্যের সহিত তাহাদিগের ব্যবহার করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই স্থানে এতৎসম্বন্ধে আমি একটা রহস্যের কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমি কিছুকাল তমলুকের নিমক মহলের হেড কেরাণী ছিলাম। তমলুকে নিমকের এজেন্ট সাহেবই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু ছিলেন এবং গবর্ণমেন্টের সকল কার্য্যালয়ই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল এবং তদনুযায়ী ডাকঘরও তাঁহার অধীনে ছিল। সেই ডাকঘর আমাদের নিমক মহলের কাছারী বাড়ীর এক ঘরে স্থাপিত ছিল, এবং ডাক মুন্সী ছিলেন,— একজন বৃদ্ধ কায়স্থ। ইহা কাহারও অবিদিত নাই, যে পূর্ব্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেও কলিকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সেকালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে

নূনে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর্, না দেখ্ মোর্।।

নিমক মহল ও কাপড়ের কুঠী উভয়ই সেকালে টাকার গাছ (Paogdatr ee) ছিল। কিন্তু আমি যে সময়ে তমলুকে চাকরী করিতে যাই তখন "তালপুকুরের" কেবল নাম ছিল, তাল অথবা পুকুর কিছু ছিল না। তথাপি নামের মাহাত্ম্য কোথায় যায়? এমন ভগ্নাবস্থায়ও আম্‌লারা প্রতি বৎসর দাদনের সময় মলঙ্গীদিগের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বার্ষিক পাইতেন এবং সেই বার্ষিকই তাঁহাদের নিমিত্ত প্রচুর ছিল। দাদনের সময় নিমক মহলের সকল আমলার কিছু না কিছু লাভ হইত, কেবল হইত না,—আমাদের ডাক মুন্সী মহাশয়ের। কারণ ডাক মুন্সীর সঙ্গে নূনের মলঙ্গীদিগের কি সম্পর্ক যে তাহারা তাঁহাকে বার্ষিক দিবে? সেই নিমিত্ত মুন্সী মহাশয়ের মেজাজ সর্ব্বদা গরম থাকিত। দাদনের সময় সকল মলঙ্গীরা টাকা লইতে তমলুকের কাছারীতে আসিত এবং হাঁ করিয়া কাছারী বাড়ীর সকল ঘরের সাহেব আমলাদিগকে দেখিয়া বেড়াইত। স্বয়ং এজেন্ট সাহেবের ঘরে যাইলেও সাহেব মলঙ্গীদিগকে কিছু বলিতেন না, কিন্তু কেবল আমাদের ডাক মুন্সী মহাশয়ের তাহা সহ্য হইত না। কোনও মলঙ্গী তাঁহার ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি আরক্ত লোচনে এবং একটা রুল হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া মলঙ্গীদিগকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন যে "তোম লোক হিঁয়াসে নিকাল যাও, আমি তোমাদের রেস্বদ খাই

না, এখানে রেম্পদের কোনও এলাকা নাই।" আদালত ফৌজদারী ও কলেক্টরীর আমলারা যে কোন কারণে হউক এইক্ষণে বেরোঁয়া হইয়াছেন বলিয়া উক্ত ডাক মুন্সীর মত অর্থী প্রত্যর্থীদিগের প্রতি কটু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে সিবিলিয়ানদিগের নিয়োগের স্বতন্ত্র প্রণালী ছিল। তাঁহারা সুপারিশে নির্ব্বাচিত হইয়া ইংলণ্ডে হেলিয়বারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পাঠ করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইতেন এবং কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামক বিদ্যালয়ে, বাঙ্গালা, পার্সী, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয়ভাষা সকল শিক্ষা করিয়া কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন। কলিকাতার লালদীঘীর উত্তর ধারে যে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা এবং বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা ছিল এবং যাহা এক্ষণে বহুব্যয়ে সংস্কার করিয়া বঙ্গদেশের সেক্রেটারিয়েট আফিসে পবিণত করা হইয়াছে, সেই গৃহেই এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত ছিল এবং তাহার এক এক ঘরে এক একজন সিবিলিয়ান যুবা পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইতেন। প্রথমে সিবিলিয়ানদিগের নাম Writer (কেরাণী) ছিল বলিয়া তাঁহাদের এই বাসের গৃহকে লোকে Writers Buildings (কোম্পানির বারিক) বলিত।

সিবিলিয়ান যুবক সাহেবদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অনেক ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতেরা নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক দিত। ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার প্রথম বয়সে এইরূপ একজন শিক্ষক ছিলেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কালীপ্রসন্ন দত্তের পূর্ব্বপুরুষেরাও এই কার্য্য করিতেন, কিন্তু সকলের উপরে রাজনারায়ণ গুপ্ত নামক শ্রীখণ্ডের হরি হরি খাঁ বৈদ্য কুলীন এইরূপ শিক্ষকবৃত্তি দ্বারা অনেক ধন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাহির সিমলা বেচু চাটুর্য্যীর গলির যে স্থানে এক্ষণ রাজা দুর্গাচরণ লাহার বাড়ী, সেই স্থানে উক্ত রাজনারায়ণ মুন্সীর এক বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এই কার্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই সিবিলিয়ান যুবকদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালা এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষা সমস্তে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করা হইয়াছিল এবং বঙ্গভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক এই সকল সাহেবদিগের হিতার্থেই লিখিত হয়। এক্ষণে আর সেই সকল পুস্তকের চলন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শৈশব পুস্তক বলিয়া বরাবর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় ৩ বৎসরকাল বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষান্তে সিবিলিয়ানরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আসিষ্ট্যান্ট পদ পাইয়া চলিয়া যাইতেন।

বর্ত্তমান কালে যেমন যে সে ব্যক্তি ১৯ বৎসর বয়সের মধ্যে লণ্ডন নগরে

উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই সিবিলিয়ান হইতে পারেন, পূর্ব্বেই সেরূপ যে সে মনুষ্য সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিতেন না। ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত বিলাতে যে কোর্ট অব ডাইরেক্টর নামক সভা ছিল, তাহার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বৎসর দুই একজন করিয়া সিবিলিয়ান নিযুক্ত করার ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে না পারিলে, সিবিলিয়ান হওয়ার উপায় ছিল না এবং সেই কারণে পূর্ব্বে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংলণ্ডের মর্য্যাদাপন্ন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানেরা অনেক স্থলে সিবিলিয়ানিতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহাদের গুণেই এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশোদ্ভব সাহেবেরা পর্য্যায়ক্রমে সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেন। ইহাঁরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকার সিবিলিয়ান সাহেবদিগের এদেশের লোকের প্রতি দয়া মমতা ছিল এবং তাহারা নিজে যেমন ভদ্র বংশে উদ্ভুত, সেইরূপ এখানকার ভদ্রলোককেও তাঁহারা যথোচিত সম্মান করিতে ত্রুটি করিতেন না। সিবিলিয়ান সাহেবেরা যতদিন ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেন, ততদিন তাঁহাদের সকলেরই এক একজন দেওয়ান মুচ্ছুদ্দী থাকিত। তাঁহারা বিলাত যাইবার সময় তাঁহাদিগকে নিদর্শন কিম্বা সুখ্যাতি পত্র দিয়া যাইতেন, যে তাঁহাদের সন্তানেরা ভারতবর্ষে সিবিলিয়ান হইয়া আসিলে, সেই সকল নিদর্শন পত্র দেখিলে, দেওয়ান মুচ্ছুদীর সন্তানেরাও তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং অনেক যুবক সিবিলিয়ান তাঁহার পিতার ঐরূপ নিদর্শন পত্র দেখিয়া আগ্রহের সহিত সেই দেওয়ানের উত্তরপুরুষদিগকে চাকরি দিতেন কিম্বা প্রকারান্তরে উপকার করিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমি এইস্থানে বিবৃত করিব। ডাম্পিয়ার সাহেব যিনি অতি অল্পদিন হইল রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়া চাকরী হইতে অবসর লইয়াছেন তিনি যখন বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারি ছিলেন, তখন, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺রামকুমার বসু মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রামকুমার দাদা শুনিলেন, যে তাঁহাকে ২৪ পরগণা হইতে এক দূর জেলায় বদলি করার কথা হইতেছে। তিনি তাহা শুনিয়া ডাম্পিয়ার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঐ সাহেবের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল না। ডাম্পিয়ার সাহেব রামকুমার দাদার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এমন তাঁহার বোধ হইল না বরং তিনি সাহেবের উল্টা অভিপ্রায়ই বুঝিলেন। তাহাতে রামকুমার বাবু সাহেবকে বলিলেন যে "মহাশয় আপনার অনুগ্রহের উপরে আমার কিছু দাবি আছে।" সাহেব এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া রামকুমার দাদার সহিত কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু উপরিউক্ত বাক্য শুনিয়া তিনি বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কিরূপে আমার অনুগ্রহের

উপরে তোমার দাবি আছে?” রামকুমার দাদা উত্তর করিলেন যে “আপনার পিতার নিকট আমার শ্বশুর চাকরি করিতেন।” সাহেব রামকুমার দাদার শ্বশুরের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা নাম ব্যক্ত করিবামাত্র সাহেব তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাহার পরে রামকুমার দাদার সহিত অনেক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। ইহা অতি অল্পদিনের কথা, কিন্তু পূর্ব্বতন সিবিলিয়ানদের দল এক্ষণে প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

নূতন প্রণালীমতে যাঁহাবা সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাব অন্য রকমের। কয়েকখানা নির্দ্দিষ্ট কেতাব পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি উত্তম শাসনকর্ত্তা এবং বিচারক হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে; কিন্তু যাউক সে কথা। আমি কেবল পূর্ব্বকালের হাকিমের কথা বর্ণনা করিব সুতরাং নূতন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আমার অনধিকার এবং তাহাতে আমি হস্তক্ষেপণও করিব না। সেকালের হাকিমদের পুঁথিগত বিদ্যা না থাকিলেও তাঁহারা যে কম বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন এমন নহে। বিশেষ তাঁহারা অহঙ্কার শূন্য ছিলেন এবং ভাল কথা শুনিলে তাহা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এখন যেমন সাহেবেরা ভারতবর্ষে দুইদিন পদনিক্ষেপ করিয়া “হাম জান্তা” এবং “সব জান্তা” প্রভু হইয়া পড়েন, তখনকার হাকিমেরা তাহা করিতেন না। তখনও অল্প বয়সে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের উপরে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু তাঁহারা নিজে যে সকল বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন না, সেই সকল বিষয়ে আমলাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান কিম্বা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। কাছারীর সকলেই এক কার্য্যের জন্য ব্রতী বলিয়া তাঁহাদিগের অনুধাবন ছিল। এমন ভাবিতেন না যে আমি উচ্চপদস্থ অতএব আমি সকল অপেক্ষা ভাল বুঝি এবং আমার অধীন আমলারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

কলিকাতার বড় ট্রেজারিতে এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও অনেক কেরাণী ছিল কিন্তু কেরাণীরা অনেকে ইংরাজী কেবল লিখিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের কেরাণীদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। কায়কষ্টে উপরিতন সাহেবকে মনের ভাব বুঝাইতে পারিতেন। একবার একজন কেরাণী একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তা সবট্রেজরর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলে, সাহেব সেই হিসাবের কয়েক দফা খরচ অন্যায্য বিবেচনা করিয়া তাহা কর্ত্তন করার মানসে কলম তুলিয়া লইলেন। কেরাণী তাহা দেখিবামাত্র অগ্রসর হইয়া সাহেবের হাত ধরিয়া ব্যগ্র চিত্তে বলিয়া উঠিলেন যে “নাট্‌ কাট্‌ নাট্‌ কাট্‌ স্যার রীজন গাট্‌।” অর্থাৎ ”কাটিবেন না কাটিবেন না মহাশয় কারণ আছে।”

সাহেব কেরাণীর কাণ্ড দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কেরাণীর নিকট কারণ শুনিয়া সেই সকল খরচ মঞ্জুর করিলেন। বলুন দেখি এখনকার দিনে কেরাণী ওরূপ কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিফল কি হইত?

আর একবার ২৪ পরগণার কালেক্টরীতে এক পল্টনের রসদের জন্য পল্টনের কাপ্তেন সাহেব কলেক্টর সাহেবকে পত্র লেখেন। কলেক্টর সাহেব সেই পত্রের উত্তর মুসাবিদা করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার নিমিত্ত কেরাণীখানায় পাঠাইয়া দেন। যে কেরাণীর উপর ঐ সকল চিঠি লিখিবার ভার ছিল, সে দস্তুরমত কাপ্তেন সাহেবের নামের নীচে N.I. অর্থাৎ Native Infantry বলিয়া লিখিয়া দস্তখতের জন্য কলেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিল। সাহেব N.I. কাটিয়া তাহার স্থলে I.N. করিয়া দিয়া পুনরায় চিঠিখানা সাফ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেরাণী I.N. না লিখিয়া পূর্ব্ববৎ N.I. লিখিয়া চিঠি কলেক্টরের নিকট পাঠাইল। সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কেরাণীকে ডাকিয়া সে কি জন্য বারম্বার ভুল লিখিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেরাণী বলিল যে, "Servant not make fault. Master make fault." অর্থাৎ "আমার ভুল হয় নাই, হুজুরের ভুল হইয়াছে।" সাহেব বলিলেন যে "না তোমারই ভুল হইয়াছে।" তাহাতে কেরাণী আর উত্তর না করিয়া দ্রুতবেগে কেরাণীখানায় যাইয়া চিঠির নকল বহিখানা আনিয়া সাহেবকে দেখাইয়া দিল, যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত কাপ্তেন সাহেবকে ঐরূপ পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহার সকলেতেই N.I. লিখিত আছে, অতএব সে পুনরায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের সহিত বলিল যে, "See Sir Master make fault" অর্থাৎ দেখুন হুজুরেরই ভুল হইয়াছে। সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু এই কাপ্তেন Native Infantryর কাপ্তেন নহে Indian Navyর কাপ্তেন অর্থাৎ ইনি পদাতিক সৈন্যের কাপ্তেন নহেন, নৌ-সেনার কাপ্তেন অতএব ইহাঁকে I.N. লিখিতে হইবে। কেরাণী তখন দন্তে জিহ্বা কাটিয়া যোড় হাত করিয়া সাহেবকে বলিল যে "Then Servant make fault Sir" অর্থাৎ তবে অধীনের দোষ হইয়াছে। এমন শীতল-প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ক্ষমাশীল হাকিম এখন কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়?

ইহারও পূর্ব্বের হাকিমদিগের আরও ভাল প্রকৃতি ছিল। নবাব সুভার নিকট হইতে রাজ্য লইয়া সাহেবেরাও অনেক বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতেন। ঘরকন্নার বিষয়ে কেহই নিজে দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাহার ভার আমলা এবং ভৃত্যদিগের উপরে ন্যস্ত থাকিত। সাহেবেরা কেবল চাহিতেন এবং ভোগ করিতেন। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের লক্ষ্মীশ্রী মূল তিনটি P ছিলেন অর্থাৎ তিনজন

সাহেবের নামের প্রথমাক্ষর P ছিল। Parker, Plowden, Pattle এই সাহেবত্রয়ের অনুগ্রহেতেই তিনি ভাগ্যধর হইয়াছিলেন এবং চরিত্রও তাঁহাদের অত্যন্ত উদার ছিল। পার্কার সাহেব কেবল উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান ছিলেন এমন নহে, ইংসাজী সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত ইংরাজী কবিতা অত্যন্ত মধুর এবং তাহা পাঠ কবিলে তৃপ্তি জন্মে। D.L.Richardson সাহেবের Selection বহিতে পার্কার সাহেবের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্যাটেল সাহেব কিঞ্চিৎ উগ্রভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন এবং প্লাউডেন সাহেব অতি উচ্চ ঘরের লোক। তাঁহার বংশের ব্যক্তি এখনও বঙ্গদেশে সিবিলিয়ান আছেন। যখন দ্বারকানাথবাবু নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন, তখন প্লাউডেন সাহেব ২৪ পরগণায় নিমকের এজেন্ট (Salt Agent) ছিলেন। ২৪ পরগণা এজেন্সির অধীনে নানা স্থানে এক একজন নিমকের দারোগা নিয়োজিত ছিল, ইহার মধ্যে আলীপুরের দারোগার উপরে এজেন্ট সাহেবের বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই যে এই সকল দারোগা এবং তাহাদের নিম্ন আমলা সমস্তই দ্বারকানাথবাবুর নির্ব্বাচিত কিম্বা নিজের লোক ছিল। একদিন সাহেব একটা গাভী ২০সের দুগ্ধ দেয় শুনিয়া তিনি অনেক টাকায় ক্রয় করেন এবং তাহা বাড়ীতে আনিয়া তাহাকে খুব যত্নে রাখিতে দারোগাকে আদেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গাভীটা সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া ৬/৭ সেরের অধিক দুধ দিত না। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বেও সে ঐ পরিমাণে দুগ্ধ দিত, কিন্তু বিক্রেতা সাহেবকে বঞ্চনা করিয়াছিল। সে যাহা হউক, বিক্রেতা বঞ্চনা করিলে কি হয়, সাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে গোরুটা যথার্থই ২০সের দুগ্ধ দেয়। বিক্রেতার কথামত গাভী দুগ্ধ দেয় না দেখিয়া সাহেব মনে করিলেন যে হয় দারোগা উহাকে ভাল করিয়া সেবা করে না, নচেৎ দুগ্ধ চুরি করে। তাঁহার ধারণা ছিল যে বাঙ্গালীরা অত্যন্ত দুগ্ধপ্রিয় অতএব তাঁহার চাকরেরা তাঁহার ভৃত্যদিগের উপর শাসন করিতে এমন কি তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দারোগা সাহেবের এই ব্যবহার দেখিয়া দ্বারকানাথবাবুকে আসিয়া অবস্থা জ্ঞাত করিল এবং বলিল যে "আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনি সাহেবকে বুঝাইয়া বলুন।" দ্বারকানাথবাবু উত্তর করিলেন যে "বুঝাইলে কিছু ফল হইবে না, সাহেবকে যে প্রকারে হউক সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, তাঁহাকে ২০সের দুগ্ধ বুঝাইয়া দিতেই হইবে।" দারোগা বলিল "গরু দুগ্ধ না দিলে তাহা কি প্রকারে হইবে।" দ্বারকানাথ উত্তর করিলেন যে "গরুর বাঁটে দুধ না হয় নিজের পয়সায় বাকী দুধ কিনিয়া সাহেবকে ২০সের দুধ বুঝাইয়া দেও, তথাপি মনিবের আকূত পালন করা আবশ্যক।" তাহাই হইল। তাহার পর দিবস প্লাউডেন সাহেব দ্বারকানাথবাবুকে

অতি হর্ষচিত্তে বলিলেন যে "দেখ দ্বারকানাথ লাঠির বড় গুণ, লাঠির চোটে আমার গরু পূর্ব্ববৎ ২০ সের করিয়া দুগ্ধ দিতেছে।"

দ্বারকানাথবাবুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাঁহার যখন খুব উন্নত অবস্থা, যখন তিনি গবর্ণমেন্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া, কার ঠাকুর কোম্পানির হাউসে এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তখন তাঁহার সহিত সেই প্যাটেল সাহেবের বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল; এমন কি প্যাটেল সাহেব দ্বারকানাথবাবুর অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়িতেন না, কিন্তু মৌখিক সদ্ভাব কি আলাপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই সময় ঢাকা বিভাগের বরদাখাত পরগণা জমিদারীর সদর খাজনা বাকী পড়াতে সেই জমিদারী লাটে উঠিয়াছিল। প্যাটেল সাহেব তখন সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর এবং আমার সর্ব্বাচ্ছাদক পূজ্যপাদ মাতুল ৺রামলোচন ঘোষ সেই বোর্ডের দেওয়ান অর্থাৎ সেরেস্তাদার। বরদাখাত পরগণা লাটে উঠিলে প্যাটেল সাহেব স্থির করিলেন যে, যেহেতু ইহা অতি বৃহৎ এবং বহুমূল্যের সম্পত্তি, অতএব নিজ জেলায় ইহার নিলাম হইলে উপযুক্ত মূল্য উঠিবে না; কলিকাতার বোর্ডের কাছারীতে নিলাম হইলে অনেক ধনাঢ্য ক্রেতা উপস্থিত হইতে পারিবে সুতরাং অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব। বরদাখাতের মালিকেরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল; কারণ তাঁহাদের পুনরায় ঐ জমিদারী ক্রয় করার অভিপ্রায় ছিল, এবং জানিতেন যে নিজ জেলায় নিলাম হইলে অপর ক্রেতাকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া নিরস্ত রাখিতে এবং আপনারা সুলভ মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে পারিবেন। অতএব কলিকাতায় যাহাতে নিলাম না হয়, তাহার চেষ্টার নিমিত্ত সেই জমিদারেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মাতুলের নিজের চেষ্টায় সেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না জানিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে পরামর্শের নিমিত্ত দ্বারকানাথবাবুর নিকট যাইতে বলিলেন। আমার মাতুল জানিতেন যে এই কার্য্য উদ্ধার করিতে যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা দ্বারকনাথবাবুর আছে, অন্য কাহারও নাই। কিন্তু তখন প্যাটেল সাহেবের সহিত দ্বারকানাথবাবুর অত্যন্ত বৈরঙ্গভাব, পাছে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠে, তাহাও মাতুলের মনে সন্দেহ হইল, কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বুদ্ধির কৌশলের উপরে তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে প্যাটেল সাহেবের সহিত উক্ত বাবুর শত্রুতাভাব জানিয়াও তিনি প্রার্থীদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। দ্বারকানাথবাবু যত টাকা চাহিলেন, তাহা জমিদারেরা দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাহাদিগকে সেই টাকা তাঁহার নায়েব রুক্মিণীকান্ত বাবুর নিকট আমানত করিতে বলিয়া দিয়া, পরদিবস প্যাটেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য কথার পরে দ্বারকানাথবাবু বরদাখাত পরগণার নিলামের কথা উত্থাপন করিয়া প্যাটেল সাহেবকে অবগত করিলেন যে "আপনি এই জমিদারীর নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য যে হুকুম দিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিজের উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, জেলায় নিলাম হইলে আমার সুবিধা হইত না, এখানে নিলাম হইলে আমি স্বয়ং আসিয়া ডাকিব, এবং আমি ডাকিলে, বোধ হয় অন্যান্য ক্রেতা আমার প্রতিবন্ধকতা করিবে না।" এই কথাতে চারে মৎস্য লাগিল। একেই দ্বারকানাথ প্যাটেলের চক্ষুশূল, তাহাতে সাহেব উপরন্তু দেখিলেন যে তিনি যে সদভিপ্রায়ে নিলাম কলিকাতায় হওয়ার জন্য স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শত্রু দ্বারকানাথ ঠাকুর নষ্ট করিতে উদ্যত। কারণ প্যাটেল সাহেব জানিতেন যে দ্বারকানাথ মনে করিলে যথার্থই অন্যান্য ক্রেতাকে অনুরোধ করিয়া থামাইয়া রাখিতে পারিবে। অতএব যে কার্য্যে দ্বারকানাথের মঙ্গল হইবে তাহা প্যাটেলের কখনও করিতে দেওয়া হইবে না। তিনি দ্বারকানাথবাবুকে বলিলেন যে "হাঁ আমি এইরূপ হুকুম দিয়াছিলাম বটে কিন্তু বাকী দায় মালিকেরা আমার নিকট দরখাস্ত করাতে, আমার এক্ষণে অন্যমত হইয়াছে।" উপসংহারে তিনি হাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন, যে "না দ্বারকানাথ আমি তোমাকে বরদাখাত জমিদারী কিনিতে দিব না, ইহার নিলাম জেলাতেই হইবে।" এইস্থানে বিবৃত করা আবশ্যক যে সেই দিবস দ্বারকনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে জমিদারেরা যথার্থই প্যাটেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সাহেব তখন তাহা না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ প্যাটেলের নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই তিনি আমার মাতুলকে ডাকিয়া পুনরায় সেই দরখাস্ত পেশ করিয়া জেলাতে নিলাম হওয়ার আদেশ প্রচার করিলেন। প্যাটেল সাহেব মনে মনে খুসি হইলেন, যে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এমন গুরুতর বিষয়ে নৈরাশ করিলেন, দ্বারকনাথবাবু আহ্লাদিত হইলেন যে তিনি তাঁহার বৈরঙ্গকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হইলেন এবং জমিদারেরা তাঁহাকে চেষ্টা সার্থক হইল, দেখিয়া হর্ষচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাতো গেল পূর্ব্বকালের, এমন আমাদের সময়ের কয়েকটা কথা বলিব। কৃষ্ণনগরে একজন আসিষ্টান্ট সাহেব ছিলেন। তাঁহার নাম ব্যক্ত করার আবশ্যক নাই। তাঁহার নিকট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলেক্টর সাহেব বিচারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী ও খাজনার মোকদ্দমা অর্পণ করিতেন। সেই সময়ে খাজনা আদায়ের জন্য পূর্ব্বকালের হপ্তম পঞ্চম কানুন প্রচলিত ছিল, ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। খাজানার এই সকল মোকদ্দমাকে সরাসরি মোকদ্দমা বলিয়া লোকে বলিত। আসিষ্টান্ট সাহেবের নিকট নথী-পাঠ করিতে ও হুকুম লিখিতে ফৌজদারী হইতে

ফৌজদারীর পেস্কার উমাকান্ত বসু ও সরাসরি মোকদ্দমার জন্য কলেক্টরীর মোহরর ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমা শুনানীর সময় উমাকান্ত এবং সরাসরি মোকদ্দমার শুনানীর সময় ব্রজগোপাল আসিষ্টান্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। এখনকার ন্যায় তখন বিলাতের ডাক প্রতি সপ্তাহে আসিত না, পক্ষান্তে আসিত। বিশেষত ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ছিল না, সুতরাং একটা ডাকের দিন মারা গেলে পুনরায় পনের দিবস অপেক্ষা না করিলে বিলাতে পুনরায় চিঠি পাঠানর সুযোগ হইত না। এই নিমিত্ত বিলাতি ডাকের দিবসে সাহেবেরা সকলেই বিলাতে চিঠি-পত্র লিখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন এবং এমনও কখন কখন ঘটিত যে হাকিমেরা সেই দিবস কাছারীর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া কেবল পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐরূপ এক বিলাতি ডাকের দিবস এই আসিষ্টান্ট সাহেব কাছারীতে আসিয়া বিলাতী পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কাছারীর কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য যে আমলা উপস্থিত থাকে, তাহাকে ডাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে চাপরাশিকে হুকুম দিয়া মাথা গুঁজিয়া পত্র লিখিতে মগ্ন হইলেন। সেই তলবমতে কলেক্টরীর মোহরের ব্রজগোপাল এজলাসে আসিয়া খাড়া হইল। সাহেব ঘাড় তুলিয়া তাহাকে দেখিলেন না, কিন্তু ব্রজগোপালের কাগজপত্র নাড়া-চাড়ার শব্দে বুঝিতে পারিলেন, যে আমলা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা বুঝিয়া তিনি সেই ভাবেই "পড়ো" বলিয়া হুকুম করিলেন। ব্রজগোপাল তদনুযায়ী এক খাজনার মোকদ্দমার নথী পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে সাহেবের চিঠি লেখাও চলিতে লাগিল। কিন্তু সাহেবের মন কেবল চিঠি লেখাতেই নিবিষ্ট। আমলা কি ছাইভস্ম পড়িতেছে তাহা তাঁহার কর্ণে কেবলমাত্র স্পর্শ করিতেছে কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের স্নায়ু সকল এমনই স্পন্দহীন যে তদ্দারা ব্রজগোপালের উচ্চারিত শব্দগুলি অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। কাছারী ঘরে টুঁ-শব্দটি নাই, কেবল একদিকে ব্রজগোপালের নথী পাঠের গড়গড়ানী শব্দ আর একদিকে সাহেবের কলমের চড়চড়ানী শব্দ; এই দুই শব্দ বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লিখিত "উজ্জ্বলে মধুরে" মিলনের ন্যায় মিলিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে ব্রজগোপালের নথী পাঠ করা সমাপ্ত হইল, কিন্তু সাহেবের পত্র লেখার বিরাম নাই। আমলা চুপ করিল দেখিয়া সাহেব পুনরায় বলিলেন "পড়ো" আমলা উত্তর করিল যে "খোদাবন্দ তামাম হুয়া।" তাহাতে সাহেব সেইরূপ ঘাড় গুঁজিয়া কলম চালাইতে বলিলেন যে "আচ্ছা লিখো হুকুম, তিন মাস ফাটক, আওর দশ রূপিয়া জরিমানা, না দেয় ত আর ১৫ রোজ ফাটক বা জিঞ্জীর।" ব্রজগোপাল হুকুম শুনিয়া স্তম্ভিত, খাজনার মোকদ্দমায় চোরের শাস্তি; কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, এবং সাহেবকেও

ত্যক্ত করিতে সাহস করিল না, এমতাবস্থায় সে এক হস্তে নথী আর এক হস্তে কলম লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক বাদে সাহেব হুকুম দস্তখত করার মনস্থে নথীটা লইবার নিমিত্ত এক হস্ত প্রসারণ করিবায় আমলা অবকাশ পাইয়া বলিল যে "খোদাবন্দ ইয়ে সরাসরি মোকদ্দমাকা নথী হেয়।" এই কথা শুনিয়া তখন সাহেব ঘাড় তুলিয়া আমলার প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং কোন্ আমলা নথী পড়িতেছিল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন যে "ও তোম্ ব্রজগোপাল হেয়, হাম জান্তা, তোম্ উমাকান্ত, আচ্ছা লিখো, মোকদ্দমা ডিসিমিস।"

হৌষ্টন এবং স্কিনার নামক দুইজন সিবিলিয়ান ছিলেন, ইঁহাদিগকে লোকে "পাগনা" বলিয়া অভিহিত করিত। ইহার মধ্যে হৌষ্টন সাহেব উচ্চবংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি আমাদের এককালের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর জ্ঞাতি অথবা কুটুম্ব হইতেন। সেই নিমিত্ত তিনি নীচবংশোদ্ভব সাহেবদিগকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবকে তিনি "ফিতা ফেরোষকা লড়কা" অর্থাৎ ফিতা বিক্রেতার পুত্র বলিয়া তুচ্ছ করিতেন। হৌষ্টন নিজে যেমন বড় ঘরের লোক, তেমনিই এদেশীয় ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার অধীনে চাকরী খালি হইলে অগ্রে বেগের গাঙ্গুলী তারপরে ফুলের মুখুটি প্রভৃতি কুলীনকে নিযুক্ত করিতেন এবং কায়স্থের মধ্যে বসু, ঘোষ, মিত্র পাইলে অন্য কাহাকেও দিতেন না। বিক্রমপুরের লোকের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সেই স্থানের লোকেরা লেখাপড়ায় বড় মজবুত। আমলাদিগের কাহারও কোন পীড়া হইলে শ্রীফল ছিল তাঁহার নিকট সর্ব্বৌষধ মহৌষধ। ব্যামোহের কথা উপস্থিত হইলেই তিনি 'বেল খাও" "বেল খাও" বলিয়া পরামর্শ দিতেন এবং নিজেও অনেক বেল ধ্বংস করিতেন। হৌষ্টন কৃষ্ণনগরে কলেক্টর হইয়া আসিলেন। গ্রীষ্মকালে কাছারীর বাহিরে বৃক্ষতলায় বসিয়া কাছারী করিতেন এবং সকলকে পাগড়ী ও চাপকান ইত্যাদি পোষাক পরিয়া কাছারী আসিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন যে বাঙ্গালীরা বাড়ীতে কেবল ধুতি চাদর পরিয়া থাকে অতএব সেই পরিচ্ছদে তাহারা কর্ম্ম করিতে কষ্টবোধ করিবে না। কাছারীর আসল কাজ তিনি কিছুই করিতেন না, কিম্বা করিতে পারিতেন না। কেবল আজ এক ঘর হইতে আর এক ঘরে কেরাণীখানা ও কল্য এজলাসের মেজটা উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বদিকে স্থানান্তর করা ইত্যাদি মিথ্যা কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। লর্ড ড্যালহৌসী এই হৌষ্টন সাহেবকে এক বিভাগের কমিশনর করিয়াছিলেন কিন্তু রেবিনিউ বোর্ড হৌষ্টনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ডকে এমন তিরস্কার করিয়াছিলেন যে কোন

সিবিলিয়ানের প্রতি পূর্ব্বে এমন কটুবাক্য কেহ প্রয়োগ করে নাই। লর্ড ড্যালহৌসী বোর্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই যে "It is an unparalleleed presumption on the part of the Board" অর্থাৎ "বোর্ডের ইহা অনির্ব্বাচনীয় গোস্তাকী।"

স্কিনর সাহেব হৌষ্টনের ন্যায় তত অকর্ম্মা ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পেটে পেটে নষ্টামি ছিল। তিনি ঢাকায় থাকনাবস্থায় একদিবস কাছারী আসিয়া লাটসাহেব আসিয়াছেন বলিয়া আমলাদিগকে কাছারী বন্ধ কবিতে বলিলেন। আমলারা অবাক। তাহারা কহিল যে এমন বৃহৎ ব্যাপার পূর্ব্বে কিছুমাত্র সংবাদ নাই, বিশেষ লাটসাহেব আসিলে তোপধ্বনি হইবে, তাহাও হইল না— ইহা কেমন কথা? তাহাতে স্কিনর সাহেব উত্তর কবিলেন, যে "তোম্‌লোক্ পাগল, গবর্ণর লাটসাহেব নেহি, হাম্‌রা লাটসাহেব, হামারা মেম সাহেবকা ভাই।" স্কিনর সাহেব পরে ঢাকায় মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, তখন পুলিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকাতে আমলারা প্রাতঃকালে সাহেবের কুঠীতে যাইয়া থানা সকল হইতে আগত রিপোর্ট পাঠ করিয়া শুনাইত। স্কিনার সাহেবের কুঠীর যে কামরায় এইরূপ রিপোর্ট শুনানি হইত তাহাতে একবার নূতন কলিচূণ ফিরান হইয়াছিল। চুণ ফিরান হইলে পরে যে দিবস পুনরায় সেই ঘরে সাহেবের বৈঠক হইল, সেই দিবস সাহেব রিপোর্ট শুনিবার সময় একজন অতি কৃষ্ণবর্ণ আমলাকে ডাকিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে স্বয়ং দাঁড়াইয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া তুড়ি দিতে দিতে সেই আমলাকে "চলো চলো" বলিয়া দেয়ালে যে পর্য্যন্ত তাহার মুখ না ঠেকিল, সে পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেলেন। দেয়ালের চুণ আমলার মুখে লাগিয়া বিকৃত হইল, দেখিয়া স্কিনর সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে একজন চাপরাশি সঙ্গে দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন, যে পথের লোকও তাহাকে দেখিয়া হাসিবে। শেষে স্কিনর সাহেব কৃষ্ণনগরের জজ হইয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া বিচার করা যেমন তেমন, আমলাদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছিলেন। কাছারীর সম্মুখে বৃক্ষের উপরে কাক কিম্বা অন্য কোন পক্ষী ডাকিতে পারিত না। একদিন কয়েকটা কাক সেই বৃক্ষের উপরে বসিয়া কা কা করিয়াছিল বলিয়া তিনি "নাজির হাম্‌কো খুন কিয়া, নাজির হাম্‌কো খুন কিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাছারী ঘর ফাটাইয়া দিয়াছিলেন এবং অবশেষে নাজিরকে এক ঘন্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ২৫টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। উকীলের বক্তৃতা করিবার সময় জজসাহেব মুখ বিকৃতি করিয়া তাঁহাদিগকে ভেঙ্গাইতেন। তাঁহার সেরেস্তাদার সেকালের বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি খিড়কীদার পাগড়ী ও জামাজোড়া পরিয়া কাছারী আসিতেন। একদিন স্কিনর সাহেব সেরেস্তাদারকে

খাসকামরায় নির্জ্জনে পাইয়া সেরেস্তাদারের কোমর ধরিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত খেমটানাচ নাচিয়াছিলেন। আর একদিন সেরেস্তাদারকে তিনি তাঁহার কুঠীতে কোন কার্য্যের নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেরেস্তাদার হাতার বাহিরে পালিক রাখিয়া পদব্রজে হাতার মধ্য দিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। স্কিনর সাহেব তাহা দেখিয়া শীঘ্র তাঁহার কুঠীর সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রহিলেন। বুড়া সেরেস্তাদারের মাথার উপরে সেই বৃষ্টি যতক্ষণ পড়িয়াছিল ততক্ষণ সাহেব দরজা খুলিলেন না, বৃষ্টি শেষ হইলে চাপরাশি দ্বারা সেরেস্তাদারকে কাছারী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এইরূপ স্কিনর সাহেবের কত কাহিনী আছে, বলিতে হইলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া যায়, অতএব ক্ষান্ত রহিলাম।

এই প্রবন্ধ এখনই আমার সংকল্পের অতিরিক্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে অতএব কেবলমাত্র আব একটি ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিব। কৃষ্ণনগরে স্কোন্স নামক একজন জজ আসিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুবিচারক তেমনই অতি নম্র প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি যথার্থই দেবপ্রকৃতিব লোক ছিলেন এবং যে অল্পকাল কৃষ্ণনগরে জজিয়তি করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। একটি অতি নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মোকদ্দমা এই স্কোন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি একজন জমিদার বাজেয়াপ্ত করার নিমিত্ত আদালতে নালিশ করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যক্রমে তাহা স্কোন্স সাহেবের হস্তে পড়িয়াছিল। যে দিবস উভয় পক্ষের উকীলের সওয়াল জবাব হয়, সেই দিবস ব্রাহ্মণটি প্রথম হইতে গলবস্ত্র হইয়া জজসাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে পড়ে সাহেব ব্যক্ত করেন যে তিনি শেষ কাছারীতে অর্থাৎ টিফিনের পরে এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিবেন। ব্রাহ্মণটি তাহা শুনিয়া কাছারী ঘরেতেই রহিল। টিফিনের সময় দেখিল যে তিনি আহারের পরে একটি গ্লাসে করিয়া শেরী সরাব পান করিলেন এবং ইচ্ছা হইলে আরও পান করিবার নিমিত্ত খানসামা সরাবের বোতলটা মেজের উপরে রাখিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কখনও সুরা বা সরাব দেখে নাই, লাল রঙ্গের জল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইল যে উহা সরাব। টিফিনের পরে কাছাবী পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সাহেব ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন যে এখন তিনি তাঁহারই রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দুই হাত জোর করিয়া বলিল যে "দোহাই সাহেব আজ আমার মোকদ্দমার রায় লিখিবেন না, কল্য কিম্বা অন্য যে দিন ইচ্ছা প্রাতে লিখিবেন।"

সাহেব। কেন, অদ্য নিষ্পত্তি করিলে তোমার কি আপত্তি আছে?

ব্রাহ্মণ। সাহেব বেজার না হয়েন, তবে বলি।

সাহেব। না আমি বেজার হইব না, তুমি নির্ভয়ে বল।

ব্রাহ্মণ। সাহেব তুমি যে এইমাত্র সরাব খাইলা; আরও দেখিতেছি খাইবা, সরাব খাইলে নেশা হইবে; তখন কি লিখিতে কি লিখিবা; হয়ত আমার সত্য মোকদ্দমাটি নষ্ট করিবা। আমি দেখিয়াছি আমাদের গ্রামে একজন ভদ্রলোক মদ খাইয়া তাহার মাতাকে শালী বলিয়া গালি দিয়াছিল; অতএব সাহেব মাপ কর, অদ্য অদ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া আমার মোকদ্দমায় ক্ষান্ত থাক।

সাহেব। ইহা সে প্রকার সরাব নহে, ইহাতে আমার মাতাল হই না, বরং ইহাতে আমাদের মস্তিষ্ক আরও পরিষ্কার হয়—

ব্রাহ্মণ। আমার পরিষ্কারে কাজ নাই সাহেব, যাহা আছে তাহাই ভাল,—আপনি আজ ক্ষান্ত থাকিয়া কাল আমার মোকদ্দমা করিতে আজ্ঞা হউক।

সাহেব। না অদ্যই করিব।

ব্রাহ্মণ। দোহাই সাহেব, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই ভূমিটি ভোগ করিয়া আমি একটি টোল চালাই, তাহা হারাইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আপনার সুখ্যাতি শুনিয়া আমার বড়ই ভরসা হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি পরমেশ্বর আমাতে বৈমুখ হইলেন।

সাহেব। না তোমার কিছু ডর নাই, আমি সুবিচার করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণ। সাহেব নেশা হইলে আপনি তাহা কখনই পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ সাহেবকে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল কারণ ব্রাহ্মণ ত শেরী কিম্বা অদ্য ভাল সরাবের গুণ অবগত ছিল না, সে জানিত যে সকল সরাবই একপ্রকার; সরাব খাইলে হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের ন্যায় মাতাল হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। সাহেব ব্রাহ্মণের অকপটতায় রোষ না করিয়া বরং আমোদিত হইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বারম্বার তাঁহাকে ত্যক্ত করাতে তিনি তাহাকে কাছারীর বাহিরে লইয়া যাইতে নাজিরকে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণ বাহিরে যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সাহেবের নিকট পুনরায় যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাজির তাহা করিতে দিল না। অবশেষে প্রায় দুই ঘন্টা বাদে সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহাকে ডিক্রী দিলেন। ডিক্রীবাক্য শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই হস্ত উঠাইয়া বলিল যে, "সাহেব তোমার জয়জয়কার, তোমার গঙ্গালাভ হউক!" আমিও বলি যে পাঠকগণ যাঁহারা সহিষ্ণুতার সহিত আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাঁহাদেরও জয়জয়কার এবং গঙ্গালাভ হউক।

বেদিয়াজাতি ও বেদিয়াচোরের কথা

য়ুরোপ এবং এদেশ

নানা বিষয়ের নিমিত্ত নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রদেশ ছিল। আদৌ কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্যকর বায়ু। খড়িয়া নদীর নির্ম্মল জল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণনগরের সরভাজা। নবদ্বীপের মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতমণ্ডলী। শান্তিপুরের বস্ত্র। গড়ের ঘি। ফুলিয়ার মুকুটি। রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী। উলার পাগল। হিঙ্গলীর তামাকু। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। সিমনহাটীর খজা। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্য। উলাশীর কা'ন। এইসকল নিমিত্তই নদীয়া জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এইক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ অবস্থান্তর হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া জ্বর; এখন কলিকাতা হইয়াছে স্বাস্থ্যকর। খড়িয়া নদীর জল স্থানে স্থানে শুকাইয়া গিয়াছে। রাজার কেবল নামমাত্র ঠাট আছে। অনেক স্থানের মোদকেরাই এক্ষণে সরভাজা প্রস্তুত করিতে পারে। এদিকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া আসিতেছে, অন্যদিকে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যও প্রায় অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র কেবল শান্তিপুরের কেন, বঙ্গদেশের সমুদয় তাঁতিকুলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। গড়ের ঘৃতে আর পূর্ব্ববৎ সৌরভ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সম্মুখে কৌলীণ্য মর্য্যাদার মস্তক নত হইয়াছে। পিনাল কোডের শাসনে পাল-চৌধুরীদিগের সেকালের প্রাদুর্ভাব নাই। জ্বরে উলা ছারখার হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ফেলিয়া এখন আর কেহ বৈদ্যের নিকট যায় না, এবং থিয়েটার এবং নাটকের সম্মুখে লোকের নিকট আর কানের গীত ভাল লাগে না। একদিকে যেমন কৃষ্ণনগর জেলা সুলোক এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্যদিকে এই জেলায় বদমায়েসের ও চোর ডাকাতেরও অভাব ছিলনা। দারোগার কাহিনীতে কৃষ্ণনগর জেলার গোপজাতীয়

মনুষ্যদিগের সাধারণ চরিত্রের কথা বর্ণনা হইয়াছে। এক্ষণে আর একপ্রকার বদমায়েসের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। এই প্রবন্ধে কৃষ্ণনগর জেলার সিন্ধাল চোরের কথা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি।

সিন্ধাল চোর সর্ব্বত্রই সকল জাতীয় মনুষ্যমধ্যে আছে, কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার কয়েকখানি গ্রামের সমুদায় অধিবাসীরা যেমন এই কার্য্যে রত এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর অনেক দেশে বেদিয়া জাতির বাস আছে। ইহাদের আদি বৃত্তান্ত এমন ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন যে ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা এখনও কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারেন নাই। স্বভাব প্রকৃতিও ইহাদের সকল স্থানে একই প্রকার দৃষ্টি হয়। নানাস্থানে ভ্রমণই ইহাদের সকলের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহারা স্থির হইয়া এক স্থানে থাকে না। অদ্য এখানে কল্য আর এক স্থানে চলিয়া যায়; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে ঘর দুয়ার তৈয়ার করার রীতি নাই। চর্ম্মের কিম্বা অতি সামান্য বস্ত্রের অনুচ্চ শিবিরের মধ্যে ইহারা জীবন যাপন করে। ঐ শিবির সকল এমন হালকা, যে তাহা অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহাদিগকে জিপ্‌সী এবং ইউরোপ খণ্ডের কোন স্থানে জিঙ্গারী, কোনও স্থানে জিমবী প্রভৃতি নামে ইহারা খ্যাত। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান ব্যবসায় এবং সেই নিমিত্ত ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক কঠিন আইন বিধিবদ্ধ আছে। যদিও ইহারা যখন যে দেশে অবস্থিতি করে তখন সেই দেশের ভাষা অবলম্বন করে তথাপি ইহাদের নিজের এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে; উহা কেবল উহারাই বুঝিতে পারে। দেশের অন্য লোকে বুঝিতে পারে না। ইহাদের আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক দেশে এক এক জন রাজা আছে এবং তাহাদের সামাজিক বিষয়ে সেই রাজার মীমাংসাই অলঙ্ঘনীয়। চুরি করার স্বভাবটা ইহাদের এমন মজ্জাগত যে ইংলণ্ডে কোন গ্রামে কিম্বা পল্লীতে নূতন এক দল জিপ্‌সী আসিলে অধিবাসীরা শশব্যস্ত হইয়া পড়ে। লোকের হংস, কুক্কুট, মেষ শাবক ও ছাগ ছাগী এবং বাগিচার ফল প্রভৃতি সর্ব্বদাই এইসকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এবং চুরিবিদ্যায় ইহারা এমন পটু এবং ইহারা এমন বেমালুম চুরি করিতে পারে, যে তাহাদের হস্তে চোরামাল আবিষ্কার করা পুলিশের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। কেবল দ্রব্য কিম্বা পশুপক্ষী অপহরণ করিয়া জিপ্‌সীরা ক্ষান্ত থাকেনা, সুবিধা পাইলে অধিবাসীদিগের শিশু বালক বালিকাও চুরি করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করে। যাঁহারা ইংরাজীতে সব ওয়ালটার স্কট সাহেবের অপূর্ব্ব গাই ম্যানরিং প্রভৃতি নবেল পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই জাতীয় লোকের বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে

না; কারণ ঐ সকল পুস্তকে জিপ্‌সীদিগের প্রচুর বর্ণনা আছে।

চুরি ভিন্ন জিপ্‌সীদিগের আর এক বিদ্যা আছে, তদ্দ্বারা তাহারা সভ্য ইংলণ্ডেও বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহারা বলে যে মনুষ্যের কর (কোষ্ঠী) দেখিয়া তাহারা সেই ব্যক্তির অদৃষ্টেব ফলাফল ব্যক্ত করিতে পারে। সভ্য ইউরোপ খণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে স্বামীশিকার একটি প্রধান রোগ এবং সেই উদ্দেশ্যে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা তাহাবা কবিতে প্রস্তুত না। জিপ্‌সীরাও মহিলাদিগের এই প্রবৃত্তি জানিয়া প্রচাব করে যে তাহারা যুবতীর করস্থিত রেখা দেখিয়া বলিতে পারে যে সেই মহিলার মনোমত স্বামী জুটিবে কিনা এবং সেই নিমিত্ত কুমারীবাও ঝাঁকে ঝাঁকে জিপস্‌ীদিগের নিকট কর (কোষ্ঠী) দেখাইতে যায়। অনেক কৃতবিদ্য মহিলা বলেন যে তাঁহারা জিপ্‌সীদিগের কথায় বিশ্বাস করেন না, কেবল তামাশা দেখিবার জন্য করকোষ্ঠী দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ফল কথা এই যে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শীঘ্র একটি সুন্দর এবং ধনবান স্বামী পাওয়ার কথা জিপ্‌সীব মুখে শুনিলে, সেই মহিলার হৃদয় যে আহ্লাদে পুলকিত না হয়, এমন কখনও বোধ হয় না। পক্ষান্তরে জিপ্‌সীদিগের গণনায় যে কিছু সার নাই এমন কথা বলাও দায়। যাহাবা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে জোসেফাইন নাম্নী মহিলা নেপোলিয়ানকে তাঁহার যুবা বয়সে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার বালিকাবস্থায় এক জিপ্‌সী তাঁহার কর দেখিয়া বলিয়াছিল যে জোসেফাইন এক সময় রাজ্ঞী হইবে কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ফলেও জোসেফাইনের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘাটিয়াছিল। নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে বিবাহ করেন, এবং নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফাইনও রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। কিন্তু জোসেফাইনের গর্ভে পুত্রসন্তান না হওয়াতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার এক রাজকন্যাকে পুনরায় বিবাহ করেন। জিপ্‌সী যখন জোসেফাইনের কর দেখিয়া গণনা করিয়াছিল তখন নেপোলিয়ানের সহিত জোসেফাইনের আলাপ পরিচয়ও ছিল না এবং নেপোলিয়ানের সম্রাট হওয়ারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। বরং সেই সময় ফ্রান্সদেশ যে আর কখনও রাজার শাসনাধীন হইবে না, তাহাই সেই দেশের অধিবাসীদিগের স্থির বিশ্বাস ছিল। ঘটনার এত দীর্ঘকাল পূর্ব্বে একজন জিপ্‌সী কি প্রকারে জোসেফাইনের অভাবনীয় অদৃষ্ট ঠিক ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া ইউরোপ খণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকার বোধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যবোধ করেন না। কিন্তু যাঁহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই তাঁহারা নির্ব্বাক্।

এইরূপ শত সহস্র ঘটনার জিপ্‌সীদিগের কথার উপরে ইউরোপ খণ্ডের মহিলাদিগের বিষম আস্থা হইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়া সম্বন্ধে আমি এই স্থানে আর একটা সত্য উপন্যাস পাঠকগণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত ব্যক্ত করিব। অনেক জিপ্‌সী স্ত্রীলোক ইউরোপের অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় সুন্দরী হইয়া থাকে এবং তাহারই একজন সুলক্ষণা যুবতী দেখিয়া হঙ্গেরি দেশের একজন বড় ঘরের যুবক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই যুবকের পদমর্য্যাদা ধন এবং সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে ইউরোপের যে রাজার ঘরে ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে চাহিলে, রাজারা তাহাকে কন্যা দিতে অসম্মান বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু কেমনই তাহার মস্তিষ্কের ঝোঁক যে কেবল সেই জিপ্‌সী যুবতীর প্রতিই তাঁহার মন ধাবিত হইল। কিন্তু ইহার এক রহস্য এই যে এই যুবক, যাহার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার স্বদেশের লক্ষ লক্ষ নারী আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিত, তাহাকে বিবাহ করিতে সেই জিপ্‌সী কন্যা বা কন্যার পিতামাতা প্রথমে কেহই সম্মত হইলেন না। কিন্তু যুবক তাহাতে হতাশ না হইয়া বহু কষ্টে এবং জিপ্‌সী কন্যার পিতামাতাকে অনেক ধন দিয়া এবং কন্যাকে সুখভোগের লালসা দেখাইয়া, পরিণামে আপন অভীষ্ট-সিদ্ধ করিল। বিবাহ করিয়া যুবক তাহার সখের স্ত্রীকে হীরা মুক্তায় ভূষিত বহুমূল্যের পোষাকে সজ্জিত করিয়া সম্রাটের দরবারে লইয়া যাইয়া পরিচিত করিয়া দিল ও গৃহে যাহাতে যুবতীর মনস্তুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় তাহা করিতে ব্যয়ের ত্রুটি করিল না। এইরূপে প্রায় একবৎসরকাল যুবক যুবতীকে লইয়া অতিবাহিত করিল কিন্তু তাহার পরেই জিপ্‌সীর মনের ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস করিতে আরম্ভ করিল। মফঃস্বলে এক পর্ব্বতের উপরে তাহাদের যে এক গৃহ ছিল সেই গৃহের গবাক্ষ দিয়া সমস্ত দিন কেবল দূরস্থিত শৈলমালার শোভা দৃষ্টি করিত। তাহার স্বামী তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কতরূপ কত চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাহাকে উল্লসিত করিতে পারত না। সর্ব্বদাই ম্লান বদনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিত এবং কেহ তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিত যে কি জন্য তাহার মন এমন করে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অবশেষে একদিবস সে নিরুদ্দেশ হইল। কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিতে পারিল না। তাহার স্বামী স্বয়ং নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল; দূত, চর চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তাহাকে হারাইয়া সেই যুবক একপ্রকার পাগলের ন্যায় হইল। বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্জ্জনে বসিয়া কাল কাটাইত। এই ঘটনার ৩/৪ বৎসর পরে স্বামীর নিকট সংবাদ আসিল যে রুসিয়ার একপ্রান্তে একদল

জিপ্‌সীর সঙ্গে সেই যুবতীকে তাহার কয়েকজন প্রজা দেখিয়া আসিয়াছে। স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল এবং তাহার সঙ্গে পুনরায় তাহার গৃহে যাইতে সাধ্যসাধনা করিল। কিন্তু যুবতী কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল যে এক স্থানে স্থির হইয়া থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। বিবাহের পরে প্রথম কয়েকমাস রাজসভা নৃত্য-গীত নাট্যশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাহার বিলক্ষণ আনন্দভোগ হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার বিরক্তি জন্মিয়া উঠিল। গৃহস্থ লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা তাহার ভাল লাগিল না। গৃহ ও প্রাসাদ—কারাগার ও অঙ্গের অলঙ্কার—শৃঙ্খল বিশেষ বোধ হইত। তখন তাহার জাতীয় স্বাধীনতার নিমিত্ত তাহার প্রাণ কান্দিতে আরম্ভ করিল। সেই মফঃস্বলের অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া যখন সে পর্ব্বত ও জঙ্গল দেখিত, তখন পূর্ব্ববৎ জঙ্গলে যাইয়া ক্রীড়া করিতে ও পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে আর এক শৃঙ্গ ভ্রমণ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইত। ইহা নিবারণ করার জন্য সে বহু চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারিলনা। অবশেষে সেই গ্রামে একদল জিপ্‌সী দেখিয়া মনের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছে; এত ধনদৌলত এবং সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় নাই বরং সে এক্ষণে সুখেই আছে। স্বামী তথাপি তাহাকে অনেক অনুরোধ করিল কিন্তু তাহা সে শুনিল না। স্বামী অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া ও যুবতীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া পিস্তলের গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করিল। জাতীয় ধর্ম্মে এমনই একটু গুরুত্ব আছে যে জিপ্‌সী নারীও অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া তাহা অবলম্বন করে; কেবল পারি না আমরা হতভাগা বাঙ্গালী। জাতীয় ধর্ম্মটা যেন আমাদের চক্ষের বিষ, ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচি।

এই ত গেল ইউরোপ খণ্ডের বেদিয়াদিগের কথা। ভারতবর্ষেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে বয়েদ বলে। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা ভারতবর্ষের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে কয়েকটা করিয়া টাট্টু ঘোড়া থাকে এবং সেইগুলা উহাদের তাঁবু এবং দ্রব্যাদি বহন করে। বালক বালিকারা ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ঘোড়া চলিয়া বেড়ায়। বয়েদদিগেরও স্বতন্ত্র ভাষা আছে, কিন্তু অন্যের সহিত হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বেশ বলবান এবং যুবতীরা দেখিতে কুৎসিতা নহে। প্রকাশ্যে ইহাদের কোনও দল কবিরাজী, কোনও দল ভোজবাজী করিয়া ফিরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অপহরণ করাই ইহাদের মুখ্য ব্যবসা। পথিমধ্যে নিরাশ্রয় একাকী পথিক পাইলে কিম্বা ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিলে, ইহারা অম্লান চিত্তে আক্রমণ করিয়া যতদূর

পারে, লুঠপাট করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ইহাদের যে কি ধর্ম্ম তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেখিতে ইহাদিগকে মুসলমান বোধ হয়, কিন্তু ইহারা মুসলমান নহে! ইহারা অত্যন্ত সুরাপায়ী। হস্তে কিঞ্চিৎ পয়সা হইলেই, প্রথমে শুঁড়িখানায় যাইয়া উপস্থিত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা পথের পার্শ্বস্থ হাঁস মুরগী ও ফল তরকারী অপহরণ করিয়া আহারের যোগাড় করে। কিছু হস্তগত করিতে না পারলে অবশেষে ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে।

কিন্তু হিন্দুস্থানের অন্যান্য প্রদেশের বেদিয়াদিগের অপেক্ষায় বঙ্গদেশীয় বেদিয়ারা অনেক সভ্য হইয়াছে। প্রকৃত বাঙ্গালী বেদিয়াদিগের মধ্যে উহাদের জাতীয় পরিভ্রামক স্বভাব এককালে অন্তর্হিত না হইয়া থাকিলেও বহু পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এইক্ষণে বেদিয়ারা ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রীও প্রকটিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বেদিয়ারা মৃত্তিকায় বাস করে না, জলের উপরে নৌকার মধ্যে বাস করে। নৌকাই ইহাদের ঘরবাড়ী এবং নৌকাতে ইহাদের জন্ম মৃত্যু হয়। নৌকাতে সাংসারিক সকল দ্রব্য থাকে। প্রত্যেক বেদিয়ার এক একখানা পৃথক নৌকা আছে। দরিদ্র হইলেও অন্তত একখানা ডিঙ্গিতে ইহারা বাস করে। বেদিয়া যে পর্য্যন্ত পৃথক নৌকা করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সে বিবাহ করে না এবং কেহ তাহাকে কন্যাও দেয় না। এই বেদিয়ারা স্ত্রী-পুরুষে নৌকা বায়। যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের নদী দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে বেদিয়ার নৌকায় বেদিয়ানী হাল ধরিয়া বসিয়া কিম্বা খাড়া হইয়া আছে, স্বামী তাহার দাঁড় কিম্বা গুণ টানিতেছে। নৌকার ছাপরের উপরে খাঁচার মধ্যে হাঁস মুর্গী কবুতর এবং কোনও নৌকায় পোষা বানর ও বকরী বান্ধা থাকে। ছাপরের ভিতবে বালক বালিকারা খেলা করে এবং নৌকার ছাপর এমন শক্ত করিয়া এবং যত্নের সহিত প্রস্তুত করা, যে তাহা হইতে বালকদের বাহির হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গে প্রতি বৎসর অনেক বালক বালিকা জলে ডুবিয়া মরে, কিন্তু বেদিয়ারা ২৪ঘন্টা জলেরই উপরে বাস করে অথচ তাহাদের মধ্যে ঐরূপ ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। শুখাকালে নদীর ধারে এক এক স্থানে নৌকা লাগাইয়া বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা দুই-তিনজনে দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের মধ্যে গৃহস্থদিগের নিকট সুচ সুতা ছুরি কাঁকই প্রভৃতি মনিহারি দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে যায়। ইহাদের পুরুষেরা সর্প খেলাইয়া কিম্বা ভোজবাজীর তামাশা দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। কোনও কোনও স্থানে বেদিয়ারা অনেক ধনাঢ্য হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি যে বরিশালে একজন বেদিয়ার লক্ষাধিক নগদ টাকা মহাজনী কারবার

আছে এবং জনরব এই যে সে একবার প্রচার করিয়াছিল, যে যদি কোন ব্রাহ্মণ কিম্বা কায়স্থের বালক তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাকে লক্ষটাকা যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বেদিয়াদিগেব যাহার যে ব্যবসা থাকুক, সকলের মধ্যেই চুরি করা কার্য্যটা পাপ বলিয়া পরিগণিত নহে। যখন দেশেতে পুলিশের শাসন শিথিল ছিল তখন অনেক বেদিয়াবা নৌকায় চুরি ও ডাকাতী করিত। এখনও বোধ হয় সুযোগ পাইলে তাহারা ঐ কার্য্য করিতে ছাড়ে না।

বর্ষাকালে যখন দেশের খাল বিলে জল আইসে, তখন এই বেদিয়াদিগের উৎসব ও আনন্দ কার্য্য করিবাব সময় হয় এবং তাহাদের বিবাহ সাদীও এই ঋতুতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোনও বিবাহ উপস্থিত হইলে নানাদিক হইতে এক নির্দ্দিষ্ট বিলের কিম্বা খালের ধাবে সেই সম্প্রদায়ের সকল বেদিয়ার নৌকা আসিয়া একত্রিত হয়। বেদিয়ার মর্য্যাদা এবং উপলক্ষ বিবেচনায় এক এক বিবাহে একশতেরও অধিক নৌকা সমবেত হয় এবং ১০/১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে মৃত্তিকাব উপরে উঠিয়া স্ত্রী-পুরুষে গীতবাদ্য ও নৃত্য করে। এই সময় ইহাদের মধ্যে অনেক সরাব খরচ হয়। সকল নৌকার আগা পাছা নূতন সিন্দুর এবং অন্যান্য রঙ্গ দিয়া সুসজ্জিত করে এবং মাস্তুলের উপবে নানাপ্রকার নিশান উড্ডীয়মান হইতে থাকে। উৎসবের কয়েক দিবস ধরিয়া ইহাদের কাহাবও কোন কার্য্য থাকে না, আবালবৃদ্ধবলিতা সকলেই আমোদে মত্ত হয়। স্ত্রীলোকে নূতন বস্ত্রাভরণ পরিয়া সকলের সম্মুখে নৃত্য করে এবং তাহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক ও তবলা বাজায়। উৎসবারম্ভে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাহার যে স্থানে ইচ্ছা চলিয়া যায়। মৃত্তিকার সহিত এই সকল বেদিয়ার দুই সময় ভিন্ন আর কখনও কোন সংস্রব হয় না। কেবল বিবাহের উৎসবে ও মরিলে গোর দিতে মাটির আবশ্যক হয়, কিন্তু যে স্থানে এই দুই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা তাহারা মূল্য দিয়া ক্রয় করে; কারণ অন্যের মাটিতে তাহা হওয়া রীতি নাই সুতরাং টাকা দিয়া ক্রয় না করিলে মাটি নিজের মাটি বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই দুই উপলক্ষে ভূম্যাধিকারীরা বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করে। ধনবান বেদিয়া হইলে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জমিদারকে দিয়া সন্তুষ্ট করে। বিবাহের উৎসব বা গোর দেওয়া হইয়া গেলে এই ভূমির সহিত বেদিয়ার আর কোন দাবী কিম্বা সম্বন্ধ থাকেনা সুতরাং জমিদারের ইহা একটি বিলক্ষণ রোজগারের পন্থা হয়। বেদিয়াদিগের মধ্যে আর এক রীতি আছে যে তাহারা কখনও মৃত্তিকার উপর শয়ন করে না, যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁশের একটা সামান্য মঞ্চ করিয়া নৌকার ছাপরের ন্যায় এক আবরণের দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, সেই মঞ্চের উপরে শয়ন করে। জালিয়াদিগের

মধ্যে যেমন জালো, মালো কৈবর্ত্ত, তিয়র প্রভৃতি অন্তর্জাতি আছে, সেইরূপ এই নৌ-বেদিয়াদিগের মধ্যেও বেদিয়া, বেবাদিয়া, সান্দার প্রভৃতি জাতি আছে কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সাদী চলে কি না, তাহা আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের নৌ-বেদিয়ার স্ত্রীলোকেরা যেমন নৌকা বায়, এমন প্রথা কেবল চীন রাজ্যে ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে প্রচলিত নাই। চীনদেশেও অনেক বৃহৎ নদী আছে এবং নদীর উপরে ভেলা বান্ধিয়া ও নৌকার উপরে বহুসংখ্যক লোকের বাস। সেই রাজ্যে সাম্পান নামক একপ্রকার নৌকা আছে, তাহা স্ত্রীলোকে বাহিয়া থাকে। যুবতী স্ত্রীলোকে সুসজ্জিত হইয়া সেই সাম্পান নৌকা চালায় এবং সৌখিন চিনানী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য সাম্পান পাইলে, অন্য কোন নৌকা কিম্বা যান ব্যবহার করে না। কিন্তু চীন রাজ্যের সাম্পানের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বেদিয়ার নৌকার এই একটি প্রভেদ আছে, যে সাম্পান উপার্জ্জনের জন্য চালান হয়; তাহাতে চড়ন্দার প্রভৃতি উঠাইয়া চীনদেশের স্ত্রীলোকেরা পয়সা রোজগার করে। পূর্ব্ববঙ্গের বেদিয়ার নৌকা তাহাদের ঘর বাড়ী এবং তাহাতে তাহারা বাস করা ভিন্ন অন্য নৌকার ন্যায় চড়ন্দার কিম্বা মাল বোঝাই করিয়া ব্যবসা করে না। সাম্পান চালক চিনানী পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় বেদিয়া জাতীয় স্ত্রীলোক কি না, তাহা আমি জানি না এবং চীন রাজ্যে বেদিয়া জাতির কোন শাখা আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু যে স্থলে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের সকল বিভাগেই এই জাতির বসতি দেখিতে পাওয়া যায়; সে স্থলে চীন দেশে বেদিয়া জাতি একবারে না থাকা, বড় সম্ভবপর বোধ হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদিয়া জাতির এক বিশেষ স্বভাব এই যে তাহারা পরিভ্রামক কিন্তু কেবল কৃষ্ণনগর ও বারাসত জেলাতে এই ভাবের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। নদীয়া জেলার কাগজপুকুরিয়া থানার এলাকায় বেলিয়া বিষহরি প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামে বেদিয়ার বাস। এই সকল বেদিয়ারা গৃহস্থ এবং হিন্দু মুসলমান প্রজার ন্যায় ইহারা ঘরবাড়ী বানাইয়া তাহাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করিয়া আসিতেছে এবং অনেকে চাষ আবাদও করিয়া থাকে। দেখিতে এবং চালচলনে হিন্দু মুসলমানের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে এই বেদিয়ারা না হিন্দু না মুসলমান। হিন্দুর ঠাকুর দেবতা মানে এবং পক্ষান্তরে মুর্গীও আহার করে। কিন্তু ইহারা গোমাংস ভোজী নহে। অন্যান্য বেদিয়াদিগের ন্যায় ইহাদেরও এক গুপ্ত ভাষা আছে, কিন্তু সাধারণত তাহারা বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করে। জমিদার এবং তালুকদারের ইহারা অত্যন্ত

আজ্ঞাবাহ। যাহাদের ভূমিতে ইহারা বাস করে তাহাদিগকে ইহারা খুব সম্মান করে। কলিকাতা অঞ্চলে যে সকল বেদিয়ানী "বাতের বেম ভাল করি, দাঁতের পোকা বাহির করি" বলিয়া মিষ্ট স্বরে রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া কিম্বা ভানুমতীর বাজী দেখাইয়া বেড়ায়, তাহারা এই সকল স্থায়ী বেদিয়ার দলভুক্ত নহে। কৃষ্ণনগরের বেদিয়ারা যদিও অন্যান্য প্রজার ন্যায় প্রকাশ্যরূপে কারবার করে, তথাপি ইহাদের প্রধান ব্যবসা সিঁধ চুরি। এই কয়েক গ্রামের বেদিয়ারা প্রসিদ্ধ চোর এবং ইহাদের এই স্বভাব রাজপুরুষদিগের নিকটও অবিদিত ছিল না; সেই কারণে পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের হুকুম ছিল যে, যখন কোন বেদিয়ার নিজ গ্রাম হইতে স্থানান্তর গমন করার প্রয়োজন হইবে, তখন সে তাহার নিজ থানায় উপস্থিত হইয়া কি উদ্দেশে কোন্ স্থান যাইবে, তাহা থানার দৈনিক বহিতে লিখাইয়া যাইবে, তাহা হইলে থানার কর্ম্মচারীরা সেই স্থানের পুলিশের নিকট লিখিলে, তাহারা ঐ বেদিয়ার উপরে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। আর এক নিয়ম ছিল যে, বেদিয়ারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় তাহারা নিকটস্থ ফাঁড়ি কিম্বা থানাঘরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিবে এবং থানার রোজনামচা বহিতে বেদিয়ার নাম প্রভৃতি সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ফাঁড়ি কিম্বা থানাঘরে পৌঁছিতে না পারিলে যে গ্রামে বেদিয়ার বাস করিতে হইবে, সেই গ্রামের চৌকীদার এবং মণ্ডলকে তাহার আত্মপরিচয় দিয়া বাস করিবে। আমি যখন কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালীতে ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে দুই একজন বেদিয়া আসিয়া ঐরূপ ব্যক্তির নিকট তাহারা কি প্রকারে চুরি করে তাহার অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বহুদিনের কথা হইল সকল কথা আমার ভাল করিয়া স্মরণ নাই, যাহা কিছু মনে আছে, তাহা এই স্থানে বিবৃত করিব। বেদিয়ার বর্ণনা তাহার কথার ভঙ্গিতে লিখিলাম।

"আমাদের প্রধান ব্যবসাই চুরি, লোকে আমাদের ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা মিথ্যা কথা বলি যে আমরা "ছুরি কাঁচির ব্যবসা করি," কিন্তু ছ-শব্দটি এমন মৃদুভাবে উচ্চারণ করি যে তাহাতে ছুরির স্থলে শ্রোতা চুরিই শুনে। নানাপ্রকার চুরির মধ্যে সিঁধ চুরিই, আমাদের প্রধান অবলম্বনীয় এবং অনায়াসে যাহাতে আমরা সেই কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের পুস্তক লেখা আছে। আমরা বাল্যকাল হইতে সিঁধ কাটিবার বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমাদের বৃদ্ধ লোকে বালকদিগেকে শিশুকাল হইতে এই বিদ্যায় অভ্যস্ত করে। এক নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে আমরা সিঁধ দেখিয়া বলিতে পারি, যে তাহা বেদিয়া না অন্য কোন আতাইয়ের হস্তাক্ষর। আমরা নিজ গ্রামে কিম্বা নিজ থানার এলাকায় কখনই এবং পারিলে নিজ জেলাতেও চুরি করি

না। শীত ঋতুর আগমনে আমরা দলে দলে বঙ্গদেশের নানা দিকে চলিয়া যাই এবং বর্ষার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসি। ইহাতে আমাদের এক এক দলের এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং সেই সেই দলের নিকট সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থার সংবাদ সংগৃহীত থাকে। আমরা গ্রাম হইতে অনেকে একত্র হইয়া নিষ্ক্রান্ত হই না, কারণ তাহা হইলে পুলিশের সন্দেহ হয়। এক আধজন করিয়া ক্রমে ক্রমে গোপনে বাহির হইয়া এক নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকি। আমরা কেবল চুরি-বিদ্যায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হই এমন নহে, কোনও স্থানে ধৃত হইলে পুলিশের যন্ত্রণা পাইয়া একরাব না করি, তজ্জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেও আমরা অভ্যস্ত হইয়া থাকি, এমন কি, আমাদের এক এক জন নির্দ্দয় গুরু লোহা পোড়াইয়া আমাদের শরীর দগ্ধ করিয়া দেখে, যে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি কি না। আমরা সোনা রূপার অলঙ্কার, নগদ টাকা ও মোহব ভিন্য অন্য কোন দ্রব্য চুরি করি না। তামা, পিত্তল, কাঁসার তৈজসপত্র কিম্বা কোনও প্রকার বস্ত্র আমরা স্পর্শ করি না কারণ এই সমস্ত বস্তু গোপন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আমাদের মহাজন আছে; তাহাদিগের নিকট আমরা অপহৃত মাল আনিয়া দাখিল করিলে, তাহারা আমাদিগকে সোনার ভরি ১০টাকা ও রূপার ভরি|৵০আনা হিসাবে দেয়। আমরা যদি কখনও আলস্যবশতঃ বাড়ীতে বসিয়া থাকি, যথাসময় চুরি করিতে বাহির না হই, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে উত্তেজনা করিয়া বাড়ী হইতে চুরি করিতে পাঠাইয়া দেয় এবং বৎসরের মধ্যে আমাদের টাকার প্রয়োজন হইলে ইহারা কোনও প্রতিভূ না লইয়া আমাদের যত টাকার আবশ্যক, তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করে; কারণ আমরা তাহাদের রোজগারে পুত এবং আমরাও মহাজনের সহিত কোন প্রবঞ্চনা কিম্বা চাতুরী করি না।

"সিঁধ কাটা, চুরি করা, ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিক্ষা পাওয়া ভিন্ন অধিকন্তু আমাদের নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে শিখিতে হয়। হিন্দুপ্রধান গ্রামে যাইয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসী, মুসলমানের গ্রামে যাইয়া ফকির মোল্লা মুস্কিল আসান প্রভৃতি সাজিতে হয়। তদ্ভিন্ন অনেক ছদ্মবেশ করিতে আমরা জানি। কখনও আমরা সাপ খেলাই কখনও বানর নাচাই, কখনও দৈবজ্ঞ সাজিয়া লোকের শুভাশুভ গণনা করি। ইহা সকলই আমাদের চুরির উপকরণ স্বরূপে আবশ্যক হয়। আমরা যখন চুরি-যাত্রায় বাহির হই তখন আমাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে দুই-তিনজন করিয়া আমাদের জাতীয় শঠ এবং চতুরা স্ত্রীলোক থাকে তাহারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করে এবং যে প্রকারে তাহা করে, তাহা আমি পরে ব্যক্ত করিতেছি। আমরা যখন গ্রাম হইতে বাহির হই, তখন আমরা বলি যে অমুক জেলায়

আমরা গরু কিম্বা ছাগল কিনিতে যাইতেছি, কিন্তু আমরা যদি পূর্ব্বে যাই তবে দক্ষিণের নাম করি, এইরূপে লোকের নিকট মিথ্যা বলিয়া আমরা বাড়ী হইতে চলিয়া যাই। পথে আহারের নিমিত্ত আমাদের নিজের কিছুমাত্র ব্যয় করিতে হয় না কারণ পথিমধ্যে যে সকল স্থানে অতিথি সেবা আছে তাহা আমরা জ্ঞাত থাকিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই, অভাবে অন্ততঃ ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করি। কার্য্যক্ষেত্রে পৌঁহুছিয়া হাট-বাজারের কোন এক জনশূন্য স্থানে বাসের জন্য স্থান নির্ণয় করি। আমরা জানি যে প্রত্যেক গ্রামে বদমায়েস এবং চোর আছে, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে আমাদের সহযোগী করি না এবং কাহারও নিকট উপযাচক হইয়া গ্রামের কোন সংবাদ অবগত হইতে চেষ্টা করি না।

"আমাদের দুই প্রকার কার্য্য-প্রণালী আছে তাহার এক প্রণালী এই যে আমরা সকল সময়ে সকল গ্রামে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হই না। এক বৎসর আমরা কয়েকখানা গ্রামের কেবল সংবাদ সংগ্রহ করি এবং সেই যাত্রায় সেই স্থানে ১০/১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া অধিবাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেও আমাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না এবং গ্রামে চুরি না হইলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহও করে না! এক বৎসর এইরূপ কেবল সংবাদ আহরণ কবিযা তাহার দুই এক বৎসর পরে সেই স্থানে আমাদের কার্য্য করিতে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। যখন আমরা চুরির মানসে সেই স্থানে পুনরাগমন করি তখন আমরা লোকের সহিত অধিক আলাপ না করিয়া ৫/৭ দিবসের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাই। চুরি করার মনস্থে গ্রামে উপস্থিত হইলে আমাদের বিবেচনায় ছদ্মবেশ ধারণ করা উচিত; তাহা ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে লক্ষিত গৃহের চতুর্দ্দিকে সেই বেশ উপযোগী কার্য্য উপলক্ষ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। যথা আমাদের স্ত্রীলোকেরা বৈষ্ণবী সাজিলে পুরুষেরা দৈবজ্ঞ নচেৎ সাপুড়িয়া হইয়া সেই পল্লীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও অন্যান্য অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে চেষ্টা করে। গ্রামের যে পুষ্করিণী কিম্বা দীঘিতে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা স্নান করে, স্নানের সময় আমাদের ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীরা হাত মুখ ধুইবার কিম্বা অন্য কোন ছুতা করিয়া সেই ঘাটে যাইয়া কোন বৌয়ের কিম্বা ঝিউড়ির অঙ্গে অধিক অলঙ্কার তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখে; পরে সেই বৌয়ের স্নান সমাপ্ত হইলে তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হয় এবং তাহার সহিত এক সময়ে "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বৌ কিম্বা ঝিউড়ি কোন ঘরে যায় তাহা দৃষ্টি করে। আমাদের জানা আছে যে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের একটি স্বভাব এই যে, ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিয়া তাহার কাপড় ছাড়িবার জন্য আপন আপন শয়ন ঘরে প্রবেশ করে। ছদ্মবেশী বৈষ্ণবীরা সেই কক্ষ নির্ণয় করিলে পরে পুরুষেরা অর্থাৎ আমরা সেই ঘরের পিছাড়া অনাবৃত কিনা এবং

গৃহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত কি খোলা, বেষ্টিত হইলে কোন দিকে কয়টা দ্বার ইত্যাদি সমুদয় আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত যত্নের সহিত ঠিক করি। যে ঘরে কচি শিশু, পীড়িত কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তি শয়ন করে, তাহাতে আমরা চুরি করিতে চেষ্টা করি না। যে ঘরে চুরি করিব বলিয়া স্থির করি তাহার পুরুষ লম্পট কি না এবং সে কোন্ সময়ে ঘরে আসিয়া শয়ন করে তাহাও আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক। এইরূপে সকল বিষয়ের সুবিধা দৃষ্টি হইলে যে রাত্রিতে চুরি করিব তাহার পূর্ব্বেই কোন্ স্থানে আসিয়া অপহৃত মাল গোপন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া রাখি। মাঠ কিম্বা জঙ্গলের অগম্য স্থানে যেখানে বিষ্ঠা অথবা শ্মশানের বস্ত্র কিম্বা শয্যাখণ্ড থাকে সেই স্থানেই আমরা এই কার্য্যের নিমিত্ত মনোনীত করি। যে রাত্রিতে চুরি করি তাহার পরদিবসেই আমরা সেই গ্রাম হইতে পলায়ন করি না কারণ তাহা হইলে আমাদের প্রতি অধিবাসীদিগের সন্দেহ হইলে, তাহাবা আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে বরং ঘটনার পরে আমাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে দেখিলে সন্দেহের কারণ হয় না এবং সন্দেহ হইলে তল্লাস করিয়া আমাদের নিকট চোরা মাল না পাইলে, আমাদের আরও শ্লাঘার কারণ হয়। যে রাত্রিতে চুরি করিতে হইবে তাহাতে আমরা পারতপক্ষে কখনও অধিক রাত্রে প্রবেশ করি না। বেদিয়া চোরমাত্রেই সন্ধ্যার পরে কার্য্য আরম্ভ করে। সিঁধ দিবার ঘরের পিছাড়া যদি অনাবৃত হয়, তাহা হইলে আমরা নিকটস্থ কোন এক বৃক্ষের বহুপল্লবিশিষ্ট এক শাখা কাটিয়া আনিয়া সংকল্পিত সিন্ধের ঠিক সম্মুখস্থিত স্থানে এমন করিয়া রোপণ করি কিম্বা লাগাইয়া রাখি, যে তাহার অন্তরালে বসিয়া থাকিলে মনুষ্যের দৃষ্টিতে পরিত হইতে হয় না। এইরূপ শাখা সংস্থাপনের উপকার এই যে, রাত্রিকালে হঠাৎ কেহ তাহা দেখিলে স্বাভাবিক ঝোপড়া বন বলিয়া বিবেচনা করে, অন্য কোন সন্দেহ করে না। ঘরের পিছাড়া অনাবৃত না হইলেও আমরা সুবিধামতে ঐরূপ আবরণ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহা পরিত্যাগ করি না কারণ উহার অন্তরালে বসিয়া খুব নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্য করিতে পারি। শাখার অন্তরালে সংস্থাপিত হইয়া আমরা তৎক্ষণাৎ সিন্ধ ফুটাইতে আরম্ভ করি। ওদিকে বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থেরা স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এদিকে আমরা নির্জ্জনে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সর্ব্বনাশের পন্থায় অগ্রসর হইতে থাকি; পরন্তু যখন বুঝিতে পারি যে, মৃত্তিকার প্রাচীর হইলে কেবল এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাটি কাটিতে কিম্বা ইটের প্রাচীর হইলে কেবল একখানামাত্র ইট খুলিতে বাকি আছে, তখন আমরা ক্ষান্ত হইয়া নিবিষ্ট মনে বাড়ীর বিশেষত ঘরের মধ্যে কে কি করিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করি। ক্রমশঃ গৃহস্থদিগের আহারাদি চুকিয়া যায়, ঘরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ আসিয়া পান তামাক সেবনান্তে অন্য কোন কার্য্য থাকিলে,

তাহা সমাধা করিয়া শয়ন করে। ইতিমধ্যে সমস্ত বাড়ীও নিস্তব্ধ হয়। আমাদের বহিতে লেখা আছে যে, রাত্রের ভাতঘুমই বড় গভীর ঘুম, শীঘ্র ভাঙ্গে না; অতএব তখনই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার উপযুক্ত সময়। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনেক চোরে অনেক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে সুতরাং পারতপক্ষে আমরা তদনুয়ায়ী কার্য্য করিতে অবহেলা করি না। যাই ঘরের লোকের নাসিকা ডাকিতে আরম্ভ করে, অমনি আমরা আর বিলম্ব না করিয়া অবশিষ্ট মাটিটুকু কাটিয়া কিম্বা ইষ্টক কয়েকখানা টানিয়া বাহির করিয়া, সিন্ধটা সমাপ্ত করি। নাসিকার শব্দ নির্ব্বাচন করা বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী উভযের নাসিকার শব্দ শুনিতে পাইলেই সুবিধা নচেৎ এমনও কখন কখন ঘটে যে স্ত্রীটা ভ্রষ্টা, স্বামীর নিদ্রার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহা হইলেই আমাদের মুস্কিল উপস্থিত। কিন্তু এমন ঘটনা অতি বিরল; তথাপি আমাদের কত হিসাব করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহাই আপনাকে বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাব উল্লেখ করিলাম। যদি ঘরের লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিয়া নিদ্রা যায়, তাহ হইলে আমাদের অধিক কষ্ট পাইতে হয় না কিন্তু আলোক নির্ব্বাপিত হইলে আমাদের অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অনেক মূর্খ লোকের বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্রবলে শৃগাল কুকুরের ন্যায় রাত্রিকালে চোরের চক্ষু জ্বলে, নচেৎ কি প্রকারে আমরা অপরিচিত ঘরের মধ্যে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া কোনও জিনিষপত্র ফেলিয়া না দিয়া অনায়াসে নিস্তব্ধে কেবল বহুমূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিতে কৃতকার্য্য হই। কিন্তু এইটি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। আসল কথা, এই যে গ্রীষ্মকালে আমাদের নিকট চকমকি ও গন্ধকের দিয়াসলাই এবং শীতকালে ছোট একটা হাঁড়িতে তুঁষের আগুন থাকে। এই চকমকি এবং দিয়াসলাই আমাদের মহামন্ত্র এবং ইহা দ্বারাই আমরা নিরাপদে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি। সিন্ধ ফুটাইয়া তাহার মধ্যে প্রথমে আমরা প্রথমে মাথা দিয়া প্রবেশ করি না, প্রথমে দুই পা চালাইয়া তদ্দ্বারা সিন্ধের মুখে কোন প্রতিবন্ধক আছে কিনা স্থির করিয়া পরে সমস্ত শরীর চালাইয়া দি এবং ঘরের মধ্যে যাইয়া অন্ধকারে দণ্ডায়মান হইলে উপরিস্থিত কোন দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়া আঘাত পাইবার এবং তাহাতে শব্দ হইবার আশঙ্কা থাকে, অতএব আমরা প্রথমে খাড়া হই না, বসিয়াই থাকি এবং সেই অবস্থায় দিয়াসলাই জ্বালি। সিন্ধেব মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরে চকমকি ঠুকিয়া একখানা কুল কাষ্ঠের কয়লা জ্বালিয়া হস্তে করিয়া তাহা ঘরের ভিতর আনয়ন করি। সিন্ধের বাহিরে থাকিয়াই গৃহস্থদিগের কথার শব্দে বিছানা সিন্ধের কোন্‌দিকে স্থিত তাহা বুঝিতে পারি এবং দিয়াসলাই জ্বালিয়া সেই অনুমানের বলে বিছানার দিকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছায়া করিয়া বাম হস্তে দিয়াসলাই ধরিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এবং দিয়াসলাই খুব প্রজ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে ঘরের সমস্ত দিক নজর

করিয়া কোন্ স্থানে কোন্ বাক্স সিন্দুক কিভাবে আছে, তাহা নির্ণয় করি। বিশেষ অনেকবার এইরূপ কার্য্য করিয়া তাহাতে আমাদের এমন দক্ষতা জন্মে, যে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আমরা সেই গন্ধকের টিপ্‌টিপনী আলোকের দ্বারা ঘরে সমগ্র অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি। পরে দিয়াসলাই সম্পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা তাহা নির্ব্বাণ করিয়া ফেলি, এবং তাহাব পরে আমাদের আর আলোকের আবশ্যক হয় না। অনেক স্ত্রীলোকের শয়নের পূর্ব্বে অঙ্গের গহনা খুলিয়া বিছানার নীচে রাখিবার অভ্যাস আছে এবং দুই এক সময় আমরা তাহা শব্দে বুঝিতেও পারি। সেই নিমিত্ত আমরা বিছানার নীচে অনুসন্ধান না করিয়া ঘর পরিত্যাগ করি না। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের অঙ্গ হইতে আমাদের অলঙ্কার খুলিয়া লইতে হয় কিন্তু তাহা কবিতে যাইয়া আমরা নাসিকা কিম্বা কর্ণের অলঙ্কার কখনও স্পর্শ করি না, কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকা কিম্বা কর্ণ ছুঁইলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গলার, হাতের, কোমরের এবং পায়ের অলঙ্কার আমার খুলিয়া কিম্বা কাটিয়া লইতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কার্য্য, বিশেষ পটুতা না জন্মিলে, সকল চোরে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারে না। শীতকালের রাত্রীতে অঙ্গের গহনা খুলিয়া লইতে হইলে নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে হাত দিবার অগ্রে আগুনের হাঁড়িতে আমাদের দুই হস্তই সেঁকিয়া গরম করিয়া লইতে হয়, কারণ তাহা না হইলে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের শরীরে ঠাণ্ডা হাত লাগিলে, তাহার জাগিবার সম্ভাবনা থাকে। বাক্স সিন্দুক বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গি। মাল হস্তগত করা হইলেই বেদিয়া চোর গৃহ পরিত্যাগ করে না। রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া হাঁড়িতে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা আমরা আহার করি, কারণ তাহা না হইলে সেই রাত্রে আমাদের আর আহার জুটিবার উপায় থাকে না। আমরা আহার করিয়া সেই রসুইঘরে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করি! ইহা আমাদের একটি নিয়ম। আমাদের বিশ্বাস যে এই কার্য্য না করিলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। মাল হস্তগত করিয়া তাহা দিবসের স্থিরীকৃত স্থানে লইয়া যাইয়া গোপন করিয়া রাখি। আমরা এক গ্রামে এক সময়ে কখনও দুই বাড়ীতে চুরি করি না, তবে সহর বাজার ব্যাপক স্থানে তাহা করিয়া থাকি। এইরূপ ৫/৭ গ্রামে কার্য্য করিয়া যদি আমাদের বিবেচনায় পর্য্যাপ্ত টাকার মাল সংগৃহীত হওয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমরা ঝটিতি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করি। বিদেশ হইতে চোরামাল লইয়া সহসা আমরা আমাদের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি না। গ্রামের বাহিরে কোন অপরিষ্কার স্থানে লুকাইয়া রাখি, পরে মহাজনকে তাহা দিবার সময় হইলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সেই লুক্কায়িত দ্রব্য সকল বাহির করিয়া লইয়া আইসে।”

বেদিযার উপরিউক্ত বিবরণ শেষ হইলে পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "ধরা পবিলে তাহারা কি করে?" "কি আর করিব? মার খাই। প্রথমে যাহাদের বাটীতে চুরি কবিতে যাই তাহাবা এক পত্তন খুব মারে, পরে প্রতিবাসীরা আসে এবং ক্রমে গ্রামের সমস্ত লোকে আসিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মারে, গালি দেয়, এবং কেহ বা গাত্রে থুথু এবং প্রস্রাব কবিযা দেয। কোনও কোনও গ্রামে অধিবাসীরা তাহাদেব নিজের প্রহার প্রচুর শাস্তি বিবেচনা করে এবং থানায় চালনা না কবিয়া, অমনি ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু কেহ কেহ পুলিশে না দিযা থাকিতে পারে না এবং তাহা হইলে আমাদের বিপদ। গ্রামবাসীরা চোরকে মাবিলেও তাহাদেব দযামাযা আছে কিন্তু পুলিশের ব্যাটাদের প্রাণে কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই। কি প্রকারে একবার করাইবে কেবল তাহাই তাহাদের চেষ্টা এবং তাহা হইলেই তাহাদের খুব খোসনাম হয়।"

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "সে কখনও একবার কবিয়াছে কি না?" উত্তর "হ্যাঁ এক ব্যাটা দারোগার কুহকে পড়িয়া আমি আমার জন্মেব মধ্যে একবার একরার কবিযাছিলাম। এক চুরি মোকদ্দমায় আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরে। চুরিটা আমিই করিয়াছিলাম এবং মালও অনেক টাকার বাহির করিয়াছিলাম, দারোগার মনে নিশ্চয বোধ হইয়াছিল যে আমিই চুরি করিয়াছি কিন্তু প্রথমে আমি কিছুতেই একরার করিলাম না। দারোগা তাহা দেখিয়া ৬/৭ জন চৌকীদারকে ডাকিয়া একটা গর্ত্ত খুঁড়িতে হুকুম দিয়া বলিল যে এ ব্যাটা ত দেখিতেছি একরার করিবে না, তবে ইহাকে গোর দিয়া প্রাণে মারিব। আমি এই কথা শুনিযা মনে মনে হাসিলাম ভাবিলাম, যে কেবল ভয় দেখাইতেছে। কিন্তু সত্য সত্যই চৌকীদার ব্যাটারা দারোগার কথামতে একটা গভীর খাদ করিয়া আমাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে আরম্ভ করিল। দারোগা কেবল 'ফ্যাল মাটি, ফ্যাল মাটি' বলিয়া হুকুম দেয়, আর চৌকীদারেরা আমার নাকে মুখে ঝুড়ি ঝুড়ি করিয়া, মাটি ফেলিতে থাকে। মাটি যতক্ষণ বুক পর্য্যন্ত ছিল ততক্ষণ আমার মনে কোন ভয় হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিলাম যে মাটি গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং মাটি ফেলা ক্ষান্ত হয় না তখন আমি মনে করিলাম যে ব্যাটারা বুঝি যথার্থই আমাকে জীবন্ত গোর দিয়া মারিবে। কাজেই তখন আমি একরার করিয়া মালগুলি দারোগাকে দেখাইয়া দিলাম এবং তিন বৎসর মেয়াদ খাটিলাম।" আমি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খুব এক পেট আহার দিয়া বিদায় করিলাম। ইহারাই ব্যবসায়ী সিন্ধাল চোর। অন্যান্য অনেক হঠকারী সিন্ধাল চোর আছে বটে কিন্তু তাহারা কোন নিয়মমতে চুরি করে না। মনে যাহা আইসে তাহাই করে এবং তন্নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদাই ধরা পড়ে।

সাহেব চোর

বাঙ্গালীর ন্যায় সাহেবদিগের মধ্যেও চোরের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালীতে এবং সাহেবে যেমন বলবীর্য্যে এবং বুদ্ধি-কৌশলে প্রভূত প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তেমন বাঙ্গালী এবং সাহেব চোরেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই অতি হীনজাতীর লোকে দস্যুবৃত্তি করে, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে তাহা নহে। বাঙ্গালী চোর কদাচিৎ লেখাপড়া জানে। আমি দীর্ঘকাল পুলিশ আমলা ছিলাম এবং বহু চোর ডাকাত আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক আমার এমন একজনও স্মরণ হয় না, যাহাকে নাম দস্তখত করিতে পারিতে কিম্বা অন্যরূপ লেখাপড়া জানিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সাহেব চোর সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। আমি অবশ্যই বিলাত যাই নাই এবং সাহেবদিগের সহিত আমার এমন গতিবিধি কিম্বা সংসর্গ করা হয় নাই যদ্দারা সাহেবদিগের সকল বিষয়ে তাহাদের সাধারণ স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আমি অভিমত প্রকাশ করিতে পারি, কিম্বা আমার অভিমত বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কেবল আমি বলিয়া নহে আমার ন্যায় অনেক বঙ্গবাসীরই সাহেবদিগের ভিতরের কথা জানিবার একমাত্র উপায় তাহাদিগের নিজের লিখিত পুস্তক সকল। যে এক মুষ্টিভরা বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইয়া সেই স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই প্রামাণ্য বটে— কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে বিলাত ফেরত বাবুরা অতি যুবা বয়সে কেবল বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। স্বীয় কার্য্যসাধনের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত দৃশ্য দেখিতে কিম্বা অধিবাসীদিগের সহিত সংসর্গ করিতে অতি অল্প সময় ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। পরীক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিলাত গিয়াছেন, যাহাতে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহাতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি লিপ্ত ছিলেন এবং পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের ইংলণ্ডে বাসাবস্থায় তাঁহারা কেবল বিদ্যার্থী

এবং পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। সজ্জন এবং সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য রকমের ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার আবশ্যক কিম্বা সাবকাশ হইত না। অতএব ইহাঁদের মনে ইংলণ্ডের কেবল ভাল ভিন্ন মন্দ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদিগের ন্যায় এবং সেই সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষকের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের সকল নরনারীই ধার্ম্মিক, নির্দ্দোষ এবং পবিত্র। সুতরাং আমাদের বিলাত যাত্রীদিগের মুখে শুনিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ড নহে, সমুদায় ইউরোপ খণ্ডই পৃথিবীর স্বর্গীয় ভাগ বোধ হইবে। ফলকথা তাহা নহে; দর্পণের যেমন একদিক উজ্জ্বল এবং আর একদিক মলিন থাকে, ইউরোপীয় সমাজেরও সেইরূপ দুই দিক আছে; কিন্তু সেই বিভিন্নতা আমাদের স্বদেশের অবস্থা দৃষ্টে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ বলিয়া একটা কথা আছে বটে কিন্তু সেই প্রভেদ অনুযায়ী সাহেবদিগের ভাল মন্দের বিবেচনা করা অসাধ্য। ইউরোপ খণ্ডের ভাল মানুষেরা খুবই ভাল এবং মন্দ লোক এমনই মন্দ, যে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আকৃতি প্রকৃতি, ধন, বিদ্যা বুদ্ধি—প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই বিভিন্নতার সীমা নাই। শুনিলে আমাদের স্তম্ভিত হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিযাছি যে সাহেবদিগের কথা জানিবার জন্য, তাঁহাদের পুস্তকই আমাদের প্রধান উপায়। তদ্ভিন্ন কলিকাতা নগরের রাস্তাঘাটে যে অল্পবিস্তর ইউরোপবাসীদিগকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি, যে ইতর সাহেব এক ভয়ানক জীব। তথাপি ইহারা ইউরোপের ইতর লোকের যথার্থ আদর্শ নহে। ইহাদের অপেক্ষা যে আরও কত পরিমাণে অপকৃষ্ট মনুষ্য আছে, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাই বলিতেছি যে বাঙ্গালী চোরের সহিত সাহেব চোরের তুলনা হইতে পারে না। আদৌ শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীরই বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর সাহেবেরা যে আমাদিগের অপেক্ষা শত শত পরিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা আর এক্ষণে বাঙ্গালীদিগকে চক্ষে আঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। সকলে যাহা জানে তাহার পুনরুল্লেখ করা কেবল সময় নষ্ট করা ভিন্ন নহে; তথাপি পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমি এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিব।

সাহেবদিগকে প্রথম আমলে যখন তাঁহাদের লৌহ কিম্বা কলের জাহাজ সৃষ্টি হয় নাই, কেবল কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মিত এবং বাতাসের দ্বারা চালিত হইত, তখন একখানা মানোয়ার অর্থাৎ যুদ্ধের জাহাজ বঙ্গসাগর হইতে কলিকাতায় আসিতে জোয়ারের প্রতীক্ষা

করিয়া সাগর দ্বীপের ধারে নোঙ্গর করিয়াছিল। জাহাজখানা বহু দিন ধরিয়া জলে জলে ভ্রমণ করিবার পরে ভূমির নিকট উপস্থিত হওয়াতে মনোয়ারের কয়েকজন নাবিক সুন্দরভাবে মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তাহার মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ করার নিমিত্ত কর্ত্তাসাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাদিগকে দুই ঘন্টার বিদায় দিলেন। তদনুযায়ী ৭/৮ জন নাবিক একখানা ডিঙ্গি করিয়া দ্বীপের কূলে আসিল এবং সেই স্থানে এক বৃক্ষের সহিত নৌকাখানা বন্ধন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখন অপেক্ষা তখন জঙ্গল অত্যন্ত গভীর ছিল। আবাদের জন্য মনুষ্যে হস্তক্ষেপণ করে নাই সুতরাং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু যে তাহাতে অধিক সংখ্যায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। লোকেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করার পরে হঠাৎ ব্যাঘ্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। জন্মে তাহারা ব্যাঘ্র কিম্বা ব্যাঘ্রের চিত্র দেখে নাই, অতএব ইহা যে ব্যাঘ্র তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। জন্তুটা অতি সুন্দর দেখিয়া তাহা ধরিয়া জাহাজে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিল। লোকেরা নগ্ন-হস্তে জাহাজ হইতে আসিয়াছিল কোনও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আইসে নাই। জন্তুটা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল দেখিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে কেবল মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা ব্যাঘ্রকে মারিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র তাহাদের সকলকে তাহার দন্ত ও নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিল, কিন্তু বীরপুরুষেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কি প্রকারে জন্তুটা হস্তগত করিবে কেবল তাহার দিকেই তাহাদের লক্ষ্য। এইরূপে বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রামের পরে নাবিকেরা কেবল শরীরের বলে এবং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই সুন্দরবনের হুমা বাঘটাকে মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা বধ করিয়া ক'জনে তাহা কষ্টে তুলিয়া উল্লাসের সহিত হু-র-রা হু-র-রা দিতে দিতে জলের ধারে লইয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তা কাপ্তান সাহেব উহাদিগের সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন, যে নাবিকেরা এক ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আনিতেছে। তাহারা জাহাজে আরোহণ করিলে পর দেখিলেন যে সকলের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। কাপ্তেনকে সেলাম করিয়া তাহারা তাঁহাকে এই জন্তুটা উপঢৌকন দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে জন্তু তাহারা মারিয়া আনিয়াছে, তাহার নাম তাহারা জানে কি না? নাবিকেরা "না" বলিয়া উত্তর করাতে তিনি বলিলেন যে ইহাই ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র। এই নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তাহাদের সাহস অন্তর্হিত হইয়া ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। পরে কাপ্তেন সাহেব ইহাদিগকে দুই তিন মাসের চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলুন দেখি, ইহা কি মনুষ্যের না অসুরের কার্য্য! মনুষ্যের হইলে

বাঙ্গালী মনুষ্যের দ্বারা এই কার্য্য কখনও সম্ভব হয় না। যে বীর জাতি প্রথমে পলাশী, তৎপরে আসাই, তাহাব পরে মহাবাজপুব পণিয়ার, তৎপরে মুদকী, সোব্রায়ান ও গুজরাট যুদ্ধ-জয় করিয়া এবং অবশেষে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্য দমন করিয়া এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ের মধ্যে করতলস্থ করিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কার্য্য, অন্যের দ্বাবা সম্পাদিত হইতে পারে না। এক একটা কীর্ত্তি শুনিলে মনুষ্য-জীবন ধন্য বলিয়া মনে উল্লাসের উদ্ভব হয়।

ভাল কথার কি আকর্ষণ দেখুন, কোন্ কথার প্রসঙ্গে আমি কি কথা বলিতে এত সময় ক্ষয় কবিলাম। চোরেব কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সাহেবদিগের বলবীর্য্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক এইক্ষণে সাহেব চোর যে কত নির্দ্দয় এবং প্রাণ নষ্ট করিবার যে স্থলে কোনও আবশ্যক নাই,সে স্থলে তাহারা যে ঐরূপ কুকার্য্য কবিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইব। রুসিয়া দেশের এক গ্রামে এক গৃহে একটি পুরুষ ও তাহাব স্ত্রী ও তাহাদের একটি যুবতী কন্যা বাস করিত। এক রুসিয়াব দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশের নিম্নশ্রেণীর চরিত্র বুঝা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের সকলের স্বভাবই এক ছাঁদে গঠিত বলিলে বলা যাইতে পারে। ঐ গৃহস্থ নিতান্ত দবিদ্র ছিল না, পরিশ্রম করিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিত তদ্দ্বারা তাহাদেব সকলের সচ্ছন্দে দিনপাত হইত। গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরে সপ্তাহের মধ্যে একদিন এক স্থানে এক হাট হইত এবং সপ্তাহেব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার নিমিত্ত সেই গ্রামের অধিবাসীরা সেই হাটে যাইত। ইহারই এক হাটের দিন ঐ গৃহস্থের স্ত্রীপুরুষ দুইজনে তাহাদের কন্যাকে গৃহে রাখিয়া হাট করিতে গিয়াছিল। পিতামাতা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে কন্যা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া গৃহস্থালী এক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। এই স্থানে বিবৃত করা আবশ্যক, যে গ্রামের অদিবাসীদিগের গৃহ সকল সহর কিম্বা নগরের গৃহের ন্যায় এক স্থানে সংলগ্ন ছিল না। গৃহ সমস্ত পরস্পর ব্যবধানে ছিল। কিন্তু এই গৃহস্থের গৃহখানা অন্যান্য গৃহ হইতে অধিক দূরে সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং ইহাতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা প্রতিবেশী সহজে দেখিতে কিম্বা জানিতে পারিত না। দ্বার বন্ধ করিবার কিছুকাল পরে কন্যা শুনিতে পাইল, যেন কে তাহাকে ডাকিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। দ্বার মোচন করিবামাত্র একজন অপরিচিত কদাকার এবং মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রধারী মনুষ্য কন্যাকে ঠেলিয়া বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কন্যার হস্ত হইতে দ্বারের চাবি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় দ্বারের তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা আপনার পকেটের মধ্যে রাখিল এবং পোষাকের ভিতর হইতে একখানা লম্বা চক্‌চকে ছুরি বাহির

করিয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিল, যে কন্যা তাহার কথার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে কিম্বা চিৎকার করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গে ছুরি বসাইয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপার দেখিয়া কন্যা যে ভয়ে স্তম্ভিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সে নির্ব্বাক হইয়া এক স্থানে খাড়া হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চোর ব্যাটা যাহা কিছু তাহাকে করিতে বলে, তাহাই সে কলের পুত্তলিকার ন্যায় করিতে লাগিল। প্রথমে গৃহের মধ্যে যে সকল আহার্য্য বস্তু ছিল তাহা ঐ ব্যক্তি উদরস্থ্ করিল, পরে বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইল, তাহা হস্তগত করিলে কন্যা বিবেচনা করিল, যে এখন সে চলিয়া যাইবে এবং তাহার নিস্তার হইবে, কিন্তু কন্যার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। দ্রব্য সকল হস্তগত করিয়া চোর কন্যার নিকট আসিয়া কহিল, যে কন্যাকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা জীবিত রাখিয়া গেলে, গৃহস্বামী প্রত্যাগমন করিলে, সে তাহাকে সকলকথা বলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে পুলিশের অনুসন্ধান দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিবে। এই স্থানে বলা আবশ্যক, যে রুসিয়ার পুলিশ বড় পরাক্রান্ত এবং চোর ধরিতে বড় মজবুত। তাহার উপরে চোরের শাস্তি অতি ভয়ানক। ফাটক এবং নির্ব্বাসন ত আছেই, তদতিরিক্ত নাউট নামক এক ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে। আমাদের বেত্রাঘাতের স্থলে রুসিয়ার নাউট। উহা নাকি চর্ম্মের এবং শোণ পাটের রজ্জু দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং উহার আঘাত এমনই বেদনাদায়ক যে রুসের ন্যায় বলবান মনুষ্যও ইহার কয়েক আঘাতে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। দস্যু বলিল যে 'তোমাকে জীবিত রাখিয়া গেলে আমার নিশ্চয়ই নাউট খাইতে হইবে, অতএব তোমাকে মারিয়া যাইব; তবে তুমি অতি নম্রভাবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছ, সেইজন্য তোমার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে, তোমাকে অধিক কষ্ট দিব না। তুমি বল যে তুমি কোন্ প্রকারে মরিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই প্রকারে মারিব। তুমি শীঘ্র বল, বিলম্ব হইতেছে।" যুবতী ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু সে পাপাত্মার কিছুতেই দয়া হইল না। অবশেষে যে বলিল যে, "বুঝিয়াছি যে তুমি ছুরির আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না তোমাকে ফাঁসি দিয়া মারিব, তাহা হইলেই তোমার কম যন্ত্রণা হইবে।" এই বলিয়া যে একগাছা শোণের দড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক আগায় একটা ফাঁস করিয়া অপর আগা সেই ছুরির মধ্যস্থানে শক্ত করিয়া বান্ধিল। পরন্তু বসিবার একটা কাষ্ঠের টুল ঘরের মধ্যস্থলে আনিয়া মুদ্গারের ন্যায় আর একটা কাষ্ঠ লইয়া সেই টুলের উপরে দণ্ডায়মান হইল এবং সেই অবস্থায় মাথার উপরে দুই হস্ত প্রসারণ করত মুদগরের দ্বারা আঘাত করিয়া ছাদের একটা কড়িকাষ্ঠের মধ্যে খুব জোরে সেই ছুরিখানা বসাইয়া দিল। ছুরির অর্দ্ধভাগের অধিক

কড়িকাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিল পরে তাহা শক্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং তাহাতে এ কন্যার শরীরে ভার অনায়াসে ঝুলিতে পারিবে কিনা, তাহার পরীক্ষা করার নিমিত্ত সে দড়ির ফাঁসটা তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে গলাইয়া দিয়া সজোরে তাহা টানিয়া দেখিতে লাগিল। মনে করিয়াছিল, যে দড়িটা পরীক্ষায় টিকিলে সে ঐ মেয়েটিকে টুলের উপরে উঠাইয়া তাহার গলায় ফাঁসী দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠিল। পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার পদতলের টুলটা সরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল · সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও অবলম্বন অভাবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে ভূমিতে পড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটা দড়ির ফাঁসের মধ্যে থাকাতে, হস্তখানার ফাঁসী লাগিয়া, তাহার শরীর ঝুলিতে এবং নূতন দড়ির শক্ত পাক নিবন্দন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়িতে অথবা পায়ের দ্বারা টুলটা টানিয়া পুনরায় পদতলে আনিতে সে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার হিতে বিপরীত হইল। কারণ, সে যত অধিক বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল, ততই দৃঢ়রূপে তাহার হস্তের ফাঁস চর্ম্মের মধ্যে বসিতে লাগিল এবং কতক্ষণ পরে তাহার পঞ্চ অঙ্গুলির মাথাতে রক্ত জমাতে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে সে তাহার আপন চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া যুবতীকে প্রথমে রূঢ় বাক্যে টুলখানা টানিয়া দিতে কহিল, ক্রমে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিল এবং অন্তে কাকুতি মিনতিও করিল কিন্তু কিছুই হইল না। কারণ মেয়েটি তখনও স্পন্দহীন। তাহাকে বধ করিবে শুনিয়া তাহার প্রথম হইতেই জ্ঞান লোপ হইয়াছিল এবং এমনই তাহার হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে যদিও এই দুরাত্মার সমস্ত কার্য্য তাহার চক্ষের উপরে নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তথাপি সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই! ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চোর ব্যাটার কাকুতি মিনতি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য করিবার কিম্বা কথা কহিবার শক্তি,কিছুমাত্র ছিল না। বোধ হয়, ইহা যুবতী প্রাণরক্ষার একটি মহদুপায় স্বরূপ হইয়াছিল কারণ যুবতীর কার্য্য করার শক্তি থাকিলে সে নির্ব্বোধতা বশত কিম্বা ভয়ে, দুরাত্মার কথামতে তাহার পায়ের নিকট টুল আনিয়া দিত, আর চোর মুক্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ছাড়িত না। সে যাহা হউক এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে পরে গৃহস্থেরা প্রত্যাগমন করিল এবং কন্যার কোন উত্তর না পাইয়া কবাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনের সে অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। পুলিশ কর্ম্মচারীরা দুর্ব্বৃত্তকে একজন পুরাতন বদমায়েস বলিয়া জানিতে পারিয়া দণ্ডের নিমিত্ত রাজদ্বারে অর্পণ করিল।

ইহা ত হইল ইউরোপের ঘটনা কিন্তু অদ্য ৩৫/৩৬ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলিকাতা নগরে যে এক ঘটনা হইয়াছিল তাহাও কম লোমহর্ষক কাণ্ড নহে। ইহা সকলেই জানেন যে কলে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সাহেবদিগের বিলাস-ভোগের নিমিত্ত আমেরিকা খণ্ডের ক্যানেডা প্রদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় স্বাভাবিক বরফ আসিত এবং বার মাস সেই বরফ রক্ষা করিয়া রাখিবার জন্য এইক্ষণে যেস্থানে ছোট আদালতের নিমিত্ত নূতন প্রাসাদ হইয়াছে তাহার ঠিক পশ্চিম ধারে বরফ গুদাম নামে এক গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে বরফগুদামের দুই একজন কর্ত্তা সাহেবও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় একবার বরফগুদামে অনেক টাকা জমা হইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, সেই টাকা ব্যাঙ্কে চালান করিতে কয়েক দিবস শৈথিল্য করা হয়। কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, কেবল একজন সাহেবের অসুস্থতা। সেই সাহেবটি বরফগুদামে বাস করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার পীড়া হয়, এবং পীড়িতাবস্থায় সেইখানেই ছিলেন। পীড়া শীঘ্র আরাম না হওয়াতে একদিবস টাকাগুলি হঠাৎ ব্যাঙ্কে চালান করা হইল, তাহার পরদিবস প্রাতে সেই পীড়িত সাহেবের খানসামা সাহেবের কামরায় যাইয়া দেখে যে সাহেবকে কে খুন করিয়া গিয়াছে দেহটা পালঙ্গ হইতে নামাইয়া ঘরের কোণে চিত করিয়া রাখিয়াছে; পালঙ্গের বিছানায় এবং ঘরের স্থানে স্থানে রক্তে আচ্ছাদিত। এই সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র, সাহেব মহলে খুব একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং দোষী ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইল। তখন লো সাহেব কলিকাতায় পুলিশের সুপারিনটেণ্ডন্ট। প্রথম দিবস মৃত সাহেবের খানসামা খিদ্‌মদ্‌গার প্রভৃতি দেশীয় লোকের উপরে সন্দেহ হয় কিন্তু সকল অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখার পরে, এই কার্য্য যে কোন দেশীয় লোক দ্বারা হয় নাই সাহেবের দ্বারা হইয়াছে, তাহাই স্থির হইল। কারণ মৃত শরীরের এবং কক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই প্রতীয়মান হইল যে বিনা যুদ্ধে হত্যাকারী ব্যক্তি হতার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে নাই বরং বিলক্ষণ প্রমাণ দৃষ্ট হইল যে, মৃত সাহেবটি আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ সংগ্রাম সাহেবের সহিত বাঙ্গালীর সম্ভব পায় না অতএব পুলিশ কর্ম্মচারীরা দেশী ভৃত্যদিগের উপরে শোভা সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন সাহেব কর্ত্তৃক এই খুন হইল তাহার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেবকে কি কারণে বধ করা হইল, তাহারও কোন দ্রষ্টব্য কারণ বুঝিতে পারিল না; কারণ খুনের সঙ্গে বরফগুদামে কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই এবং সাহেবটিও বিলাত হইতে নবাগত, এবং তাঁহার সহিত কাহারও কোন

বিবাদ বিসম্বাদ ছিল বলিয়া কেহ জানে না; অতএব বিনা কারণে হঠাৎ এরূপ খুনী হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কলিকাতার সাহেবমণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল। প্রত্যেক সাহেবের মনে ভয় হইল যে এই নরঘাতক ধৃত না হইলে প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় আর একজনের প্রতিও ঐরূপ ব্যবহার করিবে। তখন বড়লাট সাহেবেরা বৎসরের অধিক ভাগই কলিকাতায় কাটাইতেন, সিমলা সবাটু কিম্বা দারজিলিঙ্গের নাম কেহ জানিত না, জানিলেও ঐ সকলে যাওয়ার আবশ্যকতা বিলাসভোগী সাহেবদিগের মনে উদ্ভূত হয় নাই। আমার ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু বোধ হয় মহাপরাক্রান্ত লর্ড ডেলহৌসীই সেই সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন। বাঙ্গালার লেফটেনন্ট গবর্ণরের পদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বড়লাট বাঙ্গালারও ছোটলাট হইতেন এবং যদিও তাঁহার অধীনে বাঙ্গালার জন্য ডেপুটি গবর্ণর খ্যাতিতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিল তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার মূল শাসনভার বড়লাটের উপরেই ন্যস্ত ছিল। গবর্ণর জেনেরেল এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া মৃত সাহেবের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কঠিন হুকুম প্রচার করিলেন যে কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারীরা হত্যাকারী ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া দণ্ডনীয় করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাদের সকলকে তিনি কর্ম্মচ্যুত করিবেন। কলিকাতার সাহেবমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয়ে সম্বন্ধে যারপরনাই সহানুভূতি উদ্ধৃত হইল এবং সাহেবেরা সকলে পুলিশের সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে এই সময় লো সাহেব কলিকাতার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি ইত্যগ্রে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনও বোধ হয় কলিকাতায় নূতন পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, পুরাতন চৌকীদারী পুলিশ ছিল এবং নূতন পুলিশ হইয়া থাকিলেও তাহা অতি অল্পদিনের সৃষ্টি এবং বর্ত্তমানের ন্যায় তখন পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক রকমের সুশিক্ষিত অধিক সংখ্যার কর্ম্মচারী ছিল না সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের দণ্ডের গুরুতর ভার একমাত্র লো সাহেবের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল। লো সাহেব বিবেচনা করিলেন যে বরফগুদামের সাহেবকে বধ করার কার্য্যে কোন ভদ্র সাহেবের যোগ থাকিলেও তাহার সহিত অবশ্যই দুই একজন ইতর গোরা লিপ্ত ছিল এবং বধের কার্য্যটা সেই ইতর গোরা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিতে পারিলেই সমুদায় কথা প্রচারিত হইবে। তজ্জন্য যিনি লালবাজার, কসাইটোলা, চান্দনী প্রভৃতি যে সকল স্থানে জাহাজী এবং ইতর গোরাদিগের থাকিবার নিমিত্ত হোটেল এবং বাসা-বাড়ী সকল সংস্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান

করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে গবর্ণমেন্ট এবং বরফগুদামের কর্ত্তৃপক্ষরা যে ব্যক্তি এই বিষয়ের যথার্থ সংবাদ দিতে পারিবে তাহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্র লটকাইয়া দিলেন। এইরূপ কয়েকদিন চেষ্টার পরে লো সাহেব একজন হোটেলওয়ালার নিকট কথায় কথায় শুনিতে পাইলেন যে হত্যাকাণ্ডের দুই-একদিবস পূর্ব্বে সে দুইজন গোরাকে তাহার হোটেলের এক নির্জ্জন কোণে বসিয়া অনেক গোপন পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিল। কি কি বিষয়ে তাহারা পরামর্শ করিতেছিল, তাহা সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই এবং জানেও না। উহার দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার হোটেলে বাস করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্থানের অধিবাসী। তাহাব হোটেলে যে ব্যক্তি বাস করিত, সে সেই দিবস ধরিয়া আমেরিকা যাত্রী এক জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম লইয়া সেই জাহাজে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সংবাদ অর্থাৎ সে কোন হোটেলে থাকে কিম্বা কি কার্য্য করে তাহা সে অবগত নহে। লো সাহেব এই সংবাদ পাইয়া অনেক সুসন্ধানের পরে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করেন এবং হোটেলওয়ালাও তাহাকে চিনিল। প্রথমে সে ইহার কিছুই জানে না বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু সাহেব বোধ হয় অগ্রে তাহাকে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা দিয়া পরে অনেক প্রলোভন দেখানোতে সে স্বীকার করিল যে ঘটনার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে বরফ ক্রয় করিতে যাইয়া বরুফগুদামের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া তাহাতে কয়েকটা লোহার সিন্দুক দেখিয়া তাহার মধ্যে তাহার অনেক টাকা থাকার বিষয় সন্দেহ হইয়াছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই, যে কলিকাতার সকল স্থানেই কি ইতর কি ভদ্র সকল প্রকার সাহেবের অবারিত দ্বার। প্রহরীরা অপরিচিত সাহেব দেখিলে কিছু বলে না সুতরাং তাহারা যেখানে ইচ্ছা পদার্পণ করিতে পারে। এই সাহেব তাহার পরদিবস পুনরায় বরফগুদামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া কত টাকা মজুদ আছে এবং কে কোন্ স্থানে শয়ন করে ইত্যাদি তাহার আবশ্যকীয় সমুদায় তথ্য অবগত হইল এবং টাকা অপহরণ করার মানসে ষড়যন্ত্র করিয়া একজন সঙ্গীর চেষ্টায় বাহির হইল। অবশেষ এস বেরী নামক এক আমেরিকান যুবক নাবিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বেরী তাহার সহকারী হইতে সম্মত হইল। ইহাদের এক পরামর্শের সময় লো সাহেবের সংবাদদাতা হোটেলওয়ালা তাহাদিগকে দেখিয়াছিল। পরদিবস প্রাতে পুনরায় সেই চোর বরফগুদামে যাইয়া টাকা পূর্ব্ববৎ সেই স্থানে থাকিতে দেখিয়া আইসে। সন্ধ্যার সময় বেরীর সহিত একত্র হইয়া দুইজনে অধিক রাত্রে জানালা দিয়া বরফগুদামের ভিতর প্রবেশ করে। প্রধান ব্যক্তির নিকট তালা কুলুপ খুলিবার ইস্পাতের শলাকা ও দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিবার করাত ও রেতী ও দুইজনের কোমরে নাবিকের ছুরি ভিন্ন আর কোন অস্ত্রশস্ত্র

ছিল না। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহারা যাহা দেখিল তাহাতে তাহার অত্যন্ত নৈরাশ হইল। কারণ দেখিল যে প্রাতে যে যে স্থানে সিন্দুক ছিল সেখানে তাহা নাই বারান্দায় খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে তাহারা অনুভব করিল, যে মুদ্রা সকল দিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ নিরাশ্বাস হইয়া প্রধান চোর বেরীর হাত ধরিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বেরী তাহা না শুনিয়া যে ঘরে সাহেবটি শয়ন করিয়াছিল তাহাতে প্রবেশ করিল দেখিয়া সে বাহিবে দাঁড়াইয়া বেরীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরে ঐ ব্যক্তি বাহির হইতে শুনিতে পাইল যেন ঘরের ভিতরে কেহ হাতাহাতি করিতেছে কিন্তু কি হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং ঘরে প্রবেশ কবিতেও সাহস করিল না। কিয়ৎকাল পরে বেরী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে অতি ব্যস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গীকে "চল" বলিয়া সম্বোধন করিল। সঙ্গী দেখিল যে বেরী উন্মাদের প্রায় হইয়াছে; সে বেরীর হস্ত ধরিতে তাহা সিক্ত বোধ হওয়াতে মনে করিল যে শরীরে ঘর্ম্ম দ্বারা তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ববফগুদাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পরে পথের প্রদীপে আলোতে দেখিল যে বেরীর পোষাক ও শরীব রক্তে বক্তময়। বেরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল যে সে ঐ ব্যটাকে খুন কবিয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্র নদীতে যাইয়া রক্ত ধুইয়া ফেলিতে চাহিল। যদিও সে স্থান হইতে নদী অনতিদূর ছিল তথাপি নদীধারের রাস্তায় বহু দেশী এবং সাহেব প্রহরী থাকে বিশেষ গোরা নাবিকেরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রাস্তা দিয়া গতিবিধি করে অধিকন্তু ঘাটে ঘাটে সহস্রাধিক দেশী নৌকা ও জাহাজ লাগান আছে জানিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে লইয়া নদীধারে রাস্তায় যাওয়া বিঘ্ন বোধ করিলাম। অতএব তাহাকে লালদীঘির মধ্য দিয়া মেঙ্গো লেন প্রভৃতি ছোট ছোট গলি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মতলার পশ্চিম দিকে এক জলের প্রণালীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং প্রণালীর মধ্যে বেরীর শরীর ও বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহার রুমাল যাহাতে অত্যন্ত রক্ত লাগিয়াছিল তদ্দ্বারা তাহার ছুরিখানা বেষ্টন করিয়া প্রণালীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। তদনন্তর বেরী সেই আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্গী সহিত বিদায় হইয়া জাহাজে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে বেরীর সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, শুনিয়াছে যে বেরীর জাহাজ তাহার পরদিবসেই পারমিট মুক্ত লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। লো সাহেব ঐ ব্যক্তির কথা পরীক্ষা করার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া সেই প্রণালী অন্বেষণ করিলেন এবং তাহার মধ্যে বেরীর ছুরি ও রুমাল প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তাহার কথার প্রতি আর কোন সন্দেহ না থাকাতে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহার দুই

দিবস পূর্ব্বে একখানা জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা এখনও ডায়মণ্ডহারবার পার হইয়া সমুদ্রে যায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের পূর্ব্বে যে প্রকার টেলিগ্রাফ ছিল, তাহা কি আমার যুবা পাঠকগণ অবগত আছেন? তাহা সাহেবেরা সিমাফোর টেলিগ্রাফ বলিয়া অভিহিত করিতেন। স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধানে একটা উচ্চস্তম্ভের উপরে একটা দীর্ঘ কাষ্ঠের মাস্তুলের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কয়েকখানা তক্তা এমনভাবে লাগান থাকিত যে তাহা স্তম্ভের মধ্য হইতে দড়ি দ্বারা টানিলে মাস্তুলের উভয় ধারে ঐ সকল তক্তা উঠিত ও নামিত এবং সেই তক্তাগুলির উঠা নামার পরিমাণেই কথার এবং অক্ষরের ইঙ্গিত হইত। ইহার একটি কলিকাতায় একশেচঞ্জে ঘরের ছাদের উপরে, দ্বিতীয়টি কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে স্তম্ভের উপর হইতে গোলা পড়িলে এইক্ষণে দুই প্রহর ঘন্টার তোপধ্বনি হয় সেই স্তম্ভের উপরে এবং ঐরূপ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত কতকগুলি স্তম্ভ ছিল এবং উহাদের দ্বারাই তখন জাহাজের সংবাদ আসিত এবং যাইত। এই টেলিগ্রাফে দিবস ভিন্ন রাত্রে কোন কার্য্য হইত না এবং এখন যেমন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা চক্ষের পলক মধ্যে সহস্র ক্রোশ হইতে সংবাদ আইসে তখন তাহা হইত না। কলাগাছিয়া হইতে কলিকাতায় পুরাতন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদ আসিতে অন্তত তিন চারি ঘন্টার কমে হইত না। কিন্তু এত বিলম্ব হইলেও সেই ধীরগতি টেলিগ্রাফের দ্বারা অনেক উপকার হইত। বেরীর জাহাজ কলাগাছিয়া পার হইয়া যায় নাই শুনিয়া লো সাহেব সেই স্থানে তিনি না পৌঁছিলে জাহাজ সমুদ্রে যাইতে না পারে এবং জাহাজ হইতে কোন নাবিক তীরে আসিতে না পারে তদ্বিষয়ে ডায়মণ্ড হারবারের জল পুলিশের কর্ত্তা সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফের সংবাদ পাঠাইয়া নিজে তাঁহার সংবাদদাতা চোর ও কয়েকজন সাহেব পুলিশ কর্ম্মচারীর সমভিব্যহারে এক দ্রুতগামী নৌকায় বেরীকে ধরিবার নিমিত্ত ডায়মণ্ডহারবার মুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার নৌকা জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলে, জাহাজের সমুদায় নাবিক কি জন্য পুলিশের নৌকা জাহাজে আসিতেছে তাহার কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত জাহাজের ধারে আসিয়া খাড়া হইল কিন্তু বেরীই বুঝিতে পারিল যে তাহার অদৃষ্টে আগুন লাগিয়াছে; অতএব সে অন্যান্য নাবিকের ন্যায় জাহাজের ধারে না আসিয়া গুপ্তভাবে জাহাজের পিছাড়ার কাছি অবলম্বন করিয়া হাইলের পার্শ্বে নামিয়া সেই স্থানে সমস্ত শরীর ডুবাইয়া কেবল মাথাটা জাগাইয়া রহিল;ভাবিল যে কেহ আর সেইখানে তাহাকে অন্বেষণ করিবে না। কিন্তু পুলিশের কর্ম্মচারীরা জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের সাহায্যে তাহাকে তাহার গুপ্ত

স্থানে আবিষ্কার করিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল এবং তাহার সঙ্গী লোক তাহাকে তৎক্ষণাৎ বেরী বলিয়া সনাক্ত করাতে লো সাহেব তাহাকে হাতকড়ি দিতে উদ্যত হইলে সে তাচ্ছিল্যভাবে বলিয়া উঠিল যে "অনর্থক কেন কষ্ট পাও, আমি খুন করিয়াছি, ইচ্ছা কবিলে আমায় ফাঁসী দিয়া আমাকে ঝুলাইতে পার, "Now hang me by my!" তদনন্তর কলিকাতায় আনীত হইলে সে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে একরার করিয়াছিল তাহার স্থূল মৰ্ম্ম আমার এইরূপ স্মরণ হইতেছে। "আমি আমেরিকার দেশের এক ভদ্রলোকের সন্তান, আমার বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে কিন্তু স্বদেশে নরহত্যা ও চুবি প্রভৃতি কুকার্য্য কবায আমার পিতা মাতার ও পুলিশের দৌরাত্ম্যে আমি এক জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন কবিয়া আসিয়াছিলাম। পবন্তু এখানে আমার চিত্ত স্থির না হওয়াতে অন্য স্থানে যাইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করাব নিমিত্ত পুনরায় এক জাহাজের নাবিক হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে জাহাজ খুলিবার অল্পকাল পূর্ব্বে এই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া ববফগুদামে চুরি করিলে অনেক টাকা পাইবার প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সেই কার্য্য করিতে সম্মত করে। বহু ধনের কথা কথা শুনিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে তাহা হস্তগত করিতে পারিলে, আমি পুনরায় স্বদেশে যাইয়া আমার পিতামাতার স্বাধীন হইযা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব এবং যেহেতু জাহাজও শীঘ্র কলিকাতা হইতে খুলিয়া যাইবে অতএব চুরির পরে কলিকাতায় পুলিশও আমাকে ধরিতে পারিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া আমার মনে অত্যন্ত সুখের আশা হইয়াছিল অতএব যখন বরফগুদামের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে কিছুই পাইলাম না, তখন নৈরাশে আমার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম যে আমার সঙ্গীকে হত্যা করি কিন্তু পরক্ষণে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলাম এবং খাটের উপরে একজন পুরুষ-শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া তাহার মশারি উঠাইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে এক চপেটাঘাত করিলাম। কি কারণে আমি ঐরূপ কার্য্য করিলাম তাহা আমি এখনও আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু মানুষ দেখিয়া তাহাকে মারিতে ইচ্ছা হইল এবং আমি সেই বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার শরীরে হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সেই পুরুষটি পীড়িত হইলেও তাহার স্নায়ুতে এঙ্গ্লো স্যাকসন জাতীয় শোণিত বহিতেছিল, অতএব আমার আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করাতে আমি আমার ছুরির দ্বারা তাহাকে সাঙ্ঘাতিক কয়েকটা আঘাত করিলে সে শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি বোধ করি যে পীড়ার গতিক তাহার কায়িক দুর্ব্বলতা না থাকিলে আমি তাহাকে পরাজয় করিতে পারিতাম না। সে যাহা হউক খাটের উপর

অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল দেখিয়া আমি তাহাকে নামাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিলাম এবং যাহাতে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য আরও দুই এক ছুরির আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলাম। তদনন্তর যে যে কার্য্য করিয়াছিলাম তাহা আমার সহকারীর বর্ণনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। মোটকথা এই যে আমার সঙ্গী এই হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।" লো সাহেবের খুব প্রশংসা ও পদবৃদ্ধি এবং বেরীর ফাঁসীর হুকুম হইল। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ের এমনই গতি যে বেরীর অল্প বয়স দেখিয়া এবং বোধহয় বাঙ্গালীর সম্মুখে একজন সাহেবের ফাঁসীর হুকুম প্রচারিত হওয়ার ভয়ে কলিকাতার বহুতর পাদ্রী ও সাহেবেরা একত্র হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে কিম্বা ফাঁসীর পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিতে লাটসাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই দুরাচার নরঘাতকের প্রতি অন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দণ্ডভোগের প্রতি হস্তক্ষেপণ করিলেন না। বেরীর কলিকাতায় ফাঁসী হইল।